Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

GIFT

নেসার আহ্‌মদ

403515

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

এপ্রিল ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

Dhaka University Library
403515

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ
এপ্রিল ২০০৬

403515

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
নেসার আহমদ
এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০০১-২০০২
রেজি. নং ৯০

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন-পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নেসার আহ্‌মদ কর্তৃক উপস্থাপিত "*দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানা মতে এটি একটি মৌলিক গবেষণা এবং এ অভিসন্দর্ভ কিংবা এর কোন অংশ অন্যত্র ডিগ্রী লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করা হয়নি। অভিসন্দর্ভটি কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেয়ার জন্য অনুমোদন দেয়া হলো।

403515

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

(ড: মুহাম্মদ আবদুর রশীদ)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

ঢাকা
এপ্রিল ২০০৬

(নেসার আহ্‌মদ)
এম. ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষাবর্ষ : ২০০১-২০০২
রেজিঃ নং : ৯০

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রসঙ্গকথা

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি ও স্বরূপ ১০-২৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : দুঃস্থ মানবকল্যাণে মহানবী (সঃ)-এর কর্মসূচী ২৬-৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : খুলাফা-ই-রাশেদীন ও মুসলিম শাসন আমলে দুঃস্থ মানবকল্যাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৪০-৮৩

চতুর্থ অধ্যায় : বাংলাদেশে দুঃস্থ মানবসেবায় নিয়োজিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : পরিচয় ও কার্যক্রম ৮৪-১৭১

পঞ্চম অধ্যায় : দুঃস্থ মানবকল্যাণে বাংলাদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ১৭২-১৯৩

উপসংহার ১৯৪-১৯৬

সহায়ক গ্রন্থাবলী ১৯৭-২০১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রশীদ-এর তত্ত্বাবধানে এম.ফিল কোর্সে নিবন্ধন লাভ করি এবং প্রথম পর্বের কোর্স অধ্যয়ন সমাপ্ত করি।

উক্ত কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে অভিসন্দর্ভটি রচনার প্রতিটি পর্যায়ে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক মহোদয় আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান, উপদেশ, দিকনির্দেশনা ও গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় সহায়ক পুস্তক প্রদান করে এবং বিভিন্ন সময়ে নানা পুস্তকের প্রাপ্তি সংবাদ দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পরিমার্জনা ও সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এরপর আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় ড. সৈয়দ আকরম হোসেন-এর প্রতি। আমি এম. ফিল নিবন্ধনের সময় তাঁর সংস্পর্শে আসি। তখন থেকেই তিনি আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন সময়ে উৎসাহ প্রদান করেছেন। অনেক জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ দিয়ে আমার নিকট সহজবোধ্য করে দিয়েছেন।

এছাড়া আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান আনওয়ারী ও সহযোগী অধ্যাপক ড. শহীদুল ইসলাম নূরী-এর প্রতি। তাঁরা আমার গবেষণাকর্ম এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক সময় উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় অসীম সাহাকে যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজ দায়িত্বে প্রুফ দেখা ও অভিসন্দর্ভটি মেকআপের কাজে সহায়তা করেছেন।

পরিশেষে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার স্ত্রী মোছাঃ শাহানাজ বেগম-এর প্রতি, যিনি নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি গবেষণারত। তিনি সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে সহায়তা নিয়েছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ্‌র কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর হাদীসে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি সুখে-দুঃখে মানুষের অতি নিকটতম। কোন আদম সন্তান তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে তিনি মানুষ পাঠিয়েছেন যেন তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তাঁর সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। মানুষকে আল্লাহ্ তায়ালা একটি নির্দিষ্ট জীবন দান করেছেন এবং সময়ের ব্যবধানে তাকে আবার মহান আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে যেতে হবে। মাঝখানে যে সময়টুকু পৃথিবীতে কাটিয়ে গেল তার হিসেব আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করতে হবে। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো প্রভূত্ব বা দাসত্ব করা যেতে পারে না। তিনি সকলের প্রভু, মালিক, মা'বুদ, ইবাদতের যোগ্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীর সাথে তুলনা করা যায় এমন কোন বস্তুই নেই। তিনি মানুষের সকল চিন্তা ও ধারণার উর্ধ্বে। তিনি অনন্ত, অনাদি। তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-"আর যদি আপনি (হে মুহাম্মদ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে অবশ্যই বলবে যে, এইগুলো মহা-পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন"[১]। তাই মানুষের উচিত আল্লাহ্ তায়ালার সার্বভৌমত্ব মেনে একমাত্র তারই এবাদত করা।

আল্লাহ্ তায়ালা যুগে যুগে তার বান্দাদের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নবী রাসুল পাঠিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহ তায়ালা বিপথগামী মানুষকে ইসলামের পথে আনার জন্য এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। নবীজি (সঃ) তার সমগ্র জীবন ইসলামের পথে ব্যয় করেছেন। তিনি অবহেলিত মানুষের সঠিক মর্যাদা প্রদান করার মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তৎকালীন গোটা বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধন করেন এবং সমাজের অসহায়, দুঃস্থ মানবকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেন।

এই নিয়ামত ভরা পৃথিবীতে যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করে সুখে- স্বাচ্ছন্দে মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। যারা অসহায়, দূর্বল ও অবহেলিত মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও নবী করিম (সঃ) তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছেন। কুরআন মাজীদে সমাজের অসহায় এতিম, মিসকীন, নিঃস্ব, পথিক, শ্রমজীবী ও চাকর-চাকরানী সকলের অধিকার আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন-"তোমাদের সম্পদে প্রার্থী ও অভাবগ্রস্তদের অধিকার রয়েছে"[২]।

প্রত্যেক মানুষের পরস্পরের প্রতি কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে। এই কর্তব্য পালনের জন্য ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়ে একদিকে গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা তেমনি বাধাগ্রস্থ। বিশ্বের সর্বত্রই বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাজ জীবনকে অস্থির করে তুলেছে। সভ্যতার দাবিদার পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের সর্বত্রই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, কিশোর অপরাধ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, অপহরণ, ধর্ষণ, নারী-শিশু পাচার , নারী নির্যাতন, মাদকাসক্ত, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, যৌতুকের প্রভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ইত্যাদি সামাজিক অপরাধ ও সমস্যা সমাজ জীবনকে চরমভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে।

---

১. আল-কুরআন, সূরা আল-যুখরুফ, আয়াত : ৯

২. সূরা জারিয়াহ, আয়াত : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মানব রচিত মতবাদ প্রবর্তনের ফলে বর্তমান বিশ্বের এই করুণ পরিণতি। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে যুগে যুগে সমাজ বিজ্ঞানীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এ কথা সত্য। কিন্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী তা কেবলই ব্যর্থ হয়েছে। মানব রচিত অর্থনৈতিক মতবাদের ব্যর্থতার ফলে বিশ্বে আজ একটি শ্লোগান বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। আর তাহলো বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নির্দেশিত ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ছাড়া বর্তমান সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। এ কথার স্বীকৃতি আমরা জর্জ বার্নাড'শর একটি উক্তির মাধ্যমে পাই। তিনি বলেন, "If a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern world. He would succeed in solving its problems that would bring the much needed peace and happiness"[3].

তাই আজ বিশ্বজুড়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রবর্তিত মানবাধিকার ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এবং সমাজের দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত মানুষের অধিকার সংরক্ষণে ও তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি মুসলিম দেশে এ ধরনের যুগোপযোগী একটি বিষয়ে গবেষণা অপরিহার্যতার দাবী রাখে। এ বিষয় উচ্চ পর্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা মনে করে আমি "দুঃস্থ মানবকল্যাণে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শিরোনামে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছি।

বাংলাদেশের মানুষ সেই বৃটিশ শাসনামল থেকে অবহেলিত নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। যুগে যুগে সেই যুলুম, অত্যাচার ও অবহেলার ফলে আমরা এখনও আশানুরূপ উন্নতিলাভ করতে পারিনি। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য ১৮৬০ সালের সমিতি আইনের ২১ ধারা মতে রেজিস্ট্রিকৃত ও ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে গঠিত হয় প্রথম ইসলামী সেবা সংস্থা 'আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম' সংস্থাটি। ১৯০৫ সালে কার্যক্রম শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানবসেবায় নিবেদিত। পরবর্তীতে খান বাহাদুর আহ্ছানুল্লা (রঃ) স্বদেশ বাসীর 'রুহানী' খেদমত এবং 'সমাজ সেবার' জন্য ১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ দুটি সেবা সংস্থার অনুসরণ ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী পরবর্তীতে অন্যান্য ইসলামী সেবা সংস্থা গড়ে ওঠে। এজন্য আমার মনে হয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ ও তাদের কার্যক্রম এক বিস্ময়কর অধ্যায়। আর্ত-মানবতার সেবায় এ সকল সেবা সংস্থা আন্তরিক ও ঐকান্তিক। সাধারণ সেবা সংস্থাসমূহ অসহায় মানুষের সেবা দান করলেও সেখানে ব্যক্তি স্বার্থ কাজ করে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষার সাথে বাস্তব সম্পর্ক রেখে ইসলামী সেবা সংস্থা গড়ে ওঠে এবং সেই অনুযায়ী মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। অসহায় মানুষকে সেবাদানের ক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অধিকার বঞ্চিত মানুষের চাহিদা পূরণ, ব্যক্তি সচেতনতাবোধ, ও পুনর্বাসনের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সমাজের অধিকার বঞ্চিত অসহায় মানুষের সেবাদান ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে। এ সকল সেবা সংস্থা শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এ দেশের অসহায় মানুষের অবস্থা ও অবস্থানের বিস্তৃত চিত্র উপস্থাপন করেছে। সমাজের অসহায় মানুষের জীবনচিত্র ও তাদের মৌলিক চাহিদা উদঘাটন করাই আমাদের গবেষণার লক্ষ্য। এ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন কিছু আলোচনা ও প্রবন্ধাদি রচিত হলেও পূর্ণাঙ্গ কোন গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। গবেষণার বিষয় বিন্যাসে আমরা নিম্নোক্ত রীতি ও ক্রমে সমগ্র আলোচনাকে উপস্থাপন করেছি।

সর্বমোট পাঁচটি অধ্যায়ে গবেষণার বিষয় বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম *দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি ও স্বরূপ* : এই অংশে আমরা প্রথমে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও পরে বাংলাদেশের অসহায় মানুষের পরিস্থিতির স্বরূপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান বিশ্বে একশ্রেণীর মানুষ ধনী হচ্ছে আর অন্যশ্রেণী গরিব হচ্ছে। ধনী-দরিদ্রের কারণে সমাজে নানা রকম প্রভাব পড়ে থাকে। উঁচু-নিচু

---

৩. মোঃ রুহুল আমীন কর্তৃক উদ্ধৃত, "আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মুহাম্মদ (সঃ)-এর অবদান", *সিরাজাম মনিরা পত্রিকা* ঢাকা, হাইকোর্ট মাজার, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৯৩ ইং, পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

মনমানসিকতার ফলে মানুষের অবস্থার অবনতি ঘটে। বর্তমানে এইড্স, শিশুশ্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রতিবন্ধি, বর্ণবৈষম্য, দারিদ্র্য, শরণার্থী সমস্যা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ, বন্দি শিবিরে নির্যাতন ইত্যাদি কারণ দুঃস্থ ও অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী। সেই আলোকে আমাদের দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ, বৃহৎ জনসংখ্যার প্রভাবে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিসহ মঙ্গার প্রভাবে মানুষের করুণ অবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *দুঃস্থ মানবকল্যাণে মহানবী (সঃ)-এর কর্মসূচী* : এই অধ্যায়ে মুহাম্মদ (সঃ)-এর মানবকল্যাণ সম্পর্কে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচী ও পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। তিনি বার বছর বয়সে যে 'হিলফ-উল-ফুজুল' গঠন করে শান্তির সূচনা করেন, তার নমুনা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট থাকে। এখানে শান্তিসংঘ গঠন, কৃষ্ণপাথর যথাস্থানে স্থাপন, নারীর অধিকার সংরক্ষণ, এতিম, অসহায়দের সাহায্য, সম্পদের সঠিক ব্যবহার, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, অসহায়দের প্রতি সাহায্য-সহানুভূতি প্রদান, মানুষের জীবনবোধ ও সেবা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি এবং এ বিষয়ে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম *খুলাফা-ই-রাশেদীন ও মুসলিম শাসন আমলে দুঃস্থ মানবকল্যাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ* : এই অধ্যায়ে প্রথমে খুলাফা-ই-রাশেদীন এবং পরে অন্যান্য মুসলিম শাসনামলে সমাজের সুযোগ বঞ্চিত মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন ও দেশের উন্নয়নকল্পে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ, উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা, ইসলামে মানবসেবার অবস্থান, সমসাময়িক সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম *বাংলাদেশে দুঃস্থ মানবসেবায় নিয়োজিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : পরিচয় ও কার্যক্রম* : এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে কর্মরত দেশী ও বিদেশী ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের পরিচয় ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেবা সংস্থাগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন, দারিদ্র্য বিমোচন, ত্রাণ-পুনর্বাসন, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। তাদের সেবার ফলে দেশের অবহেলিত মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হতে পারছে। অসহায় মানুষের সেবা ও সহায়তা প্রদানে সেবা সংস্থাসমূহ কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং তাদের কি কি পরিকল্পনা আছে, লোকজন তাদের থেকে উপকৃত হতে পারছে কিনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচ্য অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম *দুঃস্থ মানবকল্যাণে বাংলাদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি* : এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে যে সকল ইসলামী সেবা সংস্থা কর্মরত তাদের নিকট এদেশের দুঃস্থ মানবতা কি আশা করে এবং তাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে কতটুকু উপকৃত হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। অধিক জনসংখ্যার এই দেশে অসংখ্য সেবা সংস্থা ক্রিয়াশীল, তাদের চ্যালেঞ্জের সামনে ইসলামী ভাবধারার আদলে গঠিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ আমাদের অসহায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য সদা তৎপর। এর ফলে দিন দিন মানুষ এই সংস্থাগুলোর সাহায্য নিতে ছুটে আসছে। সাধারণ সেবা সংস্থার সেবার বদলে ইসলামী ভাবধারায় যুগোপযোগী সেবাদান করে টিকে থাকা যায় কিনা ইসলামী সেবা সংস্থা সেই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। সেজন্য আমরা দুঃস্থ, অসহায় মানুষের ইসলামী সেবা সংস্থার নিকট প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা তুলে ধরেছি।

উপসংহারে সমগ্র আলোচনার সারমর্ম উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি অংশে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত সহায়ক গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা প্রদত্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি ও স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি ও স্বরূপ

দুঃস্থ মানব

মহান আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি বরং তার জন্য আহার তথা রুজি রোজগারের ব্যবস্থাও করেছেন। মানুষের আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ), আল্লাহ্ পাক তাদের সৃষ্টি করে পৃথিবীতে আবাদ করার জন্য পাঠালেন আর তাদের থেকে আস্তে আস্তে বংশ বৃদ্ধি হয়ে মানুষ বর্তমান সময় পর্যন্ত পৌঁছেছে। আল্লাহ্ যেহেতু মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাই মানব সন্তানকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে। মানুষ পৃথিবীতে একে অন্যের ভাই, ভাই হিসেবে মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য। পৃথিবীতে সকল মানুষ এক রকম নয়, কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ পৃথিবীর স্বর্গ রাজ্যে বাস করে আবার কেউ বস্তিতে। অথচ একই আদম হাওয়া থেকে তাদের সৃষ্টি।

মানুষ যদিও আদম-হাওয়া থেকে সৃষ্ট কিন্তু যুগে যুগে তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভেদ গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছে ধনী-গরিব, শাসক-শাসিত, উঁচু-নিচু শ্রেণী ইত্যাদি। "সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই জীবনের ছোঁয়া পেয়ে পৃথিবীতে চোখ মেলে চলছে মানুষ। কিন্তু জীবন্ত এই মানুষকেই কখনো কখনো মনে হয় জীবনের ছোঁয়াবঞ্চিত, স্পন্দনশূন্য ও মৃত। সৃষ্টিগতভাবে পৃথিবীটা ছিল আলো ঝলমল কিন্তু আলো ঝলমল এই পৃথিবীটাই কখনো কখনো আচ্ছন্ন হয়ে যায় তিমির আঁধারে। বিশ্ব মানবতাকে ঢেকে ফেলেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের কালো শামিয়ানা, কোন বিশেষ অঞ্চল নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এখন এ আঁধারের সর্বগ্রাসী বিস্তার। জলে ও স্থলে সর্বত্র ফাসাদ আর ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতা, অন্যায়-অনাচার, পাপ পংকিলতা, কামুকতা ও স্বার্থান্ধতার কলুষতা ও বিষবাষ্পে মারাত্মকরূপে পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত হয়ে আছে সৃষ্টির সেরা মানবের আবাসভূমি"[৪]

আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে হাজারও নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেছেন-"তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"[৫]

মানব সভ্যতার ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি আজকের পৃথিবী একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় বিরাট সফলতা লাভ করেছে আবার অন্যদিকে সভ্যতার অমানবিক কর্ম করে চলেছে। বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্থানে জনপদে যুদ্ধ বিগ্রহ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রতিহিংসা, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের অপপ্রয়োগে আর্ত-মানবতা আজ লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত, ধুলায় লুণ্ঠিত। একদিকে যেমন, পেশীশক্তির আধিপত্য বিস্তার করে অপমান করা হচ্ছে বিশ্বমানবতাকে আবার অন্যদিকে দুঃস্থ মানবতায় ধুকে মরছে একশ্রেণী। দেশে দেশে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, পরিবেশের ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি, জনসংখ্যা সমস্যা, মৌলিক অধিকার বঞ্চিত তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অভাবেও ধ্বসে পড়ছে আর্ত-মানবতা। বিশ্বের কোটি কোটি নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত দুঃস্থ মানবের আর্ত-চিৎকারে সমগ্র বিশ্ব আজ আতংকিত, ভারী হয়ে উঠছে আকাশ বাতাস।

মানব সৃষ্টির সাথে মানবকল্যাণ জড়িত। সভ্যতার সাথে সাথে মানুষের অধিকার ও স্তরসমূহ সনাক্ত করা হয়েছে। মানবকল্যাণ ও মানবাধিকার বিশ্বজুড়ে আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে মনে হয়

---

৪. *মাসিক মদীনা*, ঢাকা, মে ২০০৩, পৃ. ৫

৫. সূরা জারিয়াহ, আয়াত : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বের বাস্তব প্রেক্ষিতে এ কথা নির্দিধায় বলা যায় যে, বর্তমান মানবকল্যাণ, মানবতাবাদ নিতান্তই কিছু সংকীর্ণ নীতিমালা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের যে অধিকার তা বর্তমানে আশংকাজনক হারে লংঘিত হচ্ছে। বিশ্ব বিবেকের কাছে দুঃস্থ, আর্ত-পীড়িত, অসহায়দের বুক ফাটা কান্না শুধুই কান্না হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

"আজকের পৃথিবীতে আফ্রিকা থেকে এশিয়া, ইউরোপ থেকে আমেরিকা সর্বত্রই উন্নয়নের বার্তা বইছে বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তিসহ অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কারের। শুধু উন্নতি লাভ করেনি মানবাধিকারের। আর্ত-মানবতা আজ গুমরে মরছে অন্ধকার তিমিরে। উপেক্ষিত মানববাধিকার ইরাক, কাশ্মির, ফিলিস্তিন, আফ্রিকা, বার্মা, থাইল্যান্ড, আফগানিস্তানসহ অসংখ্য দেশ ও জাতির মধ্যে।"[৬]

সত্যিই আজ পৃথিবীর অবস্থা বড়ই নাজুক। আফ্রিকায় মানুষ যুদ্ধ করছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, সেখানে মৌলিক অধিকার পর্যন্ত উপেক্ষিত। আবার আগ্রাসী নীতির ফলে মানবতা শুধুই মরিচীকা যার বাস্তবতা আমরা দেখতে পাই বর্তমান ইরাক পরিস্থিতিতে। যেখানে সুন্দর ও শান্ত পরিবেশের স্থলে আজ ক্ষুধা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা ও অসহায়তা নিত্যসঙ্গী। আবু গারিব কারাগার আজ বিশ্বে পরিচিত এক নির্যাতনের গুহা হিসেবে। "ইরাকের আবু গারিব কারাগার হতবাক করে দেয় বিশ্ব বিবেককে। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনকে পাশ কাটিয়ে চলে বন্দিদের ওপর অকথ্য নির্যাতন। স্তব্দ হয়ে যায় মানবাধিকার কর্মীদের কলম। মনে পড়ে যায়, সেই আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বীভৎস, লোমহর্ষক বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার কথা, যেখানে মানবাধিকার বলতে কি বুঝায় তা অধিকাংশ সমাজপতিরাই বুঝতনা বা বুঝবার চেষ্টাও করতো না।"[৭]

'সবার পৃথিবী সবার জন্য' এই অঙ্গীকার নিয়ে সার্বজনীন মানবাধিকার ও জনকল্যাণ আজ উপেক্ষিত, বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যায়, আমরা যখন নতুন শতাব্দী ও মিলেনিয়ামের সূচনা করেছি তখনো বিশ্বের অধিকাংশ জনগণ মানবেতর জীবন যাপন করছে। সৎনীতি ও উন্নত চিন্তা চেতনার বিপরীতে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে অধিকার বঞ্চিতদের সংখ্যা। মানব সন্তানের রয়েছে-মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, বেকারত্ব, অভাব ও নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার, বিবেক চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা, পরিপূর্ণ জীবন-যাপনের সুযোগ নিশ্চিত করা। কিন্তু বর্তমান দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি ও তার স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা, আজকের পৃথিবীর বাস্তবতা হল দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত। অসহায় ও অধিকার বঞ্চিত দুঃস্থ মানুষের পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিখ্যাত লেখক, কবি, সাহিত্যিক পর্যন্ত কলম ধরেছেন, যেমন বিখ্যাত ফরাসী লেখক জ্যা জ্যাক রুশো মানবতা বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর কলম ধরেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত *"The Social Contract"* গ্রন্থে বলেছেন, "স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।"[৮] এই বিখ্যাত লেখকের সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে, মানুষ জন্মের পর থেকেই স্বাধীন, তার সবরকম সুযোগ-সুবিধালাভের অধিকার রয়েছে। কেউ খাবে কেউ খাবেনা তা হবেনা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সার্বজনীন মানবাধিকার ও মানবকল্যাণ বাস্তবায়নের ভার আরোপিত হয়েছে প্রধানত রাষ্ট্রগুলোর উপর। কিন্তু ভৌগলিক অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ, কৃষ্টি-কালচার, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামরিক শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে এই ব্যবধান দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। যে জন্য মানবাধিকার ও সার্বজনীন জনকল্যাণ বাস্তবায়ন বর্তমানে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। ঔপনিবেশিক শাসনামল সম আধিপত্যবাদ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান। স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হবার পর আমরা নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আগাম পয়গাম পেলেও বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, আফগানিস্তান আর ইরাকের শান্তিকামী জনমানবের প্রতি নজীরবিহীন

---

৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৫/০২/২০৫, ধর্মদর্শন পৃষ্ঠা
৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৩/০৬/২০৫, ধর্মদর্শন পৃষ্ঠা
৮. ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, জানুয়ারি ১৯৬৪), সংস্করণ-১৫, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতন-নিপীড়নের মাধ্যমে মাটিতে মিশে গেছে মানবকল্যাণ। উন্নত, উন্নয়নশীল, ধনী ও দরিদ্র দেশের ক্রমবর্ধমান সংঘাত এবং মন-মানসিকতার পার্থক্যের কারণে এই করুণ পরিণতি।

এইড্‌স সমস্যা

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর জন্য এক মহা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাণঘাতি ব্যাধি এইড্‌স। এইড্‌সের ভয়াল থাবায় আক্রান্ত আজ উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ। প্রাণঘাতি এই ব্যাধি বিশেষভাবে আফ্রিকার গরিব দেশসমূহের জন্য এক মহাসমস্যা, যার প্রভাবে জনস্বাস্থ্য ভঙ্গুর প্রায়। আর এজন্য সেখানকার অধিবাসীদের ধুকে ধুকে মরতে হচ্ছে। এইড্‌সের প্রভাবে দুঃস্থ মানবের বাস্তব করুণ চিত্র আমরা সেখানে দেখতে পাই। এইড্‌স যেন মানবসভ্যতার এক জীবন্ত অভিশাপ প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে এরোগে। কারও এইড্‌স হলে সামাজিক ভাবে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং তার সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা করা হয়, এমনকি সামাজিক ভাবেও উপেক্ষা করা হয়। অথচ প্রাণঘাতি এইরোগ কিন্তু শুধুমাত্র ব্যভিচারের জন্যই হয় না, এ একটি সংক্রামক ব্যধি বিভিন্নভাবে মানুষের দেহে প্রবেশ করতে পারে। জাতিসংঘের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা সংস্থাসমূহও এ রোগে আক্রান্ত মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে আমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ও মানব সেবার চমৎকার উদাহরণ দেখতে পাই।

শিশু শ্রম

দুঃস্থ মানবের আরেক করুণ পরিণতি বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যায় শিশুশ্রমের মাধ্যমে। বলা হয় আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার। তাদের মাঝেই লুকায়িত আছে কত কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, ধর্মগুরু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিভা। এসকল শিশুরাই আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে দেখা যাচ্ছে অনুন্নত ও কৃষিপ্রধান দেশের শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা অবহেলা অনাদরে, অপুষ্টিতে ভুগছে এমনকি মৌলিক চাহিদা বঞ্চিত। মৌলিক চাহিদা পূরণে নিজেরাই শ্রমে নিযুক্ত হয়। যে বয়সে তাদের বই খাতা নিয়ে স্কুলে যাওয়ার কথা সেখানে তারা মৌলিক চাহিদার জন্য নিযুক্ত হচ্ছে কঠিন কষ্টকর শ্রমে; "আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী বিশ্বে ১৫ কোটি ৩০ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে, যাদের মধ্যে শতকরা ৪৬ ভাগ মেয়ে।"[৯] অতীত থেকেই শিশুরা অবহেলা ও অনাদরের শিকার এবং বর্তমান পর্যন্তও তারা সকল অধিকার সমানভাবে পায়নি। অশিক্ষা, অনাদর আজও তাদের ভাগ্যে জোটে। সমাজ তাদের অধিকার মেটাতে পারছেনা যার জন্য ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে তাদের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়। আর অধিক খাটুনি, অধিক ক্ষুধার জন্য অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি পর্যন্ত বেছে নিচ্ছে। সারা বিশ্বে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তা রক্ষার জন্য ব্যাপক প্রচার ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ সত্ত্বেও বিশ্বের কোটি কোটি শিশু সহায় সম্বলহীন ভাবে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও গরিব দেশের শিশুদের ভাগ্যোন্নয়ন আজও সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছায়নি। আমরা দেখি আফ্রিকার সোমালিয়া, কঙ্গো, সিয়েরালিওনসহ অন্যান্য দুর্বল দেশের শিশুরা শ্রম দিয়ে পরিবারের জন্য অর্থের যোগান দিচ্ছে।

প্রতিবন্ধী

বর্তমান বিশ্বের প্রতিবন্ধী অবস্থা দুঃস্থ মানবের আরেকটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। প্রতিবন্ধী শারীরিক বা মানসিক উভয় হতে পারে এবং এরা সমাজিকভাবে অসহায় ও অবহেলিত। এদের কাছে জন্ম মনে হয় আজন্ম পাপ। প্রতিবন্ধী বলতে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যারা বিকারগ্রস্থ সমাজে অস্বাভাবিক জীবন যাপন

৯. Report : 1999, International Labour Organization, Geneva, Switzerland.

Dhaka University Institutional Repository

করে, যারা পৃথিবীর আলো চোখে দেখতে পায়না, কানে শুনেনা, মুখে কথা বলতে পারে না বা কোন দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। তাদের জীবন সমাজের কাছে করুণার পাত্র, সমাজ এদের প্রতি অসম ব্যবহার করলে মনে হয় এরা সমাজের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন তাদের কাছে জীবন বৃথা মনে হয়। জন্মসূত্রে বা ভাগ্যসূত্রে যেভাবেই হোক এই শ্রেণীর আর্ত-মানবতা সর্বদা সমস্যা জর্জরিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিবন্ধী অবস্থা এক মারাত্মক সমস্যা, যা থেকে মুক্তি পেতে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থরাজি থেকে জানতে পারি যে, প্রতিবন্ধীদের ভাগ্য উন্নয়নে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিবছর ৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। আমরা আরও জানতে পারি যে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবন্ধীর সংখ্যা, তাদের অবস্থান, তাদের প্রতি সরকার তথা জনসাধারণের আচার ব্যবহার, তাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, বৈষম্যমূলক আচরণ ইত্যাদি বিষয় জরিপ করে রিপোর্ট প্রদান করে। তেমনি এক রিপোর্টের মাধ্যমে জানা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা দশ (১০%) ভাগ কোন না কোনভাবে প্রতিবন্ধী।[১০] এ প্রতিবন্ধীদের নিয়ে আমাদের বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যেও মেধা আছে তাদেরকেও উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করা সম্ভব যদি উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া যায়। প্রতিবছর প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সচেতনতার জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে এদেরকে সমাজের বোঝা মনে হলেও মনে রাখতে হবে তারাও মানুষ এবং আল্লাহর সৃষ্টি। ইসলামে এই শ্রেণীর মানুষকে সেবা দানের জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এই প্রতিবন্ধী অবস্থা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেসকল কারণে এই অবস্থা হয় বলে মনে করা হয় তার মধ্যে রয়েছে-

১. বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি;

২. জন্মগত;

৩. অপুষ্টি;

৪. দুর্ঘটনাজনিত।

তাছাড়াও রয়েছে নানা রকম দুর্ঘটনা, গর্ভপূর্বের কোন অসুবিধা, গর্ভকাল, জন্মের সময়, জন্মপরবর্তী রোগব্যধি, পোলিও, টাইফয়েড, রিকেট্স ইত্যাদি রোগ, আরও রয়েছে অপুষ্টি, দুর্যোগ বা অজ্ঞাত কোন কারণ। যার ফলে সুন্দর সুস্থ জীবনের বদলে ঘটে প্রতিবন্ধী জীবন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রতিবন্ধীরা আমাদের মতই মানুষ তারা কেবলই ভাগ্যহত অসহায়। অথচ এই অবস্থার জন্য তারা দায়ী নয়। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মুহূর্তে আমাদের এই স্বাভাবিক জীবন তাদের মত হতে পারে। তাই অবহেলা করে নয় যথার্থ মানুষ হিসেবে তাদের মূল্যায়ন করা দরকার এবং একথাও মানতে হবে যে, সমাজের সুযোগ সুবিধার অধিকার নিয়ে তাদেরও সুন্দরভাবে বাঁচার অধিকার আজ বিশ্ব স্বীকৃত।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বর্তমান বিশ্বের দুঃস্থমানবতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহও এক মারাত্মক আঘাত। আর এই দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা, সুনামি ইত্যাদি। সর্বশেষ সুনামির[১১] মত বিশ্ব বিপর্যয় মানবতাকে থমকে দিয়ে এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত ছোবল দেয়, যার জন্য অগনিত মানুষ হয় বাস্তুহারা, সম্পদহারা, সন্তান হারা, পিতা-মাতা হারা। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়াতে সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প

---

১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০/০৫/২০০৫, পৃ. ৪; *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৮/০৫/২০০৫, পৃ. ৮; *দৈনিক যুগান্তর*, ২০/০৫/২০০৫, পৃ. ৫; *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৯/০৫/২০০৫, পৃ. ৪; *The Daily Observer*, 20/05/2004, P. 5

১১. সুনামি জাপানি শব্দ যার অর্থ পাগলা ঢেউ, ২৫/১২/২০০৪ তারিখে ইন্দোনেশিয়ায় যে সুনামি আঘাত হানে তার প্রভাব সুদূর আফ্রিকার সোমালিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটে এবং পৃথিবীর সব দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর শিরোনাম করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আঘাতের ফলে যে পাগলা ঢেউয়ের সূচনা হয় সে ঢেউ আছড়ে পড়ে ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ডসহ আফ্রিকার সুদান পর্যন্ত। আর এই পাগলা জলোচ্ছাস তথা সুনামির ফলে আক্রান্ত দেশের উপর নেমে আসে বিরাট মানবিক বিপর্যয়। মানুষের দুঃখ দুর্দশা চরমে পৌঁছে। সেখানে সার্বিক জনস্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে। এজন্য দেখা দেয় খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাব, পানীয় জলের অভাব, মানুষ তাদের ঘর-বাড়ি, খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি হারিয়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে এক মানবেতর জীবনযাপন করে। তখন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তথা টেলিভিশনে মানুষের দুঃখ কষ্টের অবস্থা দেখে মানব হৃদয় কেঁদে ওঠে। এই অবস্থা মোকাবেলার জন্য কোন কোন দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তখন আর্ত-মানবকল্যাণে সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তারা দুঃস্থ মানবকল্যাণে খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধপত্র, গৃহনির্মাণ সামগ্রীসহ পুনর্বাসনের জন্য সাহায্যে এগিয়ে আসে। এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে আর্ত-মানবকল্যাণের জন্যেই সাহায্য করা হয়।

ভূমিকম্প পরিস্থিতি

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়নি। প্রতিনিয়ত পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে ভূমিকম্পের খবর পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় জাপানে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি ভয়াবহ রূপ হচ্ছে ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের ফলে মুহূর্তের মধ্যে জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। ১৯০৫ ও ১৯৯৩ সালে ভারতে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় তাতে ৬০ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। আর সম্পদ নষ্ট হয় কোটি কোটি টাকার। আবার ২০০৩ সালে ইরানের বামনগরে ভূমিকম্পের ফলে নগরীর ৯০% ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলে সেখানে দেখা দেয় এক মহা বিপর্যয়। মানুষজন আচমকা প্রাকৃতিক আঘাতে ঘর-বাড়ি হারিয়ে এক মহা বিপদে পড়ে। প্রায় ৩০ হাজার লোক মারা যায়; যারা বেঁচে থাকে তাদের অবস্থা আরও করুণ। ঘরবাড়ি হারিয়ে মানুষ আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়, কেউ আবার শীতের রাতে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে বাধ্য হয়। যেখানে থাকেনা খাবার ব্যবস্থা, শোবার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, এক কথায় এই অবস্থায় সার্বিক মানবিক বিপর্যয় ঘটে। তখন মানুষ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের জন্যই বাস্তুহারা, সন্তান হারা ও দুঃস্থদের জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। মোটকথা ভূমিকম্প প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মানুষ এর মোকাবেলা করতে পারে না। তবে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে। আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্বের ভূমিকম্প প্রবন এলাকার মধ্যে একটি এলাকা। এজন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকারও এ সম্পর্কে বেশ সচেতন। ভূমিকম্পের মাত্রা নিরূপণ, পরীক্ষা এবং এ সম্পর্কে গবেষণার জন্য চট্টগ্রামের আমবাগানে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া ঢাকা, সিলেট, বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা ইত্যাদি স্থানের অফিসে চট্টগ্রামের মতো উন্নত প্রযুক্তি নির্মাণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা আশা করি এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হবে এবং আমাদের এ গরিব দেশ ভূমিকম্পের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাবে।

বর্ণবৈষম্য

বর্ণবৈষম্য প্রথা বিশ্বমানবতার আলোকে দুঃস্থ মানবের আরেক করুন পরিণতি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বর্ণবৈষম্য তথা শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্যের ফলে সমাজে উঁচু নিচু শ্রেণী সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর যে সকল দেশে এই শ্রেণীবৈষম্য রয়েছে সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। শেতাঙ্গরা সমাজে তথা রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে আবার অন্যদিকে কৃষ্ণাঙ্গরা মানবেতর জীবনযাপন করে। তারা সকল ক্ষেত্রে নানা রকম বৈষম্যের স্বীকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশে এই বৈষম্য দীর্ঘদিন ধরে চলার ফলে মার্টিন লুথার কিং কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করেন এবং শেষ পর্যন্ত আততায়ীর আঘাতে নিহত হন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে নেলসন মেন্ডেলার মত বিশ্ব কৃষ্ণাঙ্গ নেতা শেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং ২৭ বছর রাবন দ্বীপে কারাভোগের পর শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান জিম্বাবুয়েতে চলছে এই বৈষম্য এবং সেখানকার শেতাঙ্গরা জোর করে কৃষ্ণাঙ্গদের জমি-জমা, ঘর-বাড়ি দখল করে নিচ্ছে যার ফলে অত্যন্ত দীনহীনভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সময় কাটছে। আর এই বৈষম্যের জন্য আন্তর্জাতিক ভাবে জিম্বাবুয়ে সরকারের উপর চাপ বাড়ছে। এভাবে শ্রেণীবৈষম্যের ফলে সমাজে গড়ে ওঠে দুঃস্থ মানব আর এই দুঃস্থ মানবের কল্যাণের জন্য পৃথিবী ব্যাপী মানুষ সোচ্চার হচ্ছে।

দারিদ্র্য সমস্যা

দারিদ্র্য বর্তমান বিশ্বের উন্নতির পথে বিরাট অন্তরায়। পৃথিবীর সকল দেশেই কম বেশি দরিদ্রতা লক্ষ্য করা যায়। অতি অভাবের ফলে মানুষ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এমনকি কোন কোন উন্নত দেশেও দারিদ্র্য দেখা দিয়েছে। যেমন ইত্তেফাকের এক সংবাদে বলা হয়-"নিউজিল্যান্ডের দরিদ্র এলাকায় ১০ ভাগ লোকই খেতে পায়না। সেখানকার স্কুলগুলোতে নাস্তা সরবরাহ করা দরকার। অর্থনৈতিক ব্যাপক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সেখানকার প্রায় ১০ ভাগ পরিবারও নিয়মিত খাদ্য জোগাড় করতে পারেনা। একটি শিশু অধিকার গ্রুপ মঙ্গলবার একথা বলে। চাইল্ড পোভার্টি এ্যাকশন গ্রুপ এক রিপোর্টে বলে, খাদ্য উৎপাদিত দেশটিতে ব্যাপক খাদ্য অনিশ্চিয়তা এবং দরিদ্র এলাকাসমূহের স্কুলগুলোর শিশুদের নাস্তার সমস্যা দুর করতে জরুরী খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন। 'হার্ড টু স্যালো' শীর্ষক রিপোর্টের লেখক ডোনা ওয়াইল্ড বলেন, নিউজিল্যান্ডের এক লাখের বেশি লোক খাদ্য অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত। তিনি বলেন এটা পরিষ্কার যে, কিছু পরিবার বর্তমান উন্নত অর্থনীতির সুবিধা নিলেও যাদের কিছু নেই তারা আরো পিছনে পড়েছে। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানে দু'বছর আগে আমরা আরো গরিব ছিলাম, কিন্তু আমরা খাদ্যব্যাংকের সহায়তা ছাড়াই আমাদের শিশুদের খাওয়াতে পারতাম।"[১২]

শরণার্থী সমস্যা

বর্তমান বিশ্বের শরনার্থীদেরকেও আমরা দুঃস্থ মানবের মধ্যে গণ্য করতে পারি। জোর করে যাদের ঘর-বাড়ি দখল করে বাস্তু ভিটা থেকে যাদের তাড়িয়ে দেয়া হয় তারাই শরানার্থী। শরনার্থী শিবিরে কাটে এক বন্দিজীবন, সকল রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে তারা হয় বঞ্চিত। বর্তমানে আমরা যেমন দেখতে পাই ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল করে তার অধিবাসীদের ঘরছাড়া করেছে এবং যখন তখন তাদের উপর বুলডোজার, রকেট, বোমা, গুলি ইত্যাদি প্রাণঘাতি অস্ত্র দিয়ে অকাতরে তাদের হত্যা করা হচ্ছে। আর এই অবস্থায় ফিলিস্তিনি জনগণ বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অভাব, অনটন ও হতাশার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। এই হতভাগ্যদের কল্যাণে বিশ্বনেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসলেও ইসরাইল সরকার শরনার্থী তথা সহায় সম্বলহীন মানুষের কল্যাণে কখনও ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। অথচ ফিলিস্তিন সমস্যা কিন্তু অনেক প্রাচীন এক সমস্যা। ১৯৪৮ সালে যখন ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন থেকেই এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার ১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধ শুরু হলে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিন দখল করা হয়। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত স্বীয় রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে পাবার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট বিচার চেয়েও রাষ্ট্র ফিরিয়ে পায়নি। বর্তমানে এ সমস্যা সমাধানে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সচেষ্ট হলেও শান্তি ফিরে আসেনি।

অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার প্রভাব

দুঃস্থ মানবতার আলোচনা করতে গেলে বর্তমান বিশ্ব মোড়লীর অবস্থাও আলোচনা করা দরকার। কারণ বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় গরিবকে আরও গরিব ধনীকে আরও ধনী করা হচ্ছে। যার প্রভাব পড়ছে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একক নীতির ফলে জাতিসংঘের কোন ভূমিকা দেখা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যা বলে জাতিসংঘ তাই করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছামত জাতিসংঘকে ব্যবহার করে মোড়লগিরি করছে। অথচ জাতিসংঘের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের ভেটো

---

১২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭/০৮/২০০৫, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন কথা মানা হয় না। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ সমর্থক যুক্তরাজ্য, তারা এক হয়ে সমগ্র বিশ্বকে ইচ্ছামত পরিচালনা করছে। বর্তমানে কোন রাষ্ট্র মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে মত দিলে বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথামত না চললে তার উপর আরোপ করা হয় জাতিসংঘের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসহ বিভিন্ন রকম নিষেধাজ্ঞা যার বাস্তব উদাহরণ লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ। যদিও শেষ পর্যন্ত লিবিয়ার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং ইরাককে দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখার পর শেষ পর্যন্ত সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে মার্কিন তাবেদারী সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে আবার ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের ব্যাপারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, ইরান যদি তার পারমানবিক অস্ত্রভান্ডার জাতিসংঘের কাছে উন্মুক্ত না করে তাহলে তার উপর আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞাসহ সামরিক অভিযান পর্যন্ত চালানো হতে পারে। আর এর মদদদাতা বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এভাবে যখন কোন উন্নয়নশীল দেশের উপর আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় তখন দেশটি বিশ্ব ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা থেকে ছিটকে পড়ে এবং অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান নিচের দিকে নেমে যায়। আর তখন সেখানে দেখা যায় খাদ্যের অভাব, চিকিৎসার অভাবসহ নানা মানবিক বিপর্যয়। যেমন আমরা এই নীতির বাস্তবায়ন দেখতে পাই ইরাক ও আফগানিস্তানে। ইরাকে দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশের সার্বিক অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। কারণ তাদের আয়ের প্রধান উৎস যে তেল[১৩] তার উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ইরাক তেল বিক্রি করতে পারেনি, ফলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং জনগনের মাঝে হত দরিদ্রের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। ১৯৬০ সালের ১৪ আগস্ট যখন ওপেক গঠন করা হয় তখন তার সদস্য ছিল ইরাক, ইরান, সৌদি আরব, কুয়েত ও ভেনিজুয়েলা। এ সংস্থা পৃথিবীর ৪০% ভাগ তেল উৎপাদন করে। ধারণা করা হয় যে, বর্তমানে ওপেক সদস্যভুক্ত ১১ টি রাষ্ট্রে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ খনিজ তেল মজুদ আছে। তেলের উপর ভিত্তি করে যে ইরাকের অর্থনৈতিক বাজেট তৈরি করা হয় সেই তেলের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরাকের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালানো হয় এবং একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করে মার্কিন হুকুমের পুতুল সরকার ক্ষমতায় বসিয়ে বর্তমান ইরাকে এক অস্থীতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। অভাবের তাড়নায় লোকজন চাকুরীর জন্য যখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে মারা হচ্ছে বোমা যার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে মানুষের দেহ।[১৪] আর এই অরাজকতা সৃষ্টির পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দায়ী বলে বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন।

আফগান পরিস্থিতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একইভাবে মৌলবাদের ধুয়া তুলে আফগানিস্তানে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তা বিশ্ব ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা। আফগানিস্তানে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার ফলে অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ দুর্দশা। যেদেশ এমনিতেই দুর্বল তাদের উপর আবার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, এ যেন 'মরার উপর খাড়ার ঘা'; অর্থের অভাবে সেখানের অধিবাসীগণ আফিমের মত নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর বস্তু উৎপাদন শুরু করে। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার জন্যই মানুষের উপর নেমে আসে ভীষণ দারিদ্র্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে সেখানে অধিবাসীদের নিম্ন জীবনযাত্রার মানকে আরও নিম্নমুখী করেছে। সেখানে মানুষ বর্তমানে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।[১৫]

---

১৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫/০৬/২০০৫, পৃ. ৪; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০/০৬/২০০৫, পৃ. ৮; *দৈনিক আমার দেশ*, ১৩/০৬/২০০৬, পৃ. ৩

১৪. *The Daily Star*, 08/03/2006, P. 4; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৬/০৩/২০০৬, পৃ. ৪; *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৪/০৩/২০০৬, পৃ. ৬

১৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০২/০৩/২০০৬, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

গুয়ানতানামো বন্দি শিবির

কিউবার গুয়ানতানামো বন্দি শিবির একটি জেলখানা যার মালিকানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অপরাধীদের ধরে এনে এই বন্দি শিবিরে রাখা হয় এবং তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়। যেমন আফগানিস্তানের তালেবান যোদ্ধাদের সেখানে বন্দি করে এক অসহায় অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। তাদের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় যে, গুয়ানতানামো বন্দি শিবিরে রয়েছে বিভিন্ন রকম বিষাক্ত জীব জন্তু যেমন বিচ্ছু ইত্যাদি আর এ সকল ভয়ংকর জীবের কামড় পর্যন্ত বন্দিদের সহ্য করতে হয়। তাছাড়া তারা সেখানে এক ভয়াবহ জীবন যাপন করে যেখানে তাদের স্বাধীনভাবে ধর্মপালন পর্যন্তও করতে দেয়া হয় না। এভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর তাদের বিনা বিচারে দুঃস্থ অসহায় অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করতে হয়।[১৬]

এভাবে দুঃস্থ মানবতার বর্তমান করুণ পরিস্থিতি ও স্বরূপ আলোচনা করতে গেলে একথা বলা যায় যে, বর্তমান মার্কিন বিদেশনীতি এ অবস্থার জন্য পুরোপুরি দায়বদ্ধ। কারণ মার্কিন স্বার্থবিরোধী হলে তার উপর নেমে আসে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা। আর অর্থনৈতিক লেন-দেন সীমিত হওয়ার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে নেমে আসে দারিদ্র্য, দুঃস্থতাসহ নানা রকম সমস্যা।

---

১৬. *দৈনিক সংগ্রাম*, ০৫/০৪/২০০৫, পৃ. ৪; *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৫/০৪/২০০৫, পৃ.৪, *দৈনিক যুগান্তর*, ১০/০৪/২০০৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি

স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রভাব

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ মানবতার বাস্তব চিত্র ও পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাই যে, এখানে আর্ত-মানবতা এক মহা ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এখানে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে বিভিন্ন সংগঠন নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্গত। ধীরে ধীরে মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হচ্ছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃস্থ মানবতার যে করুণ চিত্র এখনও লক্ষ্য করা যায় তা সত্যিই হৃদয় বিদারক।

বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য দীর্ঘ নয় মাস পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে[১৭] এবং প্রায় ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে কাঙ্খিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে বীর মুক্তিযোদ্ধারা[১৮], কিন্তু এই নয় মাসের যুদ্ধে এদেশের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে পড়ে এবং জনগণের জীবনে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। তখন এদেশের মানুষের তিনবেলা ঠিকমত খাবার পর্যন্তও জোটেনি। অর্ধাহারে, অনাহারে মানুষকে থাকতে হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে ধন সম্পদ, টাকা-পয়সা, বসত-বাড়ি ইত্যাদি। মোটকথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধ এদেশের মানুষকে এক মহা দুঃস্থ ও অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয় যে অবস্থার মোকাবেলা আমাদের এখনও করতে হচ্ছে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি[১৯]

আমাদের দেশের অধিক জনসংখ্যার ফলে ভূমিহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে যার ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে এক বড় অংশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এদেশের কোটি কোটি শ্রমশক্তির মধ্যে মাত্র কিছু অংশ কর্মে নিয়োজিত। আবার এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে, বারবার বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ ভূমিহীন হতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে ভূমিহীনদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক বড় অংশ।[২০] প্রতিবছর বন্যায়, নদীভাঙ্গনের ফলে এক বড় অংশ গৃহহীন হয়ে পড়ে। আমাদের রাজধানী ঢাকার মোট জনসংখ্যার এক বড় অংশই গৃহহীন।[২১] এরা জীর্ণশীর্ণ ঘর তেরী করে কোন রকমে দিনাতিপাত করে যা পরবর্তীতে তাদের বস্তিবাসীতে পরিণত করেছে।

বস্তিবাসীদের জীবন এক দুর্বিষহ জীবন, যারা ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত, এমনকি মানুষের মৌলিক চাহিদাও তাদের জীবনে পূরণ হয় না। ঢাকা শহরে অনেক সময় দেখা যায় যে, সারাদিন ঘোরাফেরা করে নেশাগ্রস্ত হয়ে খোলা আকাশ, বিল্ডিংয়ের বারান্দায়, গাছের নীচ ইত্যাদি অবসবাসের স্থানে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। আর আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের এ অবস্থার জন্য দায়ী অতিরিক্ত দরিদ্র জনসংখ্যা।

---

১৭. ড. এমাজ উদ্দিন আহমদ, *রাষ্ট্র বিজ্ঞানের কথা*, পৃ. ৭৫৭

১৮. *প্রাগুক্ত*

১৯. প্রফেসর মোঃ মনজুর আলী খান, আ.স.ম. সালাহউদ্দিন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অর্থনীতি* (ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০১), পৃ. ১৫২

২০. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* (ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৪), পৃ. ১৮৮

২১. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

শিশুশ্রম

আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে দুঃস্থ মানবতার প্রেক্ষাপটের এক বাস্তব নিদর্শন হল শিশুশ্রম। আজ যে শিশু আগামী দিন সে দেশের কর্ণধার দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তরুণ ও যুবশক্তির। আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশের জন্য অতিরিক্ত জনসংখ্যা এক বিরাট সমস্যা। এদেশে যে শিশু জন্ম নেয় তাকে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জন্মাতে হয়। ঋণের দায় থেকে মুক্তির জন্য এদেশে শিশুদেরকে শ্রমিকের কাজ করতে হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে এদেশে যত্রতত্র ব্যবহার হয় শিশুশ্রমের। এই প্রেক্ষাপটে ইসলামের মৌলিকনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই এক অনাথ বালক ছিলেন এবং তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক মহান পুরুষ। শিশু অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন বাণীও মুহাম্মদ (সঃ) প্রদান করেছেন—"যে ব্যক্তি অসহায় শিশুকে নিজের খানাপিনাতে শামিল করে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য অবশ্যই জান্নাতে স্থান করে দিবেন। যে পর্যন্ত না সে অমার্জনীয় কোন গুনাহ করে।[২২]

মুহাম্মদ (সঃ)-এর বাণীর প্রতি লক্ষ্য রেখে এতিম, অসহায় শিশুদের দেখাশুনা করা, তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ নানা রকম সাহায্য-সহানুভূতি প্রদান, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি মানবকল্যাণমূলক কাজ করার মাধ্যমে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে দেখা যায় যে, নিতান্ত অভাবের তাড়নায় শিশুরা বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কাজ করছে।[২৩] অসহায় শিশুরা গার্মেন্টস শিল্পে অতি অল্প বেতনে কাজ করে, কেউ আবার লেদ মেশিন, ঝালাই কর্মের মত প্রাণনাশের কর্মকাণ্ডে জড়িত। তাদের অনেকে কখনও দুষ্টলোকের খপ্পরে পড়ে বিদেশে পাচার হয়ে উটের জকি হিসেবে কাজ করে। অথচ এই কাজে প্রাণনাশের হুমকি থাকা সত্ত্বেও নিছক আনন্দ-বিনোদনের জন্য অসহায় শিশুদের জকি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ক্ষুধা ও দারিদ্রের জন্যই কেবল এদেশের অসহায় শিশুরা বাসা-বাড়িতে কাজ করে, অনেকে রিক্সা-ভ্যান চালায়, গাড়ীর হেলপারী করাসহ নানাবিধ শিশুশ্রমের সাথে জড়িত। এদেশের শিশুশ্রমের কারণ অনুসন্ধানে বলা হয় যে, এখানে শতকরা ৪০% ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে[২৪], আর দারিদ্র্যের কষাঘাতে পরিবারে আর্থিক সহযোগিতার জন্য তারা শ্রম দিতে বাধ্য হয়। অধিক জন্মহার ও দারিদ্র্য এদেশের বর্তমান শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ ও বিপর্যয়ে সর্বশান্ত হয়ে অভাবের তাড়নায় জীবিকার সন্ধানে অসহায় শিশুদের কর্মের জন্য শহরপানে ছুটে আসতে হয়।

সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের সেবামূলক কর্মকাণ্ড এখনও আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। সরকার গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য', 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' ইত্যাদি কর্মসূচী গ্রহণ করার পরও অনেক সময় শিশুরা মদ-গাঁজার আড্ডায় যোগ দিয়ে ভ্রান্ত পথে পা বাড়ায়, কেউ আবার যৌন নির্যাতনের স্বীকার হয়ে মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন কল-কারখানা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনে কাজ করে। ইউনেস্কোর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৪ বছরের নীচে শিশুকে কোন শ্রমে অংশ নেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।[২৫] অথচ আমাদের দেশে দেখা যায় যে, ৬-৭ বছরের শিশুকে দিনে ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হচ্ছে।[২৬] কাজেই আমাদের দেশের শিশুশ্রমের বাস্তবতা একথা প্রমাণ করে যে, আমাদের দেশের অর্ধেক মানুষ অসহায় ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত।

ভিক্ষাবৃত্তি

আমাদের দেশের ভিক্ষাবৃত্তি বর্তমানে একটি সামাজিক ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। এমনকি উন্নত বিশ্ব আমাদেরকে ভিক্ষুকের দেশের মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করে। বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তি দুঃস্থ মানবের এক জলন্ত প্রমাণ। মানুষ অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বের হয়, ভিক্ষাবৃত্তি সারা

---

২২. কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, *রাহমাতুল্লিল 'আলামিন* (দিল্লী : হানিফ বুক ডিপো, প্রকাশকাল ১৯৫৩), প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৩২
২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬/০৮/২০০৫, পৃ. ৪
২৪. *প্রাগুক্ত*
২৫. *দৈনিক যুগান্তর*, ০৯/০৯/২০০৫, পৃ. ৩
২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৮/০৭/২০০৪, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের জন্য এক সামাজিক সমস্যা। গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় ভিক্ষুকরা এখন ঢাকা শহরে ভীড় জমাচ্ছে।[২৭] এক বেসরকারি হিসেবে বলা হয় যে, রাজধানীতে প্রতি ৭০ জনে একজন ভিক্ষুক,[২৮] সে হিসেবে দেখা যায় রাজধানীতে ভিক্ষুকের সংখ্যা লাখেরও উর্ধ্বে। আবার কেউ বলেন, বর্তমানে রাজধানীতে পূর্ণ ও খণ্ডকালীন ভিক্ষুকের সংখ্যা সোয়া লাখের উপর। আর এই ভিক্ষাবৃত্তি শহরে নাগরিক জীবনে মারাত্মক সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে। অনেক ভিক্ষুক পঙ্গু ও জটিল রোগে আক্রান্ত। মাথায় ময়লা টুপি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, পরনে ছেঁড়া ও ময়লা লুঙ্গি ও পাঞ্জাবী এ হল ভিক্ষুকের সাধারণ বেশ, অনেকে আবার বোরকা পরে রাস্তার পাশে কুরআন তেলাওয়াত করে, কেউ আবার লাশের মত অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। আবার দেখা যায় দলবেঁধে ভিক্ষা করছে, ঠেলাগাড়ীতে ভিক্ষা করছে ইত্যাদি নানা কৌশলে ভিক্ষা করতে দেখা যায়, অথচ কেউ কিন্তু ভিক্ষুক হয়ে জন্ম নেয়না শুধুমাত্র অভাবের কারণেই আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা মানুষকে অন্যের করুণার পাত্র হয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের দেশের মানুষের বিদেশে ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করছে, এজন্য ভিক্ষাবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে।

পতিতাবৃত্তি

আমাদের দেশে ক্ষুধার যন্ত্রণার জন্য এমনসব ঘটনা ঘটে যা দেখে মনে হয় এদেশ কতইনা গরিব। আর তার অধিবাসীগণ আরও অসহায়, ক্ষুধার তাড়নায় এদেশের নারী পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য হয়। এমন বহু ঘটনা আমরা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি, দৈনিক ইত্তেফাকের এক শিরোনামে এভাবে লেখা হয় "ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে মা-মেয়ে একসাথে দেহ ব্যবসায় নাম লেখালো"[২৯] "গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) থেকে সংবাদদাতা" ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে মা-মেয়ের এক সাথে দেহ ব্যবসায় নাম লেখানোর মতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে গোয়ালন্দে। সোমবার তারা উপজেলার দৌলতদিয়া যৌনপল্লীতে নাম লেখানোর জন্য গোয়ালন্দ থানায় আসে। মায়ের নাম নাজমা বেগম (৩৫) ও মেয়ের নাম নূরী বেগম (১৪)।

থানা পুলিশ ও মা-মেয়ের সাথে কথা বলে জানা যায়, ১৫ বছর আগে নাজমা বেগমের সাথে মুনতাজ নামে এক ব্যক্তির বিয়ে হয়। বিয়ের পরের বছরই নাজমার কোলে আসে নূরী। কিন্তু চরম দুর্ভাগ্য তার কিছুদিন পর মারা যায় নাজমার স্বামী। নাজমার পিতার বাড়ি শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায়। বাবা-মা হারা নাজমা একমাত্র মেয়েকে নিয়ে চলে যায় রাজধানী ঢাকায়। বিভিন্নস্থানে বাসা-বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। কিন্তু অধিকাংশ বাড়ির কর্তার কু-দৃষ্টি পড়ে নাজমার দিকে। এক সময় নাজমা আর নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে পারেনি। এভাবেই সে দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। কখনো কখনো আত্মহননের ইচ্ছা জাগে তার। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাও সম্ভব হয় না। এর মধ্যে মেয়ের বয়স ১৩ হয়ে যায়। নিজের মত মেয়েকেও সে রক্ষা করতে পারেনি। মা-মেয়ে একসাথেই ঢাকার মগবাজার, মিরপুর, ধানমন্ডি, ওয়্যারলেছ গেট এলাকার বিভিন্ন হোটেলে ও রেস্টহাউজে কলগার্লের কাজ করতো। সম্প্রতি ঢাকার এসকল আবাসিক হোটেলে ও রেস্টহাউজগুলোতে পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে অনেক যৌনকর্মী গ্রেফতার হওয়ায় তারা মা-মেয়ে দু'জন ঢাকা ছেড়ে দৌলতদিয়ায় চলে আসে। এখানে তারা পতিতা সর্দারনী সুফিয়া বাড়িওয়ালীর ঘরে ওঠে। সুফিয়া বাড়িওয়ালী তাদের নাম যৌনকর্মীভূক্ত করার জন্য থানায় নিয়ে আসে। নাজমা জানায় ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে তারা এপথ বেছে নিয়েছে।"[৩০]

মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন–"ব্যভিচারকারী ও ব্যভিচারিণী উভয়ে সমান অপরাধী এবং তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর।"[৩১] এ ঘোষণা থেকে বুঝা যায় যে,

---

২৭. A Farouk, *The Vagrants of Dhaka City : A Socio-Economic Survey-1975* (Dhaka University : Bureau of Economic Research. 1978), P. 38

২৮. আতিকুর রহমান, *সাতক সমাজকল্যাণ* (ঢাকা : কোরআন মহল, অনার্স পাবলিকেশন্স ১৯৯০), পৃ. ১৮৬

২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০১/১১/২০০৫, পৃ. ২০

৩০. *প্রাগুক্ত*

৩১. সূরা নূর, আয়াত : ১

Dhaka University Institutional Repository

পতিতাবৃত্তি ব্যভিচারের অন্তর্গত এবং তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। কিন্তু আমাদের সমাজের অবস্থা এতই করুণ যে, দুঃস্থতার জন্য অর্থের জন্য, একটু বাঁচার জন্য লজ্জা-শরম ত্যাগ করে মা-মেয়ে পর্যন্ত একসাথে পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায়।

এরকম হাজারো লোমহর্ষক ঘটনা আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। ২০০৪ সালের বিবিসির এক সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়–রাজধানী ঢাকার বাড্ডা এলাকার এক মহিলা তার সন্তানের অর্থ জোগাড় করতে বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে কাজ করেও যখন পারেনি তখন সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, নিজের একটি চোখ বিক্রি করে টাকা জোগাড় করবে। এ ঘটনা যখন সংবাদ শিরোনাম হয় তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সেই মহিলাকে নিজের দপ্তরে ডেকে তার নিকট বিস্তারিত ঘটনা শুনে তার সেই সন্তানের লেখা-পড়ার ভার নিজে গ্রহণ করেন। এরকম ঘটনা আমাদের বর্তমান সময়ের দুঃস্থমানবতার উজ্জল দৃষ্টান্ত।

মঙ্গা পরিস্থিতি

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পরিস্থিতি বর্তমান সময়ের এক ভয়াবহ দুঃস্থ মানব পরিস্থিতি।[৩২] উত্তরাঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে সাময়িক এক মহা দুর্ভিক্ষের জন্য মানুষজন সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। সেখানে অর্থের অভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, দেখা দেয় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব। মঙ্গা কবলিত উত্তরাঞ্চলে দেখা যায় মানুষের হাহাজারী, অনাহার ও ডায়রিয়াসহ নানা রোগ-ব্যাধি। এ অঞ্চলে আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতিবারই খাদ্যাভাব দেখা দেয়, তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয় এসময় মানুষের কোনো কাজ থাকেনা অর্থাৎ মানুষ কর্মহীন জীবন কাটায়, তখন যেমন কোন কাজ থাকেনা তেমনি ঘরে কোন খাবার থাকেনা এবং অর্থেরও কোন ব্যবস্থা থাকেনা। আর এসময় হাজার হাজার গরিব শ্রমিকের ঘরে দেখা দেয় তীব্র অভাব যার জন্য সেখানের এই গরিব মানুষের না খেয়ে থাকতে হয়।

সর্বগ্রাসী অভাব বেশি দেখা যায় প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চল ও নদী ভাঙ্গন কবলিত চর এলাকায়। মঙ্গাপীড়িত অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান, আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠার আগে খাদ্যাভাবের সাথে সাথে হাজার হাজার কৃষি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। তখন সেখানে বিভিন্ন অনৈতিক অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যেমন–মহাজনী দাদন ব্যবস্থা, দুষ্ট ঋণচক্র ইত্যাদি, তখন গরু-ছাগল বিক্রি করেও সংসার চালানো কষ্টকর হয়। দাদন প্রথায় ফসল ওঠার আগেই মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সংসার চালিয়ে আবার ক্ষেতের ফসল ঘরে না তুলে মহাজনকে দিতে হয়। তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না এবং এদের জীবনে সচ্ছলতা আসে না। এখানে কোন বৃহৎ শিল্প কারখানা না থাকায় গড়ে ওঠে কৃষি ভিত্তিক জনপদ। হাজার হাজার স্বল্প আয়ের মানুষের কর্মসংস্থানের ন্যূনতম সুযোগ না থাকায় অভাব সেখানে শুধুই দীর্ঘ হচ্ছে এবং তারা দুঃস্থতার মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে।

এসময় বিভিন্ন এলাকায় ডায়রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনাহারে অখাদ্য ও কুখাদ্য খেয়ে অনেক মানুষ মারা যায়। এঅঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব দেখা দিলে তাদের মধ্যে অনিশ্চয়তা, হতাশা ইত্যাদি দেখা দেয়। এই অসহায় দুঃস্থ পরিস্থিতির জন্য তারা সাহায্য লাভের আশায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দাতব্য সেবা সংস্থার নিকট ছুটে যায়।

উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা পরিস্থিতির বাস্তবচিত্র এদেশের বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয় যা ছিল এ রকম–"উত্তরাঞ্চলের অভাবী এলাকা রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা জেলার ৮০ লাখ মানুষের মধ্যে ঈদের আনন্দ নেই।[৩৩] অভাব অনটনে কাজের সন্ধানে বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাওয়া এই পাঁচ জেলার ৩৫ লাখ কিষাণ মজুর ঈদ উপলক্ষে এখন ফিরছে শূন্য হাতে। কাজের সন্ধানে গিয়ে তাদের অধিকাংশই কাজ জোটাতে পারেনি। এই সব মানুষ ত্রাণ বিতরণের খবর পেয়ে সেখানে জড়ো হচ্ছে।

---

৩২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭/০৮/২০০৫, পৃ. ৪; *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০/০৮/২০০৫, পৃ. ১; *দৈনিক নয়াদিগন্ত*, ১৭/০৮/২০০৫, পৃ. ১
৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০১/১১/২০০৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

লিস্টে নাম না থাকায় ত্রাণ না পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে। কুড়িগ্রামের যাত্রাপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আইয়ুব আলী সরকার জানান,[৩৪] এই ইউনিয়নের ২২ হাজার মানুষের ১৩ হাজারই এখন অভাবগ্রস্ত। মঙ্গা কবলিত মাত্র ৩ হাজার ৪শত অভাবী মানুষ ভিজিএফ, ভিজিডি, বিশেষ ভিজিএফের মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে। তিস্তার ভাঙ্গনে গত ১০ বছরে এই ইউনিয়নের ১৫টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।[৩৫] সহায় সম্বল হারা নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা ১৫ হাজারেরও বেশি। নদী ভাঙ্গা গৃহহীন অধিকাংশ পরিবার তিস্তার চরে ভগবতীপুর আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেই তাদের বাস। এবার অকাল বন্যা ও জলাবদ্ধতায় যাত্রাপুর ইউনিয়নের আবাদ করা ফসল ধান, পাট, ইক্ষু, শাক-সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। অভাব আর মঙ্গা কবলিত মানুষের তুলনায় ত্রাণ খুবই অপ্রতুল, সদর উপজেলার ঘোগাদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মালেক ইউপি অফিস চত্বরে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ভিজিএফ কার্ডের এ মাসের খাদ্য (চাল) বিতরণ করছিলেন। ২৮ হাজার জন অধ্যুষিত এই ইউনিয়নের ৩২টি গ্রামের মধ্যে ১৪টি গ্রামই হচ্ছে দুর্গম চর। এই ইউনিয়নের নদী ভাঙ্গনে এই বছরেই ৫টি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বছরে মঙ্গা কবলিত হয়েছে ২০ হাজার মানুষ। খাদ্য সহায়তা হিসেবে পেয়েছে মাত্র ৩ হাজার ২৭৪ জন। চেয়ারম্যান জানান, অনাহারী মানুষ ত্রাণ বিতরণের খবরে ছুটে আসছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। কিন্তু তারা লিস্টের বাইরে খাদ্য সহায়তা দিতে পারছেনা। সব মানুষের আহাজারী "পানি খায়া অজা থাকি, পানি খাইয়া অজা ভাঙ্গি, এবার ঈদও হবে পানি খায়া"।[৩৬]

রংপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, রংপুর অঞ্চলে মঙ্গার প্রভাবে কয়েক লাখ অভাবী দিনমজুর ভয়াবহ খাদ্য সংকটে পড়েছে। খাদ্যাভাবে কেবল তিস্তার চরাঞ্চলেই প্রায় ১লাখ মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। অনেকেই পানি খেয়ে রোজা পালন করছে। সরকারিভাবে ৪ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি করা হলেও পরিবারের অনেকের চাল কেনার মত কোন সমর্থ নেই। শহরে এখন গ্রাম ছেড়ে আসা অভাবী মানুষ ভিড় জমাচ্ছে। অনেকেই হাত পেতে বেঁচে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে। রংপুরে গতবারের চেয়ে এবার মঙ্গা পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করেছে। সবচেয়ে দুর্ভোগে পড়েছে গঙ্গাচড়া ও কাউনিয়া উপজেলার তিস্তা নদীর চরাঞ্চলের মানুষ। আমন ধান কাটা মাড়াই মৌসুম শুরু হতে আরো ১মাস বাকী থাকায় ততদিন পর্যন্ত এসব পরিবারকে মঙ্গার ঘানি টানতে হবে। অভাবী দিনমজুর পরিবারগুলো গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি ক্রমাগত ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। দিন মজুর পরিবারের নারী ও পুরুষরা আগাম শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। গঙ্গাচড়ার তিস্তার চরে মঙ্গাপীড়িত গ্রামগুলো ঘুরে এ দৃশ্য দেখা যায়।[৩৭] কুড়িগ্রাম থেকে তোফায়েল হোসেন জানাচ্ছেন : কুড়িগ্রামের মঙ্গা পরিস্থিতি এখন ভয়াবহ। এখন পর্যন্ত অনাহারে ৩জন এবং অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯জন মারা গেছে। নিরন্ন মানুষের আহাজারিতে ভরে উঠেছে গোটা এলাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রায় প্রতিদিন ভুখা মিছিল করছে, দুর্গত এলাকা ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।[৩৮] এদিকে সোমবার কুড়িগ্রামের চিলমারীর বাসন্তী গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে মঙ্গার ভয়াবহ রূপ। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের প্রতীক বাসন্তীর অবস্থা এখনও একই রকম। বোবা বাসন্তীর গায়ে এখনও ছেঁড়া শাড়ী, সামনে গেলে হাত দিয়ে পেট থাপড়ে ক্ষুধার কথা ইশারায় বলে। ২০০৩ সালে রমনা ইউনিয়নের জোড় গাছ বাজারের সামনে ব্রহ্মপুত্রের মধ্যখানে জেগে উঠা একটি নতুন চরে বাসন্তীসহ ৭০টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। কারিতাস নামক একটি এনজিও এসব পরিবারকে একটি করে টিনের ঘর তুলে দিয়েছিল। ২০০৪ সালে আবারো ভাঙ্গনের কবলে পড়লে ৩৮টি পরিবার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলে যায়। চলতি বছরে চরটি ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেলে ৩২টি পরিবার এসে আশ্রয় নেয় মুদাফৎখানার পাশের একটি নতুন চরে। বাসন্তী এখন এ চরে ভাই বিশুর

---

৩৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯/০৮/২০০৫, পৃ. ১
৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১/১১/২০০৫, পৃ. ১; *দৈনিক যুগান্তর*, ০৭/১১/২০০৫, পৃ. ১
৩৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১/১১/২০০৫, পৃ. ১
৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭/০৮/২০০৫, পৃ. ৪; *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৬/০৮/২০০৫, পৃ. ১; *দৈনিক যুগান্তর*, ১৭/০৮/২০০৫, পৃ. ১; *The Daily New Nation*, 15/08/2005, P. 1
৩৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের সঙ্গে থাকে। বোন বাসন্তী, স্ত্রী নিরবালা ২ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং জামাই নিয়ে বিশুর এখন ৬জনের সংসার। পেশা মাছ ধরা। বিশুর স্ত্রী নিরলার নামে একটি ভিজিডি কার্ড আছে। বাসন্তির নামে আছে একটি ভিজিএফ কার্ড। বিশুর মাছ ধরা এখন বন্ধ, ভিজিডি কার্ডের আটা এবং বাসন্তির ভিজিএফ কার্ডের চাল দিয়ে এক বেলা খেয়ে দিন চলছে। শুধু নুন মথলে রুটি কিংবা ভাত খেতে হয় একবেলা। গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ঘরে কোন খাবার না থাকায় উপোষ ছিল। শনিবার ভিজিএফ কার্ডের ১০ কেজি চাল পেয়েছে। তারই একটু ভেজে দুপুরে খেয়েছে।

গ্রামের অন্যদের অবস্থা আরো করুণ। সাধনা (৪৫) ও কাঞ্চন (৪০) দুইজনকে একটি ভিজিডি কার্ড দেয়া হয়েছে। সাড়ে সাত কেজি করে আটা দু'জনকে ভাগ করে নিতে হয়। এ আটা কয়েকদিন চললেও এরা এখন উপোষে দিন কাটাচ্ছে। ...বিশেষত তিস্তা ও ধরলা নদীর তীরবর্তী ও চরাঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষাধিক মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। অনেকে খাদ্যাভাবে কচুর মুড়া, কলা গাছের থোড় ও নানা ধরনের অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়ে এবং অপুষ্টিতে ভুগে ডায়রিয়াসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ...।[৩৯] নীলফমারী সংবাদাতা জামান জানান,[৪০] জেলার সদর ডেমরা, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরীগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলার লাখ লাখ কর্মহীন মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। ১৬ লক্ষাধিক মানুষের মধ্যে ৫/৬ লাখ মানুষ ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কৃষি কাজের অভাবে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়েছে। আয়ের কোন উৎস নেই। কর্মহীন মানুষরা কাজের সন্ধানে জেলা সদরে ছুটছে। ৭/৮ দিনেও ভাত না পেয়ে বাধ্য হয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। জেলার ৬টি উপজেলার প্রায় ১৫ হাজার মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত এবং ১৫ জন মারা গেলেও সিভিল সার্জন দপ্তর ৫জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে। হাসপাতালগুলোতে প্রতিদনি ২/৩শ ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগী আসছে। জেলার ৬০টি ইউনিয়ন ও ৪টি পৌরসভার মোট ১ লাখ ২৫ হাজার ৫শত ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে মাসে ১০ কেজি করে চাল দেয়া হয়েছে। মাসে ১৬৫ টাকা করে ১৫,০৭২ জনকে দুঃস্থ, বিধবা ও বয়স্ক ভাতা প্রদান করায় তারা ভিজিএফের আওতা বহির্ভূত। মাসে ১০ কেজি চাল ৪/৫ জনের একটি পরিবারের ২/৩ দিনের খাদ্য মাত্র। কাবিখা, কাবিটা ও টেস্ট রিলিফের জন্য চাল ও অর্থ বরাদ্দ হলেও অদ্যাবদি কার্যক্রম শুরু হয়নি। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা গ্রামীণ ব্যাংক-৯৯ হাজার, আশা-৬০ হাজার, ঠেঙ্গামারা ২০-হাজার, প্রশিকা-৩১ হাজার, ব্র্যাক-৪০ হাজার দুঃস্থ মহিলাকে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করে। একই মহিলা একাধিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। অনেকে কিস্তির টাকার ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিক অকাল বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ফলে এনজিওসমূহের সাপ্তাহিক কিস্তির টাকা আদায় বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। গ্রামের কৃষি শ্রমিকরা ১৫/২০ টাকায় আগাম শ্রম বিক্রয় করছে। অনেকে ক্ষেতের আমন ধান ১৫০/২০০ টাকায় বিক্রি করছে। বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে গ্রামে গেলে বুভুক্ষু মানুষ উপচে পড়া ভিড় করছে।"[৪১]

বস্তি জীবন

একবিংশ শতাব্দীর চরম উন্নতির পথেও দুঃস্থ মানবতার জন্য এক বাস্তব পরিস্থিতি ও স্বরূপ দেখা যায় নগর বস্তিবাসীদের জীবনে। বর্তমান বিশ্বের মানুষের এক বিরাট অংশ দুঃস্থতার মধ্যে বস্তিতে বাস করে। পৃথিবীর বৃহত্তম বস্তি বলা হয় মুম্বাইয়ের বস্তিকে।[৪২] এরকম হাজারো বস্তি রয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর বন্দর ও নগরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য বস্তি। বস্তির জনগণ, যেখানে তারা অমানবিক দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে দিন যাপন করতে বাধ্য

---

৩৯. *প্রাগুক্ত*

৪০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০১/১১/২০০৫, পৃ. ১,

৪১. *প্রাগুক্ত*

৪২. *প্রাগুক্ত*, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ও নগর, বিশ্ব বসতি দিবস সংখ্যা, ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়। আমাদের দেশে দিন দিন বস্তিবাসী বাড়ছে। শহর-বন্দরের বস্তিবাসীর সংখ্যা ৫০ লাখ এবং খোদ রাজধানীতেই এই সংখ্যা ২৮ লাখ।[৪৩] বস্তির জনগণ সংখ্যায় দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ হল প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক যাতাকলে পিস্ট হয়ে গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষ শহর ও নগরমূখী হয়। তখন এসকল মানুষ শহর ও নগরীতে এসে প্রথমে বেছে নেয় কুলি, দিনমজুর, ফেরিওয়ালা, রিক্সা চালানো থেকে শুরু করে ফুটপাতের হোটেল বয় ও বেয়ারার কাজের মত নিম্নমানের কাজ। আর এসকল মানুষের ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীরা কাজ নেয় বাসা বাড়িতে বা পুরানো কাগজ, প্লাস্টিক দ্রব্যসহ বিভিন্ন রকম দ্রব্য কুড়ানোর পেশায়। আর রাতে ঘুমানোর জন্য আনাচে-কানাচে গড়ে তোলে নিজের মাথা গোঁজার ঠাই।

এক সমীক্ষায় বলা হয়-"আমাদের দেশের পুরানো চারটি বিভাগীয় শহরে ৯২৩টি বস্তিতে প্রায় ৫০ লাখ ছয় হাজার লোক বসবাস করছে। চট্টগ্রাম নগরীতে প্রায় এক হাজার ৮১৪টি বস্তিতে প্রায় ১৮ লাখ ৩১ হাজার লোক বসবাস করছে। খুলনা নগরীতে ৪৭০টি বস্তিতে ১ লাখ ৭২ হাজার এবং রাজশাহীতে ৫৩৯টি বস্তিতে ১ লাখ ৪৮ হাজার বাসিন্দা বসবাস করছে। ঢাকা মহানগরীতে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বস্তি, এসব বস্তি কখনো নগরের দরিদ্র অধিবাসীদের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছে আবার কখনো রাজনৈতিক ছত্রছায়ার অসামাজিক কাজ, মদ, গাঁজা, ফেন্সিডিল, হেরোইন, অস্ত্রের ব্যবসা চালানোর জন্য গড়ে উঠে। দরিদ্র মানুষের আশ্রয়স্থলের নামে সংঘবদ্ধ চক্র বছরের পর বছর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকের ডগায় এই বস্তিতে বে-আইনী তৎপরতা চালাচ্ছে। ঢাকা নগরীতে ২৮ লাখ ৪৩ হাজার লোক বস্তিতে বাস করে। এদের মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে বস্তিতে ভাড়াটে হিসেবে এবং শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ সরকারি জমিতে ঝুপড়ি ঘরে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ছাড়াই বাস করছে। বস্তিতে মালিকানার বিরোধ কিংবা আধিপত্য বিস্তারের জের ধরে রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েও ফেলা হয়।"[৪৪] আমাদের দেশের রাজধানী মহানগরের এক শ্রেণীর অসাধু লোক খাস, পতিত ও সরকারি জমিতে অল্প আয়ের মানুষের জন্য বস্তি তৈরী করে রাজধানীর আনাচে-কানাচে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে তুলছে।

আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান জীবনযাত্রার মান ও দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থার এটি এক বাস্তব সত্য ঘটনা। যা উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদেরকে নিঃস্ব বলে মনে হয়। আমাদের সমাজে প্রতিটি স্তরে লক্ষ্য করা যায় অভাব, অ-ব্যবস্থা, অ-স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আমাদের দেশ আল্লাহ্ তায়ালার দেয়া এক মনোরম সুন্দর যা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় অবশ্যই সুন্দর; কিন্তু সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রা এক দারিদ্র্যের পরিচয় বহন করে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, আর গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু লোকসংখ্যা এত বেশি যার জন্য মানুষ কাজের সন্ধানে শহরমুখী হতে বাধ্য হয়।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও সেই আলোকে আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে একথা বলা যায়; কিন্তু এখনও এখানে বিভিন্নভাবে দুঃস্থমানবের করুণ চিত্র ফুটে ওঠে, যা মানব মনকে সত্যিই ব্যথিত করে। অর্থের অভাবে আজও আমরা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করি। আমাদের দেশে প্রতিবছর যে বাজেট পেশ করা হয় তাও আবার বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এরূপ পরিস্থিতিতে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে। এলক্ষ্যে এদেশে বিভিন্ন স্বেচ্ছাধর্মী সেবা সংস্থা গড়ে উঠেছে। যারা আর্তমানবতায় কাজ করে যাচ্ছে।

---

৪৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৮/১০/২০০৫, পৃ. ৩; *দৈনিক যুগান্তর*, ১০/১০/২০০৫, পৃ. ৪

৪৪. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৮/১০/২০০৫, পৃ. ৪, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ০৬/১০/২০০৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুঃস্থ মানবকল্যাণে মহানবী (সঃ)-এর কর্মসূচী

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ মানবকল্যাণে মহানবী (সঃ)-এর কর্মসূচী

আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ (সঃ)-কে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য কল্যাণস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা দিয়েছেন- "নিশ্চয় আমি তোমাকে বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি"।[১]

আল্লাহ্পাকের এই বাণীর প্রতি লক্ষ্য করলে একথা পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর সারাজীবন ছিল মানবকল্যাণের জন্য নিয়োজিত। মানবতার এই মুক্তির দূত ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে[২] মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন পৃথিবীতে আগমন করেন তখন সমগ্র বিশ্বের সার্বিক অবস্থা ছিল তমসাচ্ছন্ন, বিশেষ করে আরব ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। সেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতির প্রচলন ছিল। সেই আরব সমাজে নারীর কোন সামাজিক মান-মর্যাদা ছিল না। নারীকে তারা অমঙ্গল মনে করত, এমনকি নবজাতক কন্যা সন্তানকে তারা জীবন্ত পুতে রাখতো। পিতার সম্পত্তিতে তাদের কোন অধিকার থাকতোনা, সেই সমাজে মানুষ বর্তমানের পণ্যের মত কেনা-বেচা করা হত। সামান্য ঘোড়া দৌড় প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে 'আব্স'[৩] ও 'যুবিয়ান'[৪] এই দুই গোত্রের মধ্যে 'দহিস'[৫] ও 'ঘাবড়া'[৬] নামক যুদ্ধ চলে কয়েক যুগ ধরে। যার ফলে সমাজে সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসে চরম দারিদ্র্য। সেই সমাজে মিথ্যা, পাপাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ, জুয়া, নারী, অনাচার, অবিচার, সুদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অনৈতিকতা আরবসহ বিশ্ব মানবকূলের এক সাধারণ স্বভাবে পরিণত হয়। এই ঘোর দুর্দিনে বিশ্ব মানবতার মুক্তিদাতা ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য একজন আপোষহীন মহামানবের আবির্ভাব ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন। মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহ্ তায়ালা সেই মহামানবরূপে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তাঁর স্বভাব, চরিত্র, সত্যবাদিতা, সাধুতা, পবিত্রতা, সংযম ইত্যাদি গুণাবলী দ্বারা তিনি সকল মানুষের মন জয় করতে পেরেছিলেন। তিনি সকল মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে বিভিন্নমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি দুঃস্থ মানবকল্যাণে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা সেই বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

শান্তিসংঘ গঠন[৭]

৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে[৮] বার বছর বয়সের সময় মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার কাজে সিরিয়া যান। এই সময় পবিত্র জ্বিলকদ মাসে মক্কার 'কুরাইশ' ও 'হাওয়াযিন' নামক গোত্রের মধ্যে

---

১. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

২. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *আসসীরাতুন নববিয়্যাহ* (মিশর : মাতবা'আ মুসতফা আল্-বা'বিল হলবী, ১৯৫৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫; Muhammad Husyan Haykal, *The life of Muhammad*, Translated by Ismail Ragi A.al Faruki (Aligarh : Cresecent Publishing, 1976), P. 47; ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)*, শহীদ আখন্দ অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৮৭), পৃ. ১২৭; Syed Ahmed Khan Bahadur, *Essays on te Life of Muhammad* (Delli : Idarah-1 Adabiyat-1, 1870), Vol. 1, P. 100

৩. মুল্লা মজনুদ্দিন, *সিরাতে মস্তফা*, (দিল্লী : মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৫৭), পৃ. ৫৭, ৫৮; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস*, মাওলানা মুহম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী ১৯৮৫) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭

৪. মুল্লা মজদুদ্দীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭, ৫৮; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৫. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭; অধ্যাপক কে. আলী, ইসলামের ইতিহাস (ঢাকা : আলী পাবলিকেশন্স, ১৯৭৬), সংস্করণ-১, পৃ. ১৪

৭. আবু মুহাম্মদ 'আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮; Muhammad Husyan Haykal, *ibid*, P. 57, 58; আল্লামা সুহায়লী, *রাউদুল উনুফ* (মিশর : ১৩৩২ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; মুহাম্মদ ইবন সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা* (লিডেন : মাত্বা'আ বেরেল ১৩২২ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

'হারবুল ফুজ্জার'[৯] নামে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন; কিন্তু কাউকে আঘাত করেননি, শুধুমাত্র তীর কুড়িয়ে চাচা আবু তালিবের নিকট জমা দেন। এই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তাঁর অন্তর কেঁদে ওঠে। এ আত্মঘাতি যুদ্ধ মনে করে কয়েকজন উৎসাহী যুবককে সাথে নিয়ে তিনি একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন, যা ইতিহাসে 'হিলফ-উল-ফুজুল' নামে প্রসিদ্ধ। এ শান্তিসংঘের বিশিষ্ট চারজন ব্যক্তির নামের সাথে 'ফজল' শব্দটি ছিল এ জন্য শান্তিসংঘের নাম এভাবে নামকরণ হয়েছে বলে ইতিহাসবিদগণ মনে করেন।[১০] আর সেই চারজন বিশিষ্ট সভ্যের নাম হল[১১] :

১. ফজল;

২. ফাজেল;

৩. ফাজায়েল;

৪. মোফাজ্জেল

মুহাম্মদ (সঃ) এদের নিয়ে আর্ত-মানবতার সেবাদানের জন্য যে সমিতি গঠন করেন তার মূলনীতি ছিল[১২] :

১. সমাজের অসহায় ও দুর্গতদের সেবা;

২. অত্যাচারীকে বাধা দান;

৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা;

৪. দেশের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা;

৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।

আলোচ্য শান্তিসংঘে লক্ষণীয় যে, এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ব্যবস্থা মুহাম্মদ (সঃ) মাত্র বার বছর বয়সের সময় নিতে পেরেছিলেন, যা তাঁর চরিত্রের মানবসেবার দিক নির্দেশ করে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যুদ্ধের ফলে অসহায় মানুষের হাহাকার, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার অপ্রতুলতা। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক যুগে মহামনীষিগণ এ সত্য উপলব্ধি করে মানব সেবার প্রতি উৎসাহ দান করেছেন। বর্তমান সময়েও আমরা দেখতে পাই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইরাকে প্রতিদিন কতলোক অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। আর এ দৃশ্য দেখে যেকোন মানুষের হৃদয় কেঁদে ওঠে। কাজেই উক্ত শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করে মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্বমানবতার সেবাদানের অগ্রিম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আরব ইতিহাসে এটিই সর্বপ্রথম কল্যাণ সংস্থা। মুহাম্মদ (সঃ) যে ভবিষ্যতে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এই সংগঠনের মাধ্যমে তা পরিষ্কার বুঝা গেল।

কা'বা ঘরে হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপন[১৩]

হিলফ-উল-ফুজুল বা শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করার পর মুহাম্মদ (সঃ) আরও একটি আসন্ন যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে আরববাসীদের রক্ষা করেন। পবিত্র কা'বা ঘরে 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালপাথর নামে একটি পাথর রয়েছে যে পাথরটি অত্যন্ত সম্মানের। মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবদ্দশায় ২৫বছর বয়সকালে কাবাঘর সংস্কার করা হয়, আর এ সময় উক্ত পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করা নিয়ে গোত্রসমূহ দ্বন্দ্ববিবাদে জড়িয়ে

---

৮. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮; ইবনে ইসহাক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬

৯. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র), *সীরাতুল মুস্তফা সা.*, কালাম আযাদ অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৮; আল্লামা শিবলী নো'মানী, *সীরাতুন নবী*, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত (ঢাকা : প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৭৫), ২য় খণ্ড, পৃ. ১

১০. Muhammad Husayn Haykal, *ibid*, P. 65; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

১১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

১২. কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপুরী, *রাহমাতুল্লিল আলামীন* (লাহোর : শায়খ গোলাম আলী এন্ড সন্স, তা. বি.), পৃ. ১৯২

১৩. *সীরাতে ইবনে হিশাম*, আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯২), সংস্করণ-৩, পৃ. ৪৭; মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর জীবন চরিত*, মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৮), পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সঃ) এক কৌশলের মাধ্যমে তা মীমাংসা করেন। তিনি তার গায়ের চাদর বিছিয়ে তার উপর পাথরখানা রেখে প্রত্যেক গোত্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের চাদরের কোণা ধরে পাথরটি বহন করে যথাস্থান নিতে বলেন, তারপর তিনি স্বহস্তে পাথরটি যথাস্থানে রাখলেন তার এই বিচক্ষণ কাজে সকল গোত্রই খুশী হল।[১৪] এখানে তিনি সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়ানোর জন্য প্রত্যেক গোত্রকে খুশী করার জন্য যে নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং নিজেস্ব বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সমস্যার সমাধান দেন তাঁকে অবশ্যই মানবতার জন্য কল্যাণজনক মনে করা হয়। তাঁর এই কল্যাণ প্রচেষ্টা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য সমগ্র আরবজাতি একটি অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই ঘটনাটিও পরবর্তী জীবনে তাঁর শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উজ্জল ভূমিকা পালন করে। আসন্ন যুদ্ধ এড়ানোর কৌশল ও কমিটি গঠন তার সেবাদানের দৃষ্টান্ত বহন করে।

কোরাইশদের বয়কট[১৫]

মক্কার কুরাইশগণ যখন দেখল যে, মুসলমানগণ আবিসিনিয়াতে নির্বিঘ্নে ধর্ম-কর্ম পালন করছে তখন মক্কার মুসলমানদেরকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা মনে করল যে, হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের সহায়তার জন্য মুহাম্মদ এত সাহস পেয়েছে অতএব তাদের ও মুহাম্মদকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। যে ব্যবস্থাকে প্রচলিত সমাজে আমরা একঘরে বলে থাকি। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তাদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক লেন-দেন, কথা-বার্তা ও যেকোন ধরণের যোগাযোগ বন্ধ করতে হবে। কেউ তাদের সাথে আত্মীয়তা করতে পারবেনা। এমনকি কেউ যদি তাদের কোন রকম সাহায্য করে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। এই বয়কট সফল করার জন্য কুরাইশগণ কঠোর ব্যবস্থা নিল।[১৬]

হঠাৎ এমন কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে তা মুহাম্মদ (সঃ) বুঝতে পারেন নি। আবার এজন্য অধিক পরিমাণ খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারেন নি, যার কাছে যা ছিল তা নিয়েই তারা 'শিয়াবে আবু তালেব' নামক গিরি সংকটে আশ্রয় নেয়। বাইরে থেকে সরবরাহ না থাকায় তাদের গচ্ছিত খাদ্য অল্পদিনেই শেষ হয়ে গেলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। মক্কাবাসীদের বয়কটের ফলে বাইরে থেকে খাদ্য আসা বন্ধ। এ পরিস্থিতিতে যতই দিন যেতে থাকে ততই মুসলমানদের খাদ্যাভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এভাবে অতিবাহিত হতে থাকে। অসহায় ছোট শিশুদের ক্ষুধা ও পানির অভাবে ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। এভাবে একে একে দীর্ঘ দুই বছর কেটে যায়। এই অসহায় অবস্থা প্রসঙ্গে সাহাবাগণ বলেছেন, এই সময় আমরা গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করতাম। পানীয় জলের অভাবে ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণের ফলে আমাদের মল, ছাগ-মেষাদির মলের ন্যায় হয়ে গিয়েছিল।[১৭]

সাহাবাদের এই উক্তিতে বুঝা যায় যে, তারা মারাত্মক এক পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে গাছের লতাপাতা ভক্ষণ করে জীবন-ধারণ করেছিলেন। আর এই অবস্থায় মুহাম্মদ (সঃ) সকলকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে ধৈর্যধারণ করার জন্য সান্ত্বনা দিতেন। শেষপর্যন্ত আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে এ অবস্থা থেকে মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর অনুসারীগণ রক্ষা পান। কুরাইশদের বয়কটের ফলে মুসলমানগণ যে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে সেই অসহায় অবস্থার মোকাবেলা করার জন্য মুহাম্মদ (সঃ)-এর গৃহীত পদক্ষেপকে ইতিহাসে মানবকল্যাণ হিসেবে মনে করা হয়।

---

১৪. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আবদুল বাকী আযযররকানী, *শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্য* (মিশর : মাতবা' আতুল আযহারিয়া, ১৩৩৮ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩; ইবনে হিশাম, *আসসীরাতুন নববিয়্যাহ*, পৃ. ১৯৭; মুহম্মদ আল-গাযালী, *ফিকহুস সীরত* (মিশর : দারুল কিতাবিল আরবী, তা.বি), পৃ. ৬৩; খাদারী বিক, *মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়া* (মিশর : আল্-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, ১৩৮২ হিঃ) ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫

১৫. নাদরাতুন নাঈম, *মহানবী (সা)-এর জীবনী বিশ্বকোষ*, মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল, ২০০০), পৃ. ১৩৬; Afzalur Rahman, *ibid*, P. 8; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

১৬. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামের ইতিহাস* (ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭৬) পৃ. ১০৫

১৭. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মদীনা সনদ[১৮]

মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিযরত করেন। মদীনায় যেয়ে তিনি মানবকল্যাণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। মদীনায় তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমানসহ বিভিন্ন জাতির লোক বাস করতো। তিনি এই সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে সকল রকম পার্থক্য ও বিভেদ দূর করে একটি সাম্যবাদী ও জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আর এলক্ষ্যে তিনি মদীনা ও আশপাশের অঞ্চলসমূহের বিভিন্ন ধর্মের লোকদের নিয়ে একটি সনদ স্বাক্ষর করেন যাকে Charter of Madina বা 'মদীনা সনদ' বলা হয়। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মদীনা সনদ প্রণয়ন করা হয়।[১৯] এই সনদে মানুষের সকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়। সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও দুর্বল, অসহায়দের সাহায্য-সহানুভূতির বিষয়ও উল্লেখ করা হয়। এই সনদকে বর্তমান সময়ের 'Magna Charta'-র[২০] সাথে তুলনা করা চলে। এই সনদে মোট ৪৭টি শর্ত ছিল[২১] তার মধ্য থেকে আমরা কতিপয় উল্লেখ করতে চাই—

১. সনদে স্বাক্ষরকারী কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকলে মিলে তার প্রতিরোধ করতে হবে;

২. কেউ কুরাইশদের সাথে কোন গোপন সন্ধি করতে পারবেনা, তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবেনা, কেউ তাদের সংকল্পেরও সহায়তা করতে পারবেনা;

৩. মদীনা আক্রান্ত হলে সকলে মিলে যুদ্ধ করে মদীনাকে রক্ষা করতে হবে;

৪. সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করতে পারবে;

৫. কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা তার ব্যক্তিগত অপরাধ বলে গণ্য হবে। এজন্য তার জাতিকে দায়ী করা চলবে না;

৬. মুসলমানগণ সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টা করবে কোনভাবেই তাদের ক্ষতি করা যাবে না;

৭. উৎপীড়িতকে রক্ষা করতে হবে;

৮. প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে;

৯. মদীনায় নরহত্যা বা রক্তপাত, চুরি অবৈধ ঘোষণা করা হল;

১০. দিয়ত আগের মতই থাকবে;

১১. অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি পেতে হবে। পাপী ও অপরাধীকে ঘৃণা করতে হবে;

১২. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য করতে হবে।[২২]

উক্ত সনদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহযোগিতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের পরিকল্পনাসহ নানামুখী জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর দিক নির্দেশনা প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য মদীনা সনদকে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত বলা চলে, যা মুহাম্মদ (সঃ)-এর মানবসেবার এক কৌশল পত্র।

---

১৮. Muhammad Husayn Haykal, *ibid;* Afzalur Rahman, *ibid*, P. 11, 12; ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রসূলুল্লাহ (সা.)*, পৃ. ১৯-২২; আকরাম ফারুক, *সীরাতে ইবনে হিশাম*, পৃ. ১৩৮

১৯. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

২০. মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন* (ঢাকা : ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, জুলাই ১৯৯৮), পৃ. ৪৪২; আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২, ৫০৩

২১. মাওলনা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯

২২. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০২

Dhaka University Institutional Repository

পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধীকার ঘোষণা[২৩]

তৎকালীন সময়ে আরব সমাজে নারীর সামাজিক মান-মর্যাদা ছিল না। তারা নারীকে মন্দ ভাগ্য বলে মনে করত, তাই তাদের জীবন্ত কবর দিত। যারা দাসী ছিল তাদের সাথে নির্দিধায় ব্যাভিচার করা হত। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের কোন অংশ থাকতোনা। একই পিতার সন্তান হওয়া সত্বেও পুত্রসন্তান পিতার সম্পদের অংশ পাবে কিন্তু কন্যাসন্তান সেই অংশ থেকে বঞ্চিত। এই নীতি দেখে মুহাম্মদ (সঃ) মনে করলেন এই নীতির পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। এ জন্য তিনি সর্বপ্রথম পিতা ও স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করেন। এটা তার মানবকল্যাণের এক যুগান্তকারী সংস্কার। বর্তমান সময়ে নারী অধিকার আদায়ের জন্য নারীদের রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে দেখা যায়। অথচ মুহাম্মদ (সঃ) তাদের সামাজিক মর্যাদা দিয়েছেন সেই অনেক আগেই। তাদেরকে অত্যাচার করতেও নিষেধ করা হয়েছে। আর এজন্য ইসলাম তালাকের বিধান চালু করেছে। লক্ষণীয় যে, বিবাহের পর যৌতুকের জন্য অনেক সময় নারীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত হতে হয়, আর এ অবস্থার সময় অত্যাচার বন্ধের জন্য ইসলাম তালাকের ব্যবস্থা করেছে। পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীদের অংশ প্রদানের আইন বাস্তবায়ন করে মুহাম্মদ (সঃ) অসহায় মানুষের সেবা-দানের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এতিম, মিসকীন ও অসহায়দের সাহায্য

মুহাম্মদ (সঃ) বিশ্বমানবতার পরম বন্ধু, সমাজের সকল মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন আদর্শ মহামানব। তিনি জন্মের পূর্বেই পিতা ও অতি অল্প বয়সে মাকে হারিয়ে সমাজের এক অনাথ বালক বলে পরিচিতি লাভ করেন। আর এজন্য তিনি অনাথ, অসহায় ও গরিবদেরকে বেশি ভালবাসতেন ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের সাহায্য করতেন। এতিমের অধিকার রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন- "ইয়াতীম প্রাপ্ত বয়স হওয়া পর্যন্ত সৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তাদের অর্থ-সম্পদের নিকটেও যেওনা আর ওয়াদা পালন কর কারণ ওয়াদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[২৪]

আবার এই শ্রেণীর অসহায়দের প্রতি সদয় হয়ে হযরত উমর (রাঃ) বলেন, "যখন তোমরা ফকির মিসকীনকে কিছু দেবে তখন তাকে ধনী বানিয়ে দেবে।"[২৫]

তিনি সমাজের এই এতিম, মিসকীন অনাথ, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের কল্যাণের জন্য সাধারণ মানুষকে উৎসাহ দান করেছেন। তিনি বলেছেন- "এতিম মিসকীনের সাহায্যকারী আল্লাহর পথে জিহাদকারী বা দিনভর রোযাকারী বা সারারাত দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর মত।"

তিনি এদের সাহায্য করার জন্য মানুষকে উৎসাহ দান করেছেন। যেমন- তাঁর সহধর্মিনী হযরত আয়শাকে লক্ষ্য করে বলেছেন- "হে আয়শা! গরিব মিসকীনদের ভালবাস, তাদেরকে নিকটে আশ্রয় দাও আর এমন করলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে নিকটে স্থান দিবেন।"[২৬]

যে সন্তানের পিতা-মাতা মারা যায় তাদেরকে আমরা এতিম বলি। আবার তারা অপ্রাপ্ত বয়স্ক, আর এ অবস্থায় যখন পিতা ধন-সম্পদ রেখে মারা যায় অথচ এই সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও জমা-জমি চাষাবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে সংসার গোছানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ সকল দিক বিবেচনায় তারা অসহায়। এই সুযোগে স্বার্থান্বেষী মহল যেন তাদের সম্পদ অপহরণ না করে সেজন্য ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে। আল্লাহ্ বলেন–"যারা এতিমের মাল ভক্ষণ করে জুলুম করে আসলে তারা আগুন দিয়ে নিজেদের পেট ভরে।"[২৭]

---

২৩. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্ব নবীর আদর্শ* (ঢাকা। স্টাডি পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০২), পৃ. ১০৭

২৪. সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৩৪

২৫. ড. মুহাম্মদ আহমদ, *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা* (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, তা.বি), পৃ. ৩

২৬. আবু ইসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী, *সুনানুত তিরমিযী* (দিল্লী : মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৫০), ১ম খণ্ড

২৭. সূরা নিসা, আয়াত : ১০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম *ইসলাম ও মানবাধিকার* গ্রন্থে বলেন-"ইয়াতীমের পৃষ্ঠপোষকতা ও অভিভাবকত্ব অবশ্যই গৃহীত হতে হবে। তা পরিবারেরই কোন লোক গ্রহণ করবে, না হয় সমাজের মধ্য থেকে কেউ। উভয় অবস্থায়ই তার কর্তব্য হলো, "ইয়াতীমের ধন-মালের রক্ষণা বেক্ষণের সাথে সাথে তার পূর্ণবয়স্কতা লাভ ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠার ব্যাপারটি যাচাই করতে থাকা।"[২৮]

মহান আল্লাহ্ তায়ালার বিভিন্ন বাণী ও রাসূল (সঃ)-এর উৎসাহমূলক পরামর্শ সমাজের এতিম, মিসকীন ও অসহায়দের মনে শান্তির বীজ বপন করে।

দরিদ্রদের জন্য অর্থ ব্যয়

মুহাম্মদ (সঃ) প্রথম থেকেই অনুধাবন করেন যে, প্রচলিত সমাজে দারিদ্র্য এক দুর্বিসহ বোঝা যা মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে যায়। ইসলামকে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের জন্য মনোনীত জীবন বিধান করে দিয়েছেন। আবার ইসলামের সাথে জড়িয়ে আছে ইসলামী অর্থনীতি যা দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে ইসলামী অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক।

বর্তমান বিশ্বে দারিদ্র্য এক বিরাট সমস্যা। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে সমাজের হতভাগ্য, দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব, দুঃস্থ, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চয়তা প্রদান এক বড় চ্যালেঞ্জ, আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামের অর্থ সংক্রান্ত ভূমিকা বাস্তব ফলপ্রসূ। যেমন- ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ* গ্রন্থে বলেন-"ইসলাম আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রেত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, শ্রেণী, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র, নির্বিশেষে সকল মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সর্বপ্রকার সংকট সমস্যার নির্ভুল, নিখুঁত, সুষম ভারসাম্য ও বাস্তব উপযোগী সমাধান পেশ করেছে ইসলাম।"[২৯]

আমরা দেখতে পাই মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ (সঃ) বিবি খাদিজাকে বিবাহ করার পর প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হন। কারণ ঐ সময় বিবি খাদিজা আরবের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। মুহাম্মদ (সঃ) তাকে বিবাহ করার পর সকল সম্পদ মুহাম্মদ (সঃ)-এর আয়ত্বে আসার ফলে তিনি আর্ত-মানবতার সেবায় তার সকল সম্পদ ব্যয় করেন। অথচ এই মুহাম্মদ (সঃ)-কে ও তাঁর পরিবারকে অনেক সময় উপোষ থাকতে হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্পাক যাবতীয় অভাবমুক্ত করেছেন অথচ তিনি দারিদ্র্য বরণ করে নিলেন, তার কারণ হল- তিনি যে রাষ্ট্র নায়ক হিসেবে তাঁর অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে; সমাজের কোন লোক অনাহারে, অর্ধাহারে থাকলে দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। বর্তমান সময়ে দারিদ্র্য মোকাবেলায় অনেক কৌশল তৈরী করা হয়; কিন্তু তার আসল মডেল বহু আগেই মুহাম্মদ (সঃ) দেখিয়েছেন, যা অনুসরণ করলে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। দারিদ্র্য দূরীকরণে তাঁর দান সম্পর্কে এই চরণটি উল্লেখ্য-

> "তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি দান করতে
> গিয়ে নিজে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার
> ভয় করেন না, চাই যত লোকই তাঁর কাছে
> আসুক এবং আসতে থাকুক।"[৩০]

ব্যক্তিগত সম্পদ হোক আর রাষ্ট্রীয় সম্পদ হোক দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে বিভিন্নমুখী সাহায্যের মাধ্যমে মুহাম্মদ (সঃ) হয়ে ওঠেন সেবাদানের এক মূর্তপ্রতীক।

---

২৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিক* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই-১৯৮৯), পৃ.৬২

২৯. ড. মোহম্মদ জাকির হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

৩০. নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ)*, আকরাম ফারুক অনুদিত, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর-১৯৯৫, পৃ. ৪৮৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সঞ্চয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা

মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী অর্থনীতি চালু করেন। ইসলামী অর্থনীতি এক সাম্যবাদী অর্থনীতি যেখানে মানুষের অর্থসম্পদ সমবণ্টনের রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদকে কুক্ষিগত না করে বরং অসহায়, নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের পরিবার পরিজনের ও সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য সম্পদকে কাজে না লাগিয়ে তা পুঞ্জিভূত করে রাখাকে ইসলাম গর্হিত কাজ মনে করে।

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার জন্য রুজিরও ব্যবস্থা করেছেন। এর মধ্যে কেউ ধনী আবার কেউ গরিব। এজন্য ধনীর সম্পদে গরিবের হক রয়েছে। ধনী তার সম্পদ জমিয়ে না রেখে বরং সাধ্যানুযায়ী গরিবকে সাহায্য সহানুভূতি করবে। আল্লাহ্ বলেন- "তোমাদের যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা ধনসম্পদ দান করেছেন, সেই ধনসম্পদ থেকে তাদেরকে দাও (যাদের ধনসম্পদ দেয়া হয়নি)।"[৩১]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় *ইসলাম ও মানবাধিকার* গ্রন্থে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেছেন- "অর্থাৎ তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার সবটাই তোমরা একলা ভোগ দখল করবে- তা করতে পারবেনা। কেননা যাদেরকে তা দেয়া হয়নি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আসলে ওদের জন্যেও দেয়া হয়েছে। তবে সরাসরি নয় (যেমন- তোমাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে দেয়া হয়েছে), ওদেরকে দেয়া হয়েছে তোমাদের মাধ্যমে, তোমরাই ওদের পর্যন্ত তা পৌঁছে দেবে এই জন্যে।"[৩২]

অন্যদিকে এই বিষয়ে *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা* গ্রন্থে উল্লেখ আছে- "ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকই খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। কোন নাগরিকই এসব মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেনা। যে লোক নিজের সামর্থে স্বীয় প্রয়োজন পূরণে সমর্থ হবেনা, সমাজ ও রাষ্ট্র তার সে প্রয়োজন পূরণের জন্য দায়ী।"[৩৩]

আমাদের বর্তমান প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দেখা যায়, কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে আবার কেউ অনাহার, অর্ধাহারে রাস্তায় শুয়ে আছে। সম্পদের সঠিক বণ্টননীতি না থাকার কারণে আজ এমন অবস্থা। আমরা দেখতে পাই মুহাম্মদ (সঃ) মানুষের প্রয়োজনে সকল সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই সর্বশান্ত হয়ে গিয়েছেন। সম্পদ সঞ্চয় না করে বরং বণ্টনের উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা নঈম সিদ্দিকী প্রণীত *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)* গ্রন্থে দেখতে পাই- "রাসূল (সঃ) আরবের সাধারণ মানুষের সমস্যার দিকে লক্ষ্য করে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বদান্যতা ও দানশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও পরম উদারতা ও মহানুভবতার নীতি অবলম্বন করেছেন। ব্যক্তিগত মালিকানায় কখনো কোন সম্পদ সঞ্চিত হয়ে থাকতে দেননি। বরং যত শীঘ্র সম্ভব, তা স্থানীয় ও বহিরাগত অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। বাইতুল মালে কখনো কোন অর্থ পড়ে থাকতে দেননি, যখনই কোন অভাবী ব্যক্তি সামনে এসেছে তাকে যা কিছু দিতে পেরেছেন দিয়েছেন।"[৩৪]

মহান আল্লাহ্পাকের বিভিন্ন বাণী, মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের গবেষণা ও দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, ইসলামে সম্পদ সঞ্চয় করা সমাজ বিরোধী কাজ। কারণ এর প্রভাব সকল স্তরের মানুষের উপর কম-বেশি পড়ে, যার ফলে অভাবী মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য দুঃস্থ মানবের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করতে নিষেধ করেছেন।

---

৩১. সূরা নূর, আয়াত : ৩৩

৩২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, পৃ. ৪৯

৩৩. ড. আব্দুল করিম জায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনুদিত (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ এপ্রিল-২০০২), পৃ. ৭৯

৩৪. নঈম সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

মুহাম্মদ (সঃ) একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি সমাজের আর্ত-মানবতার প্রতি ছিলেন উদার ও সহানুভূতিশীল। মানুষের কল্যাণ ও আর্থিক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি উপার্জন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন। কিভাবে মানুষ তার ভাগ্য পরিবর্তন করে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে পারে অনেকক্ষেত্রে সেই ব্যবস্থাও করেছেন। আমরা হাদীস থেকে জানতে পারি যে, তিনি নিজে কূপ থেকে পানি তুলে অর্থ উপার্জন করেছেন। যাকে বর্তমান সময়ে আমরা শ্রমিকের কাজ বলে থাকি। মানুষকে আল্লাহ্ কাজ কর্ম করার জন্য সুস্থ সবল করে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে কেন তারা বসে খেতে চায়? এজন্য তিনি নিজে শ্রমিকের কাজ করে শিখিয়ে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ড. মুহাম্মদ জাকির হুসাইনের কথা উপস্থাপন করতে পারি- "কোন মুসলমান ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়ার বা আল্লাহ্র উপর নির্ভরতার নাম করে রিযিক উপার্জন থেকে বিরত বা বেপরোয়া হয়ে থাকবে তা কিছুতেই হতে পারেনা। কেননা আকাশ থেকে স্বর্ণ রৌপ্যের বর্ষণ হবার নয়। অনুরূপভাবে লোকদের দান-সাদকার উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা এবং জীবিকা উপার্জনের উপায়-উপকরণ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যবহার করে উপার্জনে আত্মনিয়োগ না করা এ পন্থায় নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনাবলী পূরণ করতে চেষ্টা না করা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না।"[৩৫]

দরিদ্র মানুষ সর্বদাই মুখাপেক্ষী, বেঁচে থাকার জন্যই কেবল তারা বড়লোকের সাহায্যপ্রার্থী। আর এই শ্রেণীর অভাবী মানুষকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন, কাউকে আবার রোজগারের ব্যবস্থা পর্যন্তও করে দিয়েছেন। আমরা জানি যে, একবার এক ভিক্ষুক শরীরে শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তার কাছে এসে ভিক্ষা চাইলে নবীজি তার বিক্রি করার মত কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, শুধুমাত্র গায়ে দেয়ার জন্য একখানা কম্বল আছে। নবীজি তাকে ভিক্ষা না দিয়ে কম্বলখানা তার কাছে আনার জন্য বলেন, উক্ত ভিক্ষুক কম্বলসহ নবীর কাছে আসলে তিনি সাহাবাদের মধ্যে উক্ত কম্বল বিক্রি করলেন। কম্বলের কিছু টাকা দিয়ে খাদ্য কেনার জন্য বললেন আর বাকী টাকা দিয়ে একটি কুড়াল কিনে তা দিয়ে বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বললেন। লোকটি নবীর কথামত কাজ করে তার অবস্থার উন্নতি করে সংসারে স্বচ্ছলতা আনতে সক্ষম হয়। এভাবে অসংখ্য ঘটনা আছে, যেসব ঘটনা অসহায় মানুষের সাহায্য সহানুভূতির ইঙ্গিত বহন করে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ

যে দেশে অভাবী মানুষের সংখ্যা বেশি আন্তর্জাতিকভাবে তারা অনেক পিছনে, তার অবস্থান অনেক নিচে, আবার উন্নত দেশের অবস্থান অনেক উপরে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডাসহ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশে পাড়ি জমানোর জন্য দরিদ্র দেশের জনগণ নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে, অথচ এসকল দেশেও সম্পদ কম নেই। শুধু সঠিক ব্যবহারের অভাবে তাদের এমন অবস্থা। সমাজ থেকে অভাব দূর করতে মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনে কিছু বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার সেই মৌলিক কর্মসূচীগুলো ছিল–

১. বাজার তদারক ও অভাবীদের খোঁজ-খবর নেয়া;

২. উপার্জন ও উৎপাদনে উৎসাহ;

৩. উপার্জনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোবৃত্তি;

৪. বিশেষ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ;

৫. জনগণের নিয়মিত সংবাদ রাখা;

৬. সম্পদশালীদের নিকট অধিক দানের জন্য উপদেশ;

---

৩৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

৭. বৃদ্ধ, রুগ্ন, অকর্মন্যসহ যারা উপার্জনে অক্ষম তাঁদের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ভাতা ব্যবস্থা;

৮. যাকাত ব্যয়ের খাতের মধ্যে দরিদ্র ও মিসকীনের অগ্রাধিকার;

৯. পরিত্যক্ত সম্পত্তি দরিদ্রের মাঝে বন্টন করে দেয়া;

১০. শিক্ষার প্রসার"।[৩৬]

আয় বৃদ্ধি ও সচ্ছলতা কার্যক্রম

মানুষ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। এক্ষেত্রে সে যে মূল পেশায় কাজ করে তার পাশাপাশি অন্য কাজ করে অতিরিক্ত আয়ের পথ খুঁজে নিতে পারে। আর এরকম কাজের প্রতি ইসলামের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে অভাবী ও দরিদ্র মানুষজন বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে দান-সহযোগিতা ও স্বল্পঋণে এসকল কাজকর্ম করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসকল মানুষ বিভিন্ন স্থানে শাক-সব্জি, ফলজ, বনজ, দেশী-বিদেশী গাছ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ, হাস-মুরগী, গরু-ছাগল পালন, হ্যান্ডিক্রাফটসহ ইত্যাদি কাজ করে। এসকল কাজ স্বল্প পরিসরে করে অর্থ আয় করা সম্ভব। একটি কাজের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সময় ও সুযোগ থাকলে অন্য কর্মের মাধ্যমেও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব। এসকল কাজ কর্মের প্রতি মুহাম্মদ (সঃ) জনগণকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। "তারা ফসলী জমি, বাগান, ঘরবাড়ি ও ফসলাদি জনকল্যাণমূলক খাতে ওয়াক্ফ করে দিত এবং তাতে মুসলিম সমাজ বিপুলভাবে উপকৃত হতো।"[৩৭]

আবার উক্ত কাজের মাধ্যমে দক্ষতা, অতিরিক্ত যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হয়। মানুষের আয় বৃদ্ধির সাথে দক্ষতা ও অতিরিক্ত যোগ্যতা নিবিড়ভাবে জড়িত। কাজেই সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণে মুহাম্মদ (সঃ)-এর আয় বৃদ্ধিমূলক ও স্বচ্ছলতা কর্মসূচীকে জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বাস্তব উদাহরণ মনে করে আমাদের সমাজেও তার প্রতিফলন ঘটানো যেতে পারে।

দুর্ঘটনা ও দুর্যোগকালীন সহযোগিতা দান

মানুষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দুর্যোগ, দুর্ঘটনার স্বীকার হয়। আরো রয়েছে মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছরই কোন না কোন এলাকা এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার হয়, তখন সেই এলাকার অধিবাসীদের চরম মূল্য দিতে হয়। মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার হয় তা হলো–

১. ঘূর্ণিঝড়;

২. জলোচ্ছ্বাস;

৩. বন্যা;

৪. টর্নেডো;

৫. খরা;

৬. ভূমিকম্প;

৭. নদীভাঙ্গন।[৩৮]

এসকল আকস্মিক দুর্যোগের ফলে যেমন অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে তেমনি ক্ষতি হয় সম্পদ ও অর্থের। এসকল দুর্যোগের মোকাবেলা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সরকারকে অনেক সময় বিদেশী

---

৩৬. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৩৭. ড. মোস্তফা আস-সিবায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক অনূদিত (ঢাকা : হাসনা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০০০), পৃ. ১১৪

৩৮. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশ বিষয়াবলী* (ঢাকা : ডলফিন বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০০৩), পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। নবীজি (সঃ) এরকম অবস্থায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে তিনি সাহায্য-সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অনেক সময় সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়েছেন ও মানুষকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিয়েছেন। যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছে তাদের পরিবারের জন্য অর্থ বরাদ্দ করেছেন। এমন অসংখ্য ঘটনা আছে। তাঁর এই উদ্বুদ্ধকরণ বাণীর প্রতি উৎসাহী হয়ে খুলাফা-ই-রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী এমন পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে বলেন- "কর আদায়ের ক্ষেত্রে তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে, করের চেয়ে করদাতার কল্যাণের গুরুত্ব বেশি।...যে শাসক জমির উর্বরতা ও জনগণের সমৃদ্ধির উপর নজর না দিয়ে কেবল কর আদায়ের জন্য ব্যস্ত থাকে সে অবশ্যম্ভাবীরূপে ভূমি, রাষ্ট্র ও জনগণের ধ্বংস ডেকে আনে।...যদি জনগণ বেশি কর আরোপের আগে কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি, সেচ ব্যবস্থার বিপর্যয়, পোকার আক্রমণ, বন্যা ইত্যাদির শিকার হয়ে পড়ে তাহলে তুমি তাদের কষ্ট সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করবে।"[৩৯] প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এ অবস্থায় মানুষ চরম দারিদ্র্যের মুখে পড়ে, এজন্য মুহাম্মদ (সঃ) এ সময় মানুষকে সাহায্য-সহানুভূতি করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন এবং অন্যদেরকেও উৎসাহ দিতেন।

ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন ও তৃষ্ণার্তের সেবাদান কর্মসূচী

এসকল মানুষকে আমরা দুঃস্থ মানবের পর্যায়ে বিবেচনা করতে পারি। এসকল মানুষকে সেবা করা ও তাদের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করা ইসলামের এক মৌলিক শিক্ষা। যা মুহাম্মদ (সঃ) মানুষকে শিখিয়েছেন। পৃথিবী মানুষের বসবাসের যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে চাষ করার জন্য আল্লাহ্ মানুষ পাঠিয়েছেন। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কিছু মৌলিক ও আবশ্যকীয় প্রয়োজন আছে আর তা হলো খাদ্য, বস্ত্র ও পানি। খাদ্য না খেলে মানুষ বাঁচে না। আবার পানির প্রয়োজনও একই। এরপর মানুষের প্রয়োজন কাপড়ের। কারণ মানুষ তো অসভ্যের মত বাস করতে পারে না। আল্লাহ্‌পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন- "আমি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছি।" সমাজের কোন শ্রেণীর মানুষ যদি তাদের এই মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম না হয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে সক্ষম মানুষের কাজ হলো অভুক্ত, তৃষ্ণার্ত, বস্ত্রহীন ও অসহায়দের সাহায্য-সহানুভূতির মাধ্যমে সেবাদান করা। এক্ষেত্রে অবহেলা করার কোন সুযোগ নেই। পবিত্র কুরআনের সূরা মুদ্দাস্‌সিরে গরিব, অভাবী, নিরন্ন মানুষকে খাদ্যদানসহ সেবা করার জন্য তাকীদ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ বলেছেন-"সেখানে তারা (বেহেশতি লোকেরা) অপরাধীদের জিজ্ঞেস করবে কোন বিষয়টি তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে গেছে, তারা বলবে-আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না এবং অভাবীদের খাদ্য দিতাম না। আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম এবং আমরা শেষ দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম।"[৪০]

ইসলাম প্রত্যেক সক্ষম ও সামর্থ্যপূর্ণ মানুষদের জনকল্যাণ, জনসেবা ও সৎকাজের প্রতি এগিয়ে আসার জন্য বিভিন্নভাবে আহ্বান জানায়। এক্ষেত্রে ধনী দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। ধনী যেমন ধন-সম্পদ, প্রভাব প্রতিপত্তির মাধ্যমে মানুষের খেদমত করতে পারে তেমনি অভাবী ও দরিদ্র ব্যক্তি তার শারীরিক শক্তি সামর্থ অনুযায়ী জনসেবায় অংশ নিতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই- "রসূল (সঃ)-এর আমলে কতক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁর কাছে ফরিয়াদ করলো যে, ধনী লোকেরা পূণ্যকর্মে তাদের চাইতে এগিয়ে গেছে। কেননা তারা জনকল্যাণের খাতে তাদের বিপুল ধন-সম্পত্তি ব্যয় করবে। আমরা দরিদ্র, আমাদের হাতে কিছু নেই যে, দান সদ্‌কা করবো। রসূল (সঃ) তাদেরকে বুঝালেন যে, পূণ্য অর্জনের উপকরণ শুধু ধন-সম্পদ নয়। মানুষের উপকার হয় এমন প্রত্যেকটা কাজই জনকল্যাণমূলক কাজ ও সৎ কাজ।"[৪১]

---

৩৯. এ কে এম নাজির আহমদ, *ইসলামের সোনালী যুগ* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, তৃতীয় প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৯৫), পৃ. ২৯
৪০. সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ৪১-৪৬
৪১. ড. মোস্তফা আস-সিফায়ী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে দারিদ্র্য নিরসনকল্পে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী[৪২] আবার শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী[৪৩] ইত্যাদি নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে সরকার সেবাদান করে থাকে অথচ এই পথ বহু পূর্বেই মুহাম্মদ (সঃ) দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন–"ঐ লোক প্রকৃত বিশ্বাসী নয় যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশি না খেয়ে থাকে।"[৪৪] আমরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর জনসেবাকে আদর্শে পরিণত করতে পারলে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

পানির সু-বন্দোবস্ত

পানির অপর নাম জীবন। মানব অস্তিত্বের সাথে পানি জড়িত। পানির বহুমুখী ব্যবহারে পৃথিবীর অনাবাদী অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব আরও বেশি। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কোম্পানী বিশুদ্ধ পানি বোতল ও প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করে একদিকে যেমন অর্থের সরবরাহ করছে অন্যদিকে মানবসেবাও করছে। ইসলাম ধর্মে সুপেয় পানির যোগান ও ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন রকম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। নবীজি বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করিয়েছে, যেখানে পানি পাওয়া যায় সে যেন একজন গোলামকে মুক্ত করল। আর যে ব্যক্তি একজন মুসলমানকে পানি পান করিয়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সেখানে সে যেন তাকে জীবনদান করল।"[৪৫]

ইবনে মাজা'র এক হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, মহানবী (সঃ) পানি সরবরাহের জন্য খাল-খননের নির্দেশ দেন এবং তিনি বলেন যে, এ রকম কাজ হলো সাদকায়ে জারিয়া।[৪৬] এখানে পানির সু-বন্দোবস্তকে আমরা খাল-বিল, নদী-নালা, পুকুর-দিঘী-কূপ, টিউবওয়েল ইত্যাদি বুঝি। আর এসকল কাজই সাদ্কায়ে জারিয়ার অন্তর্ভূক্ত। এসকল কর্মের ফলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ উপকার লাভ করে। আর এই কর্মের প্রতিদান আল্লাহ্ তায়ালা প্রদান করবেন।

বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান

পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষকে সভ্য হতে শিখিয়েছে। পোশাক পরিচ্ছদের উপর ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে। পোশাক দ্বারা লজ্জা নিবারণ করতে হয়। আবার লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। তাই বুঝা গেল ঈমানের অঙ্গ হিসেবে লজ্জা নিবারণের জন্যও বস্ত্রের প্রয়োজন। কিন্তু কথা হলো সমাজে এমনও মানুষ আছে যারা খাদ্য পর্যন্ত যোগাড় করতে হিমশিম খায়। এসকল লোকের ক্ষেত্রে পোশাক তখন লজ্জার চেয়ে অধিকার পর্যায়ে বিবেচিত হয়। শীতের সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সামান্য কিছু আবরণ গায়ে দিয়ে রাস্তার পার্শ্বে জড়সড় হয়ে শীতে কষ্ট পাচ্ছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঘর-বাড়ি সব হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে শীতে কষ্ট করছে, যেমন–বর্তমানে পাকিস্তানের আযাদ-কাশ্মীরের ভূমিকম্প এলাকার মুসলমানগণ অবর্ণনীয় দুর্ভোগের স্বীকার।[৪৭] এই রকম অবস্থায় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাহায্য একান্ত কাম্য।

আবার সমাজের গরিব, দুঃখী, দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার জন্য নবীজি মানুষকে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজেও সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন। আমরা একটি ঘটনার মাধ্যমেও তা জানতে পারি, একবার ঈদে যাবার সময় তিনি রাস্তার পাশে একটি অনাথ বালককে কাঁদতে দেখে তাকে বাড়িতে নিয়ে নতুন জামা-কাপড় দিয়ে ঈদে নিয়ে গেলেন এবং তার মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন।[৪৮] এভাবে তিনি সারাজীবনই আর্ত-মানবতায় সাহায্য করেছেন।

---

৪২. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৪
৪৩. *প্রাগুক্ত*,
৪৪. ইবন কাসীর, *আসসীরাতুন নববিয়্যাহ* (কায়রো : ঈসাল বাবিল ইলবি, ১৯৬৪), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০
৪৫. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ* (দিল্লী : আল-মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৫হিঃ), ২য় খণ্ড
৪৬. *প্রাগুক্ত*,
৪৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৩/০২/২০০৬, পৃ. ৪
৪৮. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবাদান

ধনী ব্যক্তিরা সর্বদা উন্নত স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকে। কিন্তু অভাবী, গরিব, দুঃস্থ, দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে তারা নানা রকম সমস্যার মোকাবেলা করে। আর এদিকে লক্ষ্য রেখে নবীজি মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা দান কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিল—

১. বর্তমান সময়ের স্যানিটেশন ব্যবস্থা;

২. প্রস্রাব-পায়খানার পর পরিচ্ছন্নতা;

৩. নিয়মিত হাত-মুখ পরিষ্কার রাখা;

৪. চুল-দাড়ি পরিষ্কার রাখা;

৫. জামা-কাপড় পরিচ্ছন্ন রাখা;

৬. ঘর-দুয়ার ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখা;

৭. অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা থেকে বিরত থাকা।

এমন অনেক কর্মসূচীর মাধ্যমে নবীজি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সেবাদান করেছেন। যাকে মডেল মনে করে বর্তমান সময়ে সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সেবা সংস্থা মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে।

চিকিৎসাসেবা কর্মসূচী

সমাজের সুবিধা বঞ্চিত ভাগ্যাহত মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য মুহাম্মদ (সঃ) নিজেই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্তদের থাকা-খাওয়া, চিকিৎসা দেয়া, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ প্রসব ব্যবস্থা করা একান্ত জরুরী। ইসলামের দৃষ্টিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সুস্থতা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির অধিকার সমাজের প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। এক্ষেত্রে মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন- "রোগীকে দেখতে যাও।"[৪৯] এ প্রসংগে আমরা রাসূলের অন্য একটি হাদীসকে উপমা হিসেবে উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন- "এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের যে পাঁচটি অধিকার রয়েছে তার মধ্যে রোগীর খোঁজ-খবর নেয়াও একটি।"[৫০]

এমন অসংখ্য হাদীস আছে যেখানে নবীজি অসুস্থ্য মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের খোঁজ-খবর নেয়া, তার ঔষধের ব্যবস্থা করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এজন্য ইসলামে রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ রোগ শোকে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। যাদের কোন সহায় সম্বল নেই, এমনকি খোঁজ খবর নেয়ারও কেউ নেই। ঠিক এমন মানুষের জন্য সুচিকিৎসার জন্য মুহাম্মদ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি নিজেই এমন মানুষের খোঁজ খবর নিয়েছেন। আবার সুস্থ ও সামর্থপূর্ণ মানুষকে দরিদ্র, অসহায়, অবহেলিত, বঞ্চিতদের সাহায্য-সহানুভূতির জন্য এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ (সঃ) সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের জন্য সমাজের সকল মানুষকে একই আসনে অধিষ্ঠিত করেন। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট ছিল সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য। যেখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উঁচু, নিচু নির্বিশেষে সকলেই আইনের চোখে সমান। তিনি সকল শ্রেণীর মানুষকে সাধ্যমত উপকার করেছেন। তাঁর মদীনা হিযরত ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই হিযরতের ফলে মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারী মুহাজিরগণ হয়ে পড়েন সহায়

৪৯. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (দেওবন্দ : আল-মাকতাবা আর রহীমিয়া, ১৩৮৪ হিঃ), ১ম খণ্ড

৫০. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, *সহীহ লি মুসলিম* (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৪০৮ হিঃ), ১ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

সম্বলহীন। কারণ তারা সকলে ঘর-বাড়ি, অর্থ-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র মুহাম্মদ (সঃ)-এর নির্দেশেই মদীনায় এসেছেন। এজন্য মদীনায় তাদের পুনর্বাসন করা জরুরী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে মদীনার আনসারগণ তাদের ভাইদের জন্য নিজেদের সম্পদ দান করে তাদের পুনর্বাসন করেন। যা বিশ্বের ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা। তিনি সমাজের দুঃস্থ, অসহায় মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের সামনে যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যুগে যুগে অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। বর্তমানে যারা সমাজের ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করছে আমার মনে হয় তার সবকিছুই মুহাম্মদ (সঃ) বাস্তবায়ন করেছিলেন। আর এজন্যই তিনি সকল মানুষের নিকট যুগোপযোগী একজন অতুলনীয় মানব দরদী ও মহান সংস্কারক।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

খুলাফা-ই-রাশেদীন ও মুসলিম শাসন আমলে দুঃস্থ মানবকল্যাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা-ই-রাশেদীন ও মুসলিম শাসন আমলে দুঃস্থ মানবকল্যাণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

খুলাফা-ই-রাশেদীন

খিলাফত একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হল- প্রতিনিধিত্ব, স্থলাভিষিক্ত, কারো মৃত্যু বা অনুপস্থিতিতে তার স্থানে বসা, কায়েম মোকাম, ভারপ্রাপ্ত হওয়া, দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া, অন্যের দায়িত্ব পালন করা ইত্যাদি। 'খিলাফত' শব্দ থেকেই 'খলীফা' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ হল- প্রতিনিধি, স্থলাভিষিক্ত হওয়া , দায়িত্ব প্রাপ্ত। এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় পবিত্র কুরআনের এই আয়াতের মাধ্যমে–

"অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে চাই"[১] আলোচ্য আয়াতের মর্ম কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, মূলপদে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার নামই হল খিলাফত।

ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় যিনি মূল ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন তিনিই খলীফা। এই খলীফা বলতে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে মূলব্যক্তি হিসেবে মনে করি। আর এই কথার সাথে মিল রেখে যিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের খলীফা নির্বাচিত হন তাঁকে খলীফাতুর রাসূল বা রাসূলের খলীফা বলা হয়। আসলে ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর তাঁর দাফনের আগেই মুসলিম উম্মাহ তাদের নেতা হিসেবে যাকে মুহাম্মদ (সঃ)-এর স্থলে অভিষিক্ত করেছিলেন তিনিই খলীফাতুর রাসূল। যাকে আমরা প্রচলিত অর্থে খলীফা বলে বিশ্বাস করি।

ইসলামের ইতিহাসে ও অন্যান্য বই পুস্তকের মাধ্যমে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, "মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর বনী সাঈদা গোত্রের আঙ্গিনায় আনসার ও মুহাজিরগণ মিলিত হয়ে মহানবী (সঃ)-এর মনোনয়ন অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে খলীফা হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁর প্রতি আনুগত্য বা বাই'আত ঘোষণা করেন। তাঁর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় খিলাফতের সূচনা হয়। আল মাওয়ার্দী একে খিলাফতের রাজনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় খিলাফত নবুওয়্যাতের পর সর্বাধিক মর্যাদা ও দায়িত্বশীল পদ।"[২]

বিভিন্ন মনীষীর দৃষ্টিতে খিলাফত

আলোচ্য খিলাফত নিয়ে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, মনীষী ও ফিকহবিদগণ বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। খিলাফত শব্দের পরিচিতি আলোচনার জন্য এ সম্পর্কে কয়েকজন মনীষীর অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে–

১. **ইবনে খালদুনের অভিমত :** মুসলিম বিশ্বের এক মহান সমাজচিন্তাবিদ আল্লামা ইবনে খালদুন বলেন–"ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং ভিত্তি দৃঢ়করণ ও তদানুযায়ী রাষ্ট্র সংগঠন পরিচালনার নাম খিলাফত। খিলাফত হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা মহানবী (সঃ)-এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে। এজন্যই খলীফার দায়িত্ব হল ইসলামী জীবন ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা।"

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ৩০

২. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২. **আল্লামা তাফতাযানীর অভিমত :** আল্লামা তাফতাযানী বলেন- খিলাফত হল ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহানবী (সঃ)-এর প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক ধর্মতান্ত্রিক উম্মাহ বিশেষ।

৩. **আল মাওয়ার্দী-এর অভিমতে :** ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদ আল মাওয়ার্দী বলেন- "অন্যান্য দায়িত্বের মত নেতৃত্বের দায়িত্বও মুসলিম সমাজের উপর বর্তিত হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদান করার জন্য মুসলিম সমাজ একজন নেতা নির্বাচিত করলে পদাধিকার বলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নেতৃত্বের স্থলাভিষিক্ত বা খলীফা হয়ে যান। তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খলীফা এর অর্থ হলো নবুওয়্যতের প্রতিনিধিত্বই খিলাফত। এটি একটি নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠান।"

৪. **আল্লামা মাজিদ খাদ্দুরীর অভিমত :** বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাজীদ খাদ্দুরীর মতে-"খিলাফত হল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইহলৌকিক নেতৃত্বের একটি প্রতিষ্ঠান।"

৫. **আব্দুল ওয়াহাব নাজ্জার এর অভিমত :** মিশরীয় ইসলামী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আব্দুল ওয়াহাব নাজ্জারের মতে- "ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহমুখী কর্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে খিলাফত। খলীফা হচ্ছেন মহানবী (সঃ)-এর প্রতিনিধি এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রীয় প্রধান। অর্থাৎ খিলাফত ধর্ম ও রাজনীতি, তথা ইহকাল ও পরকালের সমন্বিত প্রতিষ্ঠান।"

৬. **আবুল আ'লা মওদুদীর অভিমত :** "খিলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আইনগত কর্তৃত্ব (Legal Supremacy) স্বীকার করে তাঁর পক্ষে সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ত্যাগ করবে। ইসলামী রাষ্ট্রে শাসকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ্র রুবুবিয়াতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং দ্বীনের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করা।"

কারা খুলাফা-ই-রাশেদীন

'খুলাফা' শব্দটি 'খলিফাতুন'-এর বহুবচন, আর 'রাশেদীন' শব্দটি 'রাশেদ'-এর বহুবচন। মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর যে চারজন প্রখ্যাত সাহাবী তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামী প্রজাতন্ত্র এবং ইসলামী উম্মাহর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এতে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেন তাঁদের খুলাফা-ই-রাশেদীন বলে। মহানবী (সঃ)-এর হাদীস অনুযায়ী- "খিলাফতের মেয়াদ ত্রিশ বছর।"[৩] তারপর আর বিশুদ্ধ খিলাফত থাকবেনা। আর মহানবী (সঃ)-এর উক্ত হাদীসের মর্ম অনুযায়ী ইসলামে প্রথম চারজন খলীফাকে খুলাফা-ই-রাশেদীন বলা হয়।

খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা

মুসলমানদের ধর্ম ইসলাম। আর ইসলাম হল মহান আল্লাহ্ তায়ালা ও রাসূল (সঃ) প্রদর্শিত একমাত্র কল্যাণকর ও স্থায়ী জীবন বিধান। যে বিধান দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আখিরাতের দিন মুক্তির একমাত্র পথ। তাই এই দ্বীনের খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মুসলিম সমাজের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ নশ্বর পৃথিবীর মানব সম্পদের উপর থেকে প্রভুত্ব উৎখাত ছাড়া মানব সমাজ থেকে অর্থনৈতিক শোষণ রাজনৈতিক নিপীড়ন ও আদর্শিক শূণ্যতার মত বিষয়গুলো দূর করা কখনও সম্ভব নয়। তবে এসকল কিছুই সম্ভব হয়েছিল খুলাফা-ই-রাশেদীনের সময়ে। খুলাফা-ই-রাশেদীনের সফলতার মূলে রয়েছে আল্লাহ্ ও রাসূল (সঃ)-এর বাস্তব অনুসরণ। উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই ধারণা করতে পারি যে, আজও ইসলামী সমাজের জন্য ইসলামী খিলাফতের বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা সেই সোনালী যুগে যেতে পারব। আর এজন্য ইসলামী খিলাফত একান্ত প্রয়োজন।

---

৩. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪

Dhaka University Institutional Repository

খুলাফা-ই-রাশেদীনের সংখ্যা ও অনুক্রম

মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর ত্রিশ বছরকে সোনালী যুগ বলা হয়। কারণ এই সময় যে চারজন খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রপরিচালনা করেন তাদেরকে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক বলা যেতে পারে। যাদের শাসনামল অবশ্যই সমাজে শান্তি আনতে সক্ষম হয়। আর তাদের ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য যুগ যুগ ধরে তাঁরা পরবর্তী উত্তরাধীকারীদের জন্য অনুকরণীয়, অথচ মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর প্রথম খলীফা নির্বাচন নিয়েই দেখা দেয় জটিলতা। খুলাফা-ই-রাশেদার সংখ্যা ও অনুক্রম সাজাতে উল্লেখ্য- মহানবী (সঃ)-এর ইনতিকালের পর কাকে খলীফা নির্বাচন করে মুসলিম মিল্লাতের দায়িত্ব দেয়া যায় এজন্য সাহাবায়ে কেরাম বনু সাঈদার আঙ্গিনায় বৈঠক করেন। তাঁরা নবীজির মনোনয়ন অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেন[৪] এবং সেই মোতাবেক হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করেন। খলীফা নিযুক্তির পর আবু বকর (রাঃ) দুই বছর তিন মাস খিলাফত পরিচালনার পর ইনতিকাল করেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) গণতান্ত্রিক পন্থায় মুসলিম বিশ্বের প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচন প্রক্রিয়া আলোচনায় ইসলামের ইতিহাসে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে- মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিজ ওফাতের পূর্বে কাউকেও খলীফা নিযুক্ত করে যান নি। তার কোন পুত্র সন্তানও ছিল না। ওফাতের পর মুসলিম জাহানের খলীফা কে হবেন এই প্রশ্ন নিয়ে মুসলমানগণ আনসার ও মুহাজির দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৫] উভয় দলই তাদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচনের দাবী করছিলেন। ছাকিফায়ে বনি ছায়েদার বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হল। এই খবর পেয়ে সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) নির্বাচন প্রশ্নটি হুজুর (সঃ)-এর দাফনের পূর্বেই মীমাংসিত হওয়া উচিত বলে মনে করলেন। তারা আবু ওবায়দাসহ ছকিফায়ে বনি সায়েদায় পৌঁছিলেন। মুহাজিরদের কথা হল- 'খেলাফত আমাদেরই প্রাপ্য, যেহেতু আমরা নবীর আহাল, আমরা পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে তাঁর সাথে হিযরত করেছি'। আনসারদের যুক্তি ছিল- 'খেলাফত আমাদেরও প্রাপ্য, যেহেতু আমরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি এবং সাহায্য করেছি'। বাক-বিতণ্ডা যখন চরমে পৌঁছল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হুজুর (সঃ)-এর একটি হাদীস বললেন : হুজুর (সঃ) তাকে বলেছেন- এ খেলাফতের দায়িত্বের অধিকারী কোরাইশ। আনসারগণ এটা মেনে নিল এবং তাঁদের দাবী প্রত্যাহার করল।

তখন আবু বকর (রাঃ) উপস্থিত জনতাকে ওমর (রাঃ) অথবা আবু ওবায়দা (রাঃ) কে খলীফা মনোনয়নের প্রস্তাব দেন। তারা উভয়ই আবু বকর (রাঃ)-এর অনুকূলে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। অতঃপর মুহাজিরদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম ওমর (রাঃ) এবং আনসারদের মধ্য হতে বশির ইবনে সা'দ আবুবকর (রাঃ)-এর হস্ত ধারণ করে বাই'আত (আনুগত্য শপথ) করলেন।[৬] তারপর উপস্থিত জনমণ্ডলী বাই'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর মুসলমানগণ হুজুর (সঃ)-এর দাফন কাফনের কাজে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় দিন মসজিদে নববীতে সাধারণ বাই'আত হয়। বাই'আতের পর প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন :

'হে মুসলমানগণ! আমাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। যদি আমি ভাল কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন। যদি অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে যাই, আমাকে সঠিক পথে এনে দিবেন। শাসকের নিকট সত্য প্রকাশ করাই উত্তম, আনুগত্য; সত্য গোপন রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। ... যে জাতি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে না, তারা লাঞ্ছিত, অভিশপ্ত। যে জাতির মধ্যে খারাপ কাজ ব্যাপক হয়, তাদের উপর আল্লাহ্ বালা মুছিবত ব্যাপক করে দেন।'[৭]

---

৪. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯
৫. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৭; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
৬. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৭; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০
৭. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে হযরত উসমান (রাঃ)-কে ডেকে তার হাতে একখানি মনোয়নপত্র লেখান যাতে খলীফা হিসেবে হযরত উমর (রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন। উক্ত পত্রখানা একটি খামে পুরে খলীফার সীলমোহর দিয়ে তা বিশিষ্ট সাহাবীদের সামনে হাজির করে উপস্থিত লোকজনকে বলা হয় এখানে যার নাম আছে তাকে যেন খলীফা হিসেবে মেনে নিয়ে তার হাতে শপথ করা হয়। তখন উপস্থিত সকলেই পত্রের প্রস্তাব একসাথেই মেনে নিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করেন। খলীফা হয়ে হযরত উমর (রাঃ) দীর্ঘ দশ বছর দুই মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালন করে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত উমর (রাঃ)-এর শাসনামল ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনিই অর্ধপৃথিবী শাসন করেন এবং মানব সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই মহান শাসকের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একথা উল্লেখ্য যে, "প্রথম খলীফা আবু বকরের (রাঃ) দিন যখন ফুরিয়ে এসেছিল, তখন তিনি তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ খলীফা নির্বাচন নিয়ে তাঁর সময়ে যেরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের একটি মীমাংসা করে যেতে চাইলেন। তিনি হযরত ওমরকে খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করতেন। কেননা কঠোরতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও জাগতিক কর্তব্যে সচেনতা সম্বন্ধে জনমত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সাহাবাদের মধ্যে তিনি পরামর্শ করে নিতে চাইলেন। সর্ব প্রথম তিনি আবদুর রহমান বিন আউফের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। আবদুর রহমান বললেন "হযরত ওমরের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, তবে তাঁর স্বভাব বড় কঠোর প্রকৃতির"। এর উত্তরে হযরত আবু বকর বললেন- "তার স্বভাবে কঠোরতা এজন্য যেহেতু আমি অত্যন্ত নরম, তবে কর্তব্যের চাপ পড়লে তিনিও আপনা হতেই নরম হয়ে যাবেন।" অতঃপর তিনি হযরত ওসমানের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত ওমরের পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরদের মতামত নিলেন। তাঁরা ওমরের মনোনয়নকে সমর্থন করলেও তালহা (রাঃ) এতে রাজী হলেন না। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তালহাকে হযরত ওমরের মনোয়নের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি (ওমর), তাঁর মতে, সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; কিন্তু হযরত ওমরকে খিলাফতের কথা বলা হলে প্রথমে তিনি এর দায়িত্ব নিতে রাজী হননি। তিনি বলেছিলেন "আমি খিলাফত চাই না" তার প্রত্যুত্তরে হযরত আবু বকর বলেছিলেন, "ওমর, তুমি খিলাফত না চাইতে পার; কিন্তু খিলাফত তোমাকে চায়"। অতঃপর তিনি ওসমানকে (রাঃ) ডেকে এনে হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে একটি পত্র লিখিয়ে নিলেন। মনোনয়ন পত্র সম্পাদনের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) অতিকষ্টে নিজের গৃহের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, "ভাইসব! আমি আমার কোন আত্মীয়-স্বজনকে খলীফা মনোনয়ন করিনি; বরং ওমর (রাঃ)-কে মনোনীত করেছি, যাতে আপনারা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন।" এই কথা শুনে উপস্থিত জনতা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, "আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মনোয়ন মেনে নিলাম।" এইভাবে হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হলেন।

খিলাফতে আরোহণ করে হযরত ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, আরবগণ! রশি বাঁধা উষ্ট্রের ন্যায় চালকের পশ্চাতে চলাই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু চালক কোথায় কিভাবে নিয়ে যায়, তাই লক্ষণীয়। তবে আমার সম্পর্কে বলতে পারি, কাবা ঘরের খোদার কসম, আমি তোমাদিগকে অবশ্যই ন্যায় পথে এনে ছাড়ব।" হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত ওমরকে (রাঃ) যে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে ঠিকই করেছিলেন, পরবর্তীকালে হযরত ওমরের কার্যকলাপই তার প্রমাণ। হযরত ওমরের খিলাফতে অধিষ্ঠান ইসলামের এক নতুন যুগের সূচনা করে।[৮]

হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদত ইসলামের ইতিহাসে এক হৃদয় বিদারক ঘটনার জন্ম দিলেও তাঁর শাসনামল মানব মনে ও সমাজে শান্তির নীড় রচনা করে। তার পরে অন্যান্য খলীফা নির্বাচনের জন্য

---

৮. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬, ১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে একটি নির্বাচক মণ্ডলী বা Electroal College গঠন করা হয়। উক্ত নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬জন আর তারা হলেন-

১. হযরত ওসমান (রাঃ);

২. হযরত আলী (রাঃ);

৩. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ);

৪. হযরত তালহা জোবায়ের (রাঃ);

৫. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ);

৬. আবু ওবায়দা বিন জাররাহ (রাঃ)। (তিনি আগেই মৃত্যুবরণ করেন)

এ নির্বাচকমণ্ডলী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার প্রদান করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত ওসমান (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হন এবং উপস্থিত সকলে তাঁর হাতে শপথ গ্রহণ করেন। খলীফা নির্বাচনের পর তিনি বার বছর পর্যন্ত খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদত বরণ করেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর নির্বাচন ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহন করে। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক পন্থায় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খলীফা নির্বাচন ইসলামের ইতিহাসের এক আলোচিত অধ্যায়। "খলীফা ওমরের মৃত্যুর পর মনোনীত পাঁচজনের মধ্যে তালহা (রাঃ) তখন মদীনায় ছিলেন না। নির্বাচন সমস্যা চরম পর্যায়ে পৌছল। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ আপসে সমস্যা সমাধানের জন্য দিন-রাত কাজ করতে লাগলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রত্যেকের মতামত গ্রহণ করলেন। সা'দ ওসমানকে সমর্থন করলেন। যুবাইর ওসমান ও আলী উভয়ের নামই উল্লেখ করলেন। ওসমান আলীকে এবং আলী ওসমানকে সমর্থন করলেন। আবদুর রহমান ভোটদানে বিরত রইলেন। ফলে ওসমানের পক্ষে একটি ভোট বেশি পড়ল এবং তিনি খলীফা নির্বাচিত হলেন (২৪ হিজরী)। প্রত্যেকেই তার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। তাল্‌হা ফিরে আসলে ওসমান (রাঃ) তাঁকে খলীফা পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার প্রতি অনুগত্য স্বীকার করলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা এবং বয়োজ্যেষ্ঠতার দাবিতে ওসমান (রাঃ) খলীফা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।"[৯]

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর মুসলিম জাহানের জন্য খলীফা নির্বাচিত হন হযরত আলী (রাঃ)। সকল আনসার ও মুহাজিরদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে হযরত আলীকে খলীফা মনোনীত করা হয়। তার শাসনামল ছিল ছয় বছর। তবে এই ছয় বছর যুদ্ধ ও বিবাদপূর্ণ খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের হাতে তিনি শহীদ হন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর নির্বাচন সম্পর্কে উল্লেখ্য যে- "হযরত ওসমানের শাহাদতের পর তিন দিন খিলাফতের মসনদ খালি থাকে। প্রথমতঃ হযরত আলী (রাঃ) খলীফা হতে অস্বীকৃতি জানান, পরে মুহাজির ও আনসারদের অধিকাংশের অনুরোধে তিনি এ দায়িত্ব নিতে রাজী হন। ২১শে যিলহজ্ব ৩৫শ হিজরী সোমবার তাঁর হাতে মুসলিম জনসাধারণের বাই'আত হয়। মদীনায় অবস্থানরত অধিকাংশ আনসার ও মোহাজের এই আনুগত্য শপথ গ্রহণ করেন। সেই সময় উমাইয়া বংশের অধিকাংশ শাসক বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন পদে কর্মরত থাকায় মদীনার বাইরে ছিল। যারা সেখানে ছিল তারা আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানিয়ে সিরিয়ায় মুয়াবিয়ার কাছে চলে গেল। সেখানে উমাইয়াদের প্রভাব প্রতিপত্তি অধিক ছিল।"[১০]

---

৯. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৫; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৩, ১২৪

১০. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৭; হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলীর খলীফা নির্বাচন সম্পর্কে বলতে যেয়ে ঐতিহাসিকগণ আলী বলেন- "অবশেষে বন্ধু বান্ধবদের অনুরোধে এবং বিদ্রোহীদের চাপে পড়ে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজী হলেন। আল্লাহ্‌র কেতাব অনুসারে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করার শপথ নিলেন। বিদ্রোহীরা ও বহু নাগরিক তাঁকে খলীফা বলে অভিবাদন করল এবং তারা আনুগত্যের শপথ নিল। ৬৫৬ খ্রিঃ আলী (রাঃ) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হলেন।[১১]

খুলাফা-ই-রাশেদীন আমলে মানবকল্যাণ

মহান আল্লাহ্ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষ পাঠিয়েছেন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি। আর এজন্য মানুষের সকল কার্যক্রম আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী হওয়া উচিত। এলক্ষ্যে খুলাফা-ই-রাশেদীনের শাসনকালকে আমরা ইসলামের সোনালী যুগ বলতে পারি। কারণ এই চার মহান শাসক নবী (সঃ)-এর আদর্শের ভিত্তির অনুরূপ রাষ্ট্র পরিচালনা করে বিশ্বের জন্য এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। ধনী-গরিবের ভেদাভেদ দূর করে তারা সাম্যের রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন। যেখানে অর্ধপৃথিবীর মালিক হয়েও একজন খলীফা প্রজাদের জন্য নিজ মাথায় খাদ্য বহন করে অনাথের ঘরে পৌছে দিয়েছেন।

আজকের পৃথিবীতে আমরা দেখি এক মতালম্বী অন্য মতালম্বীর কার্যক্রমে অংশ নিতে আপত্তি রয়েছে। এমনকি কোন বিধর্মী মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদ নাপাক হওয়ার ফতোয়া দেয়া হয়। অথচ মুহাম্মদ (সঃ) ও খুলাফা-ই-রাশেদীনের শাসনামল ছিল সম্পূর্ণ আলাদা, মুহাম্মদ (সঃ) ইহুদীর সাথে সন্ধি করেছেন, মূর্তি পূজারির সাথে চুক্তি করেছেন, নাসারাদের সাথে মৈত্রী করেছেন। তাদের সাথে সৎব্যবহার করেছেন, তাদের খোঁজ-খবর নিয়েছেন, তাদের লাভ-ক্ষতির উপকারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর খুলাফা-ই-রাশেদার শাসকবর্গ নাগরিকদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজেদের মানবতা, মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। তারা সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষকেও মানব বলে সম্মান দিয়েছেন, এতিম, দুঃস্থ, অসহায়দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর বলেছিলেন, "ফোরাতের কূলে একটি মেষ শাবকও যদি অনাহারে থাকে তার জন্য আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।"

খুলাফা-ই-রাশেদার শাসকদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজে শান্তি শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, এলক্ষ্যে তাঁরা সর্বদা খোঁজ রাখতেন কে কোথায় অসহায় জীবন যাপন করছে, কে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। সাধ্যমত তাদের সহযোগিতা করা হত। কোন সাহায্য প্রার্থীকে খালি হাতে ফেরানো হতোনা। এতিম ও অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সাধারণ মানুষকেও উৎসাহিত করা হত। খুলাফা-ই-রাশেদা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে, মানুষ মানুষের জন্য। সমাজে সকলের অবস্থান রয়েছে। প্রয়োজনে একজনের বিপদে অন্যরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে। কেউ অর্থের পাহাড় গড়ে তুলবে আর অন্যজন না খেয়ে থাকবে সে সুযোগ ছিলনা। মহানবী (সঃ) বলেছেন–"সেই ব্যক্তি ইমানদার নয় যে নিজে পেট ভরে খায় আর তার প্রতিবেশী অভূক্ত অবস্থায় থাকে"।[১২] দান-খয়রাত, রুগ্ন-পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা দানের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন দায়িত্ববান চাই সে মুসলমান অমুসলমান, ধনী-গরিব যেই হোকনা কেন। খুলাফা-ই-রাশেদার সমস্ত শাসনামল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের প্রত্যেকেই রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে দরিদ্র মানুষের সাহায্যের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করেছেন। পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্রের পূর্ণাঙ্গ স্থাপন করেছেন। খুলাফা-ই-রাশেদা প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান অধিকার ভোগ করতেন এবং তাদেরকে যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হত তার মধ্যে অন্যতম ছিল :

১. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিকের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা;

২. সকলের জন্য বস্ত্রের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা;

---

১১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৮; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮

১২. ইবন কাসীর, *আসসীরাতুন নববীয়্যাহ*, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

৩. থাকার জন্য গৃহ-সামগ্রীর ব্যবস্থা;

৪. সকলের জন্য গণস্বাস্থ্য ব্যবস্থা;

৫. রাষ্ট্রীয়ভাবে বিয়ের ব্যবস্থা করা;

৬. দরিদ্র অসহায়দের জন্য গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ;

৭. যাকাত ফান্ড গঠন।

প্রকৃত পক্ষে খুলাফা-ই-রাশেদার শাসনামল ছিল অনুসরণযোগ্য এক সোনালী অধ্যায়। যেখানে মানব সেবার স্থান ছিল সর্বাগ্রে। এখন পর্যায়ক্রমে আমরা খুলাফা-ই-রাশেদীনের সময়ে মানবকল্যাণ কার্যক্রমের আলোচনা করব :

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবু বকর (রাঃ)

মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইনতিকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রথম খলীফা নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনামল ছিল মানবসেবার অনন্য নিদর্শন। তিনি খলীফা নির্বাচিত হয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন তাতে তাঁর সেবামূলক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন- "আমাকে আমীর বানানো হয়েছে, অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি ইচ্ছে করে পদ গ্রহণ করিনি। আমি কখনো এটা কামনা করিনি যে, আমাকে এই পদে নিয়োগ করা হোক। আমি না তা আল্লাহ্‌র কাছে চেয়েছি। না তার কোন লোভ আমার মনে ছিল। আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই দায়িত্ব নিয়েছি শুধু এজন্য যে মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরব ভূ-খণ্ডে ইসলাম পরিত্যাগের ফিতনা শুরু হয়ে যাবার আশংকা আমি দেখছিলাম। ... আমার আনুগত্য করুন, যদ্দিন আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। যদি আমি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করি তাহলে আমার আনুগত্য করবেন না। আমি একজন অনুসারী, নতুন পথ আবিষ্কারক নই।"[১৩]

মুসলিম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সময়ের তিনি ছিলেন প্রধান বিচারপতি। সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেননি। তাঁর সরকার ছিল জনকল্যাণমূলক ও জবাবদিহিমূলক।

[১৪]"আবু বকরের (রাঃ) শাসনামলে তিনি নিজেই ছিলেন প্রধান বিচারপতি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিযুক্ত গভর্নরগণ বিচার ফায়সালার দায়িত্বও পালন করতেন। তার শাসনকালে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপড়িয়ে ফেলার যে ভয়াবহ ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছিল তার মোকাবেলায় তাঁকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়। তদুপরি তাঁর শাসনকালই ছিল মাত্র দু'বছর তিন মাস। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে বিচারের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ তিনি পাননি। কিন্তু উন্নতমানের ব্যক্তিদের হাতে প্রশাসন ও বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকায় সুবিচার বিন্দুমাত্রও বিঘ্নিত হয়নি।"

"সাইয়্যিদ আলীযাদা হানাফী তাঁর *"শির'আতুল ইসলাম"* গ্রন্থে বলেন : ইমাম বা খলীফা রাষ্ট্রে কোন ফকিরকে ফকির রাখতে পারবেনা, কোন ঋণীকে ঋণগ্রস্ত রাখতে পারবে না, কোন দুর্বলকে অসহায় রাখতে পারবেনা, কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দিতে পারবে না এবং প্রতিটি বস্ত্রহীনের বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।"

ইসলামের ত্রাণকর্তা

হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন খলীফা নির্বাচিত হন তখন মুহাম্মদ (সঃ) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ভণ্ড নবীর উদ্ভব, স্বধর্মত্যাগ, যাকাত প্রদানে অস্বীকার, বেদুঈনদের মাথা চাড়া দিয়ে উঠা ইত্যাদি সমস্যাসমূহ শিশু ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে লাগল এবং মানুষজন নিজেদের খেয়াল খুশিমত চলাফেরা করতে লাগল। ঠিক এই অবস্থায় হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়ে এবং মুহাম্মদ (সঃ) প্রতিষ্ঠিত সেই জনকল্যাণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ও সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ সকল অরাজকতা কাঠোর হস্তে দমন করেন এবং সকল

---

১৩. ইবন কাসির, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* (বৈরুত : মুয়াসসাসা জাওয়াদ, ১৯৭৭), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮; এ কে এম নাজির আহমদ, *ইসলামের সোনালী যুগ*, পৃ. ৭

১৪ এ কে এম নাজির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মত শাসক না হলে হয়তবা তখনই ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তিনি তাঁর বিচক্ষণতা দিয়ে সকল প্রতিকূল অবস্থাকে মোকাবেলা করে জনকল্যাণে ইসলামকে আরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তার আড়াই বছরের রাজত্বকালে তিনি একজন জনদরদী ও ন্যায় বিচারক হিসেবে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। তিনি নির্ভীকচিত্তে ঘোষণা করেন, "ইসলাম এসেছে বিভ্রান্ত মানুষকে, সমাজকে, বিশ্বকে পথ দেখাতে কোন ভ্রান্তির সঙ্গে আপস করতে নয়"। উইলিয়াম মূর তাই ঠিকই বলেছেন- "আবু বকর না থাকলে বেদুঈন গোত্রের সহিত আপস করতে গিয়ে ইসলাম লোপ পেয়ে যেত অথবা অংকুরেই এর নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা আরও বেশি ছিল। আবু বকর (রাঃ) ইসলামকে এই অনিবার্য ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করেন। প্রতিকূল ঝড়-সংকুল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তারই প্রাপ্য। হযরত আবু বকর (রাঃ) এক সংকটময় মুহূর্তে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করেন।[১৫] ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় তাঁর গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে আমরা মানবসেবার অন্তর্গত হিসেবে মনে করতে পারি।

কুরআন শরীফ সংকলন

হযরত আবু বকর (রাঃ) মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সংকলন করেন। আল-কুরআন সংকলন তার জনসেবার অন্যতম নিদর্শন। কারণ পবিত্র কুরআন মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন বিধান। যে গ্রন্থ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ নিজেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে মানুষের জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন জীবনযাত্রা ও জীবন সমস্যায় এক বিশাল ভূমিকা রেখেছে। এখানে আলোচিত হয়েছে মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয়, আন্তর্জাতিক জীবনে বিভিন্ন সন্ধি ও সহ-অবস্থান, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয়দান, বিভিন্ন জাতীর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ, আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার, মজলুমদের সাহায্য করা, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাছাড়াও মানুষের রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, শিক্ষা সামগ্রীক জীবনে ও ন্যায়ের পথে পরিচালনার জন্য মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে রয়েছে এক বিশাল ভূমিকা। মানবকল্যাণের জন্যই হযরত আবু বকর (রাঃ) পবিত্র কুরআন সংকলন করেন। তাঁর এই জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য বলা হয়- "তাঁর সময়েই সর্বপ্রথম কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় এবং কালক্রমে ইহা একটি সুসংঘবদ্ধ গ্রন্থের রূপ লাভ করে। কুরআন শরীফের রক্ষণাবেক্ষণে আবু বকরের দান অপরিসীম ও অসামান্য।"[১৬]

শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি গঠন

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরব জাতি ছিল বর্বর, বিশৃঙ্খলাবদ্ধ ও নানারকম সমস্যায় জর্জরিত। সেখানে গোত্রের প্রাধান্য প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হত। তিনি মুসলিম জাতিকে একটি আদর্শ জাতিতে পরিণত করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, কোন জাতীয় কল্যাণ সাধনের জন্য প্রথমে প্রয়োজন সুশৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা ছাড়া সমাজ তথা রাষ্ট্রে শান্তি আসতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনেও ঘোষণা দিয়েছেন–"তোমরা আল্লাহ্র রশিকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধর আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"

বর্তমান পৃথিবীতে আমরা দেখতে পাই, যে জাতি যত শৃঙ্খল সে জাতি তত উন্নত। এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি আমাদের তৃতীয় বিশ্বের দেশের মানুষ বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জর্জরিত এবং তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এজন্য হযরত আবু বকর (রাঃ) হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠন করতে হলে বিশৃঙ্খল আরব জাতিকে

---

১৫. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯, ১৬০

১৬. আহমদ ইব্ন 'আলী হাজার আল-'আসকালানী, *ফতহুল বারী* (রওযা : আল্-মাতবা'আতুস সালাফিয়া ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৯৫৯), ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, *হযরত আবু বকর(রাঃ)*, এ.কে.এম. মুহিউদ্দিন অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮১), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করতে হবে। মানবকল্যাণের জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি গঠনে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অবদানের কথা বলতে গেলে বলতে হয়–"হযরত আবু বকর বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিশ্বজয়ের পূর্বে আরববাসীদের প্রথমে নিজেদের দেশই জয় করতে হবে। অর্থাৎ নিজেদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। তিনি এই কাজেই প্রথম পদক্ষেপ নেন এবং তার পদক্ষেপ সফল হয়েছিল। সমগ্র আরব আবার সংঘবদ্ধ হয়ে উঠল। আপন জাতিকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে আবু বকর (রাঃ) এবার শত্রুকূলের প্রতি দৃষ্টি দিলেন।"[১৭]

গণতন্ত্রের বীজ বপনকারী

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। তার স্বাধীনতায় অন্যায়ভাবে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এই বিষয় ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিই প্রচলিত ছিল। অথচ এই নীতি ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদাভেদ নেই। যেমন- নামাজে রাজা-বাদশা, ধনী-গরিব সকলে একই কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহান আল্লাহ্‌কে সিজদা করে। এই সাম্য ও গণতন্ত্র ইসলাম মানুষকে শিখিয়েছে, সমাজে উঁচু-নিচুতে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ভেঙ্গে শ্রেণীহীন সমাজ ইসলাম গঠন করেছে। যে সমাজে মানুষের মাঝে বৈষম্য দেখা দেয় সেখানে এক শ্রেণীর লোক সুবিধা ভোগ করে আর অন্য শ্রেণীর মানুষ থাকে বঞ্চিত। আমাদের বর্তমান পৃথিবীর সভ্য জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। বর্তমানে দেখা যায় দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণ বৈষম্য, জিম্বাবুয়েতে চলছে জবর দখল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মত উন্নত দেশগুলোতে চলছে এই বৈষম্য। অথচ হযরত আবু বকর (রাঃ) মানবকল্যাণের জন্য গড়ে তোলেন শ্রেণীহীন সমাজ। তিনি মানবকল্যাণের জন্য গণতন্ত্রের বীজ বপন করেন। আর তার সেই উন্নয়নের রোড ম্যাপ হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে পূর্ণতা লাভ করে। জনগণের অধিকারের প্রতি তিনি সর্বদা নজর রাখতেন, "তাঁর নম্রতা ও একনিষ্ঠ অনাড়ম্বর জীবন, মহান নীতি জ্ঞান, ইস্পাত-কঠিন সংকল্প, অবিচল অধ্যবসায় এবং সর্বোপরি অটল বিশ্বাস প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইসলামের ইতিহাসে মহানবী (সঃ)-এর পরেই তাঁর স্থান। ... হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করার বাস্তব নমুনা ও মাপকাঠি যদি ইহা হয়, যা আপনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তা হলে আপনার পরবর্তী লোকদের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা অর্জনের হিম্মৎ আর কারও হবে না।"[১৮]

করুণা ও দয়ার প্রতীক

হযরত আবু বকর (রাঃ) গরিব, দুঃখী, অত্যাচারিত, অবহেলিত, নিপীড়িত, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত নমনীয়। তাদের ভাগ্য উন্নয়নে তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। আর এ সকল পদক্ষেপের জন্য তিনি বর্তমান প্রশাসকদের জন্য এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। গরিব, দুঃখী ও মজলুমদের কাছে তিনি ছিলেন করুণা ও দয়ার প্রতীক। তাঁর দানশীলতা আরবের বহু অসহায় ও নির্যাতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, তাঁর অর্থে বহু ক্রীতদাস তাদের অসহায় ও দুঃস্থ মানবতা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে। যেমন হযরত বেলাল (রাঃ)-কে তিনি উমাইয়া বিন খাল্‌ফের নিকট থেকে ক্রয় করে তার বন্দিজীবনের অবসান ঘটান। অথচ এই বেলালের উপর তার মনিব যে নির্যাতন চালিয়েছে তাকে তৎকালীণ সময়ের নিকৃষ্ট বর্বরতা বলা চলে। এরকম বহু ঘটনার স্বাক্ষী হযরত আবু বকর (রাঃ)। মানবকল্যাণে তাঁর অবদান উল্লেখ করার মতই। তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি কওমের খেদমতেই দান করেছিলেন।

"তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সময় ৪০,০০০ দিরহামের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের জন্য তিনি এই অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করেন। দুঃখী ও দুর্গতদের সাহায্যের জন্য তিনি রাত্রিকালে পথে পথে বিচরণ করতেন। দানশীলতা ও সত্যবাদীতার জন্য 'আতিক' এবং 'সিদ্দিক' নামে ভূষিত ছিলেন।"[১৯]

---

১৭. আল্লামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন জারির বালাযুরী, *ফুতুহুল বুলদান* (কায়রো : মাতবা'আতুশ শরকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭), পৃ. ১০১, ১০২

১৮. সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)*, মোহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮৭), পৃ. ৪৪৩

১৯. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আভ্যন্তরীণ শৃংখলা ব্যবস্থা

হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং সাধারণ মানুষের উপকার করতে হলে বৃহৎ দেশকে প্রদেশে পরিণত করতে হবে। সেই অনুযায়ী তিনি আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ দান করেন। আমাদের বর্তমান সময়েও দেখা যায় যে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় জনকল্যাণের জন্য। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পরিকল্পনাও ছিল অনুরূপ। তিনি আরবদেশকে যে সকল প্রদেশে পরিণত করেন তার মধ্যে ছিল-

১. মক্কা;
২. মদীনা;
৩. তায়েফ;
৪. সান'আ;
৫. নাজরান;
৬. বাহরাইন;
৭. হাযরামাউত;
৮. দুমাতুল জন্দল।[২০]

তিনি বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাদের মাধ্যমে জনসেবা করতেন। কেন্দ্র থেকে উন্নয়নের শাসন জারি করা হত আর তা বিভিন্ন প্রদেশে পৌঁছে যেত। বিভিন্ন প্রদেশের রাস্তাঘাট, মসজিদ-মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্র ইত্যাদি জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে মরুর বুকে এক শান্তির নীড় রচনা করেন। তিনি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের গভর্ণরের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এখানে আমর-বিন আস ও অলীদ-বিন আকাবা (রাঃ)-কে যাকাত আদায়কালীণ সময়ে যে উপদেশ দেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখ্য "প্রকাশ্যে ও একাকীতে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য এমন একটি পথ ও রিযিক লাভের এমন উপায় সৃষ্টি করে দেন, যা কারও ধারণায় আসতে পারেন না। ...জনগনের কল্যাণ কামনা ও খেদমত নিঃসন্দেহে উত্তম তাক্ওয়ার কাজ।[২১]

অক্ষম ব্যক্তিদের কর মওকুফ

ইসলাম এক শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম, যেখানে সকল মানুষের ভাল মন্দের দিক বিবেচনা করা হয়। আর তা কেন হবেনা, কারণ যে রাষ্ট্রের কর্ণধার হযরত আবু বকরের মত জন দরদী মানুষ। যিনি কেবল প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দের কথাই ভাবতেন। প্রত্যেক সমাজে প্রত্যেক যুগে ধনী-দরিদ্রের বাস থাকে কিন্তু ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের গরিব মানুষের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ঠিক এই অবস্থায় আবু বকর (রাঃ) যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন তিনি গরিব, দুঃখী, অসহায়, দুঃস্থ, অবহেলিত, অক্ষম ইত্যাদি মানুষের সুযোগ-সুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি ঐ শ্রেণীর মানুষের উপর থেকে কর আরোপ করা থেকে বিরত থাকলেন। রাষ্ট্রে বাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হয় এবং সাধ্যানুযায়ী রাষ্ট্রের উপকার করতে হয় অর্থ দিয়ে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) সমাজের দুঃস্থদের উপর থেকে এই শর্ত উঠিয়ে দিয়ে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর সময়ে বিভিন্ন কর শুধু ধনীদের উপরই ধার্য করা হত। তার জনকল্যাণের দৃষ্টান্তে বলা যায় "বিজিত এলাকার জনগণের সহিত হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ)-এর ব্যবহার খুবই ভাল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)

---

২০. সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩, ৩১৪; মুহাম্মদ হামীদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮
২১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫), পৃ. ১০২

Dhaka University Institutional Repository

যেভাবে তাদের সহিত ব্যবহার করেছেন, হযরত সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) ও ঠিক সেরূপ ব্যরহার করতেন। জিযিয়া কর শুধু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের উপর ধার্য করা হতো। তাও আবার অতি অল্প মাত্রায়। তিনি অক্ষম ব্যক্তিদের উপর কোন প্রকারের কর ধার্য করেন নি এমন কি, অক্ষম ব্যক্তিদের খরচ বাইতুল মাল হতে বহন করতেন এবং তাদের ধর্মীয় কাজে কোন সময় বাঁধা দান করেননি। বিজিত এলাকার মুসলমান গভর্নরের নিকট জিম্মীদের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন- 'তাদের খানকা, এবাদতখানা অর্থাৎ, গীর্জা ইত্যাদি ধ্বংস করা যাবেনা। তাদের কিল্লাসমূহও নষ্ট করা যাবেনা। তাদের ধর্ম অনুযায়ী তারা সময়মত শংখ ইত্যাদি বাজাতে পারবে। ধর্মীয় দিনে তারা সলীব (ক্রুশ) নিয়ে বের হতে পারবে, তখন তাদেরকে বাঁধা দেয়া যাবে না।"[২২]

ক্রীতদাস আযাদ

দুঃস্থ মানবকল্যাণে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত মনোযোগী। হিজরতের আগে মক্কাতে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রতাপশালী ও ধনবান লোক ছাড়া এমন কিছু সংখ্যক লোক ছিলেন যারা গরিব, মিসকীন ও অন্যের গোলাম। কাফেরদের নির্যাতন ও উৎপীড়ন এসকল অসহায় গরিব ক্রীতদাসের উপর অধিক হারে চলত। আর এসকল গরিব অসহায়, বেচারাগণ যালেম শত্রুদের হাতে নির্মম নির্যাতন ভোগ করতেন। তাদের এই নির্যাতন দেখে হযরত আবু বকরের মন কেঁদে উঠল তিনি তাদেরকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যে সকল ক্রীতদাসকে মুক্ত করে স্বাধীন জীবন যাপনে সহায়তা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন :

১. হযরত বেলাল;
২. হযরত আমের ইবনে কাছীর;
৩. হযরত নাযিরাহ;
৪. হযরত হেন্দিয়্যাহ;
৫. হযরত জাবিয়্যাহ;
৬. হযরত বিনতে জারিয়া (রাঃ);
৭. হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা;
৮. হযরত যনীন;
৯. হযরত উম্মে আবাস (রাঃ)[২৩]।

এ সকল গরিব অসহায়কে নিজের অর্থ দিয়ে খরিদ করে মুক্ত করে দিয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ) মানবকল্যাণের এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। তার এহেন দুঃস্থ মানবকল্যাণ আমাদের জন্য অবশ্যই অনুকরণীয়। "হযরত আবু বকর তাঁর ধনসম্পদের বেশীরভাগই ক্রীতদাস-দাসীদেরকে খরিদ করে আযাদ করার কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর পিতা আবু কোহাফা এটা পছন্দ করতেন না, সময় সময় তাঁকে বলতেন, "তুমি নিজের ধনসম্পদ এসমস্ত নিম্নশ্রেণীর দুর্বল ক্রীতদাসদিগকে খরিদ করবার কাজে ব্যয় করে ফেলছ কেন? এতে লাভ কি?" তিনি এর উত্তরে বলতেন "আব্বাজান! এই ব্যবসায়ের লাভ আপনি বুঝতে পারবেন না।"[২৪]

মসজিদ নির্মাণ

মুহাম্মদ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের সময় সেখানে উন্নত পরিবেশে আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য কোন মসজিদ ছিল না। এজন্য নবীজি প্রথমে মসজিদ নির্মাণ করার পরিকল্পনা করলেন। আর এলক্ষ্যে তিনি

---

২২. মাওলানা মোহাম্মদ গরীব উল্লাহ্ ইসলামাবাদী, *আশরা মুবাশ্‌শরা* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুলাই, ২০০৩), পৃ. ৫২, ৫৩
২৩. মাওলানা আব্দুল হালিম, *সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকর (রাঃ)* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই, ২০০১), পৃ. ১৮; সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৫
২৪. মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন। যখন মসজিদের জন্য স্থান নির্ধারণ হল তখন অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় আর তখনই হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর অর্থ দিয়ে জনস্বার্থে মসজিদের জন্য জায়গা খরিদ করে দিলেন। মসজিদের জন্য অর্থদান করাকে ইসলামী চিন্তাবিদগণ মানবকল্যাণের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন। কারণ তখন তিনি অর্থ দান না করলে হয়ত মসজিদ নির্মাণ সম্ভব ছিলনা তাছাড়া ঐ সময়ে মসজিদই জ্ঞান চর্চার একমাত্র স্থান ছিল। সেখান থেকে জনগণকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দেয়া হত যাকে মানবসেবার অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মসজিদ নির্মাণে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে বলা হয়- "এই সময় হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের একটি মসজিদ নির্মাণের সংকল্প করলেন। মসজিদের জন্য যে স্থানটি মনোনীত করা হল তা ছিল 'সহল' এবং 'সোহায়েল' নামক দুইজন এতিম বালকের। মূল্য প্রদানের কথা উঠলে তারা মূল্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করল; কিন্তু হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য করলেন। উক্ত জমির মূল্য নির্ধারিত হল দশ মেস্কাল স্বর্ণ। অবশেষে বালকদ্বয় দশ মেস্কাল স্বর্ণের বিনিময়ে উক্ত জমি মসজিদের জন্য বিক্রয় করতে সম্মত হল। হযরত আবু বকর (রাঃ) মক্কা শরীফ হতে যে অর্থ তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন, তা হতে দশ মেস্কাল স্বর্ণের বিনিময়ে উক্ত জমি খরিদ করে মসজিদের জন্য দান করলেন। অতঃপর উক্ত স্থানটি সমতল করা হলে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিলেন।"[২৫]

গরিব-মিসকীনের জন্য অর্থ বরাদ্দ

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ন্যায়পরায়ণতা ও প্রজাসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। তার মাত্র দুই বছরের শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজাদের মধ্যে শান্তির নীড় রচিত হয়। তিনি দাবীদারের দাবী পুরণ করেছেন। যাকাত ছাড়া অন্য কোন প্রকার কর বা ট্যাক্স প্রজাদের উপর ধার্য করা হয়নি। জনস্বার্থের জন্য প্রত্যেক গোত্রের নিকট থেকে আদায়কৃত যাকাত সেই গোত্রের গরিব, মিসকীন, ভবঘুরে, এতিম ইত্যাদি নিঃস্বদের মাঝে বিতরণ করা হত। জনকল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি রাষ্ট্রীয় কর, গণীমতের মাল বা বাইতুল মাল হতে নিজের পরিবারের জন্য অতিরিক্ত কিছুই ব্যয় করতেন না। শুধুমাত্র সাধারণ ভরণপোষণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন হয় কেবল ততটুকুই ব্যয় করতেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন রকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় এবং রাজকীয় হালতে জীবন চালানো যায় কিন্তু এক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি বাইতুল মালের একটি অংশ গরিব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করতেন। গণীমতের মাল, যাকাতের অর্থ ও বাইতুল মাল বিতরণে তিনি কোন রকম ভেদাভেদ রাখেননি। তাঁর এই বণ্টন নীতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে- "বণ্টনের মধ্যেও তিনি সমতা রক্ষা করতেন, ইসলাম গ্রহণের অগ্রবর্তী বা পরবর্তী স্বাধীন, পরাধীন দাস-দাসী, নারী-পুরুষ, সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ইত্যাদি কোন বিষয়ের তারতম্য করতেন না। কেউ তাঁকে এ সমস্ত বিষয়ে তারতম্য করতে বললে তিনি উত্তর করতেন, যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা আল্লাহর নিকট তাদের পুরস্কার পাবেন, ইহলোকে তাঁদের কোন অগ্রাধিকার নেই।"[২৬]

তাঁর জনকল্যাণের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম বলেন- "তিনি তাঁর খিলাফতের প্রথম বৎসরেই মুক্ত, ক্রীতদাস, স্ত্রী-পুরুষ এবং উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর লোকদেরকে মাথাপিছু দশ দিরহাম করে বৃত্তিস্বরূপ দান করেন। পরবর্তী বৎসর প্রত্যেককে মাথাপিছু বিশ দিরহাম দান করেছিলেন।"[২৭]

গরিব-দুঃখীর গোপন সেবা

একজন মানুষের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য অতীব প্রয়োজন হল- খাদ্য, বস্ত্র, পানি। এজন্য এই তিনটি জিনিসের চাহিদা পূরণ করা একজন শাসকের জন্য অবশ্য পালনীয়। আর কারো নিজ প্রচেষ্টায় যদি এই

---

২৫. সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০; মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০

২৬. মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩১

২৭. মাওলানা আব্দুর রহিম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন মেটানো সম্ভব না হয় তখন অন্য মানুষের কর্তব্য হয়ে পড়ে তা পূরণের। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন- "পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহ্র উপর ন্যাস্ত নয়।"[২৮]

গরিব মিসকীনদের বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে হযরত আবু বকর (রাঃ) অনেক সময় গোপনে তাদের সেবা করতেন। এপ্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল হালিম বলেন- "হযরত ওমর বলেন, মদীনায় জনৈক গরিব বৃদ্ধা ছিল, আমি প্রত্যহ সকালে তাকে দেখাশুনা করার জন্য যেতাম। কিন্তু যেয়েই দেখতাম, আমার পূর্বে কোন একজন লোক এসে বৃদ্ধার সমস্ত কাজ সমাধা করে গেছে। একদিন আমি লোকটিকে দেখার জন্য অন্ধকার থাকতে এসে বৃদ্ধার ঘরের আড়ালে বসে রইলাম। একটু পরেই দেখলাম, হযরত আবু বকর ধীরে ধীরে বৃদ্ধার গৃহের দিকে আসছেন। আমি মনে মনে বললাম, আবু বকর, তুমি ভিন্ন এ কাজ আর কে করবে?"[২৯]

বায়তুল মালের ভিত্তি পত্তন

বায়তুল মাল হল সরকারি কোষাগার। রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের মঙ্গলের জন্য যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা বাস্তবায়নের খরচ বায়তুল মাল থেকেই করা হয়। বস্তুত তা সাধারণ জনগণের সম্পদ। বলা হয়ে থাকে–বায়তুল মালের সম্পত্তি জনসাধারণের। বিভিন্ন উৎস থেকে এই বায়তুল মালের অর্থ সংগৃহীত হত। যেমন-

০১. উশর;
০২. খারাজ;
০৩. কেরাউল আরদ;
০৪. যাকাত;
০৫. জিযিয়া;
০৬. ফাই;
০৭. রিকাযে;
০৮. বিভিন্ন কর;
০৯. উসুর (আমদানী, রপ্তানী শুল্ক);
১০. ওয়াক্ফ;
১১. আমওয়ালে ফাযিলা।[৩০]

আবার বায়তুল মালের ব্যয় হত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনসেবা খাতেও বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করা হয়। যেমন-

০১. সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতা প্রদান;
০২. দারিদ্র্যবিমোচন;
০৩. দাসত্ব মোচন;
০৪. ঋণমুক্তি;
০৫. রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন;

---

২৮. সূরা হুদ, আয়াত : ৬
২৯. মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
৩০. বিস্তারিত দ্র. আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইবনে হিশাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০; সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৬-৩৪১; মুহাম্মদ ইব্ন সা'আদ, *আততাবাকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

০৬. রাস্তা-ঘাট, সাঁকো, পুল, নির্মাণ;

০৭. জনগনের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড;

০৮. নিরাপত্তার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যয়ভার বহন;

০৯. অভাব-অনাটনের সময় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

১০. দরিদ্র কৃষকদের জন্য কৃষিঋণ দানের ব্যবস্থা;

১১. ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বায়তুল মাল ব্যয়।

বায়তুল মালের এই অর্থ ব্যয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্পাক বলেন-

"নিশ্চয় সাদকাসমূহ (১) গরিব (২) মিসকীন (৩) সাদকাহ আদায়কারী কর্মচারী (৪) যাদের হৃদয় আকর্ষণ করা দরকার (৫) দাসমুক্তি (৬) ঋণমুক্তি (৭) আল্লাহ্র পথে (৮) মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত।[৩১]

হযরত আবু বকর (রাঃ) এই বায়তুল মালের গোড়াপত্তন করেন। যেমন- বলা হয়েছে "হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের খিলাফতকালের শেষের দিকে আর্থিক অসুবিধা এড়ানোর জন্য একটি বায়তুলমালের ভিত্তি পত্তন করেন। ইতিপূর্বে তিনি নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি অনুসরণ করে চলতেন। যখন যা কিছু আমদানী হত তখন তা উপযুক্ত প্রাপকদের মধ্যে বিতরণ করে নিঃশেষ করে ফেলতেন। আবার প্রয়োজন হলে মুসলমানদের নিকট হতে চেয়ে নিতেন।[৩২]

অসহায়, যিম্মী প্রজাদের অধিকার রক্ষা

সাধারণত যুদ্ধ অপরাধীদের অসহায় ও যিম্মী পর্যায়ে মনে করা হয়। আর ইসলাম এ সকল মানুষের প্রতি উত্তম আচরণ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ লক্ষ্যে হযরত আবু বকর (রাঃ) এই শ্রেণীর মানুষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কারণ মুহাম্মদ (সঃ) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন, তাদের আশ্রয় দিতেন ও ভাল ব্যবহার করতেন। এজন্য আবু বকর (রাঃ) ও মুহাম্মদ (সঃ)-এর নীতি অনুসরণ করতেন। হযরত আবু বকর (সঃ) তাঁর শাসনামলে 'হীরা'র অধিবাসীদের সাথে একটি চুক্তি করেন যেখানে উল্লেখ ছিল–"চুক্তিতে আবদ্ধ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রজাদের ধর্মমন্দির ও উপাসনালয় অর্থাৎ গীর্জা, দেবমন্দির ধ্বংস করা যাবে না। তারা নিজেদের শত্রু হতে আত্মরক্ষার জন্য যে সমস্ত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তাদের সে সমস্ত দুর্গ নষ্ট করা যাবে না। ধর্মীয় প্রথানুযায়ী তাদের জন্য গীর্জায় সিঙ্গা ফুঁকবার কিংবা কাঁসরঘন্টা বাজানোর অনুমতি থাকবে। ধর্মীয় পরবাদিতে তারা নিজেদের ধর্মীয় প্রতীক নিয়ে বের হতে পারবে। এ সমস্ত কাজে তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না, কিংবা এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার বাধ্যবাধকতা তাদের প্রতি আরোপ করা যাবে না।"[৩৩]

সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি যিম্মীদের উপর সামান্য কর আরোপ করেন। যা তারা দিতে পারবে। 'হীরা'র অঞ্চল অনেক বড় হলেও সেখানে মাত্র ছয় হাজার লোকের উপর বার্ষিক মাথাপিছু দশ দিরহাম জিযিয়া কর আরোপ করেন। অগণিত লোককে কর মওকুফ করেন যারা ছিল দরিদ্র, পীড়াগ্রস্ত, অক্ষম ও বয়োবৃদ্ধ। শুধু তাই না এই শ্রেণীর মানুষের উপর থেকে কর মওকুফ করে তাদের জীবন ধারনের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করেন। তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েশের সকল অধিকার প্রদান ও তাদেরকে সংরক্ষণের সকল ব্যবস্থা করেন।

খলীফার পদে বসেও তাকে কাপড়ের বোঝা কাঁধে নিয়ে বাজারে যেতে দেখা গেছে। সাধারণ মানুষের সাথে মিলে মিশে তাদের সাথে একযোগে কাজ করা ও আলাপ আলোচনা করতে তিনি ভালবাসতেন।

---

৩১. সূরা তওবা, আয়াত : ৬০

৩২. মুহাম্মদ ইব্ন সা'আদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১; মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭

৩৩. মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

আর তার এই অবিভেদমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য কোন আগন্তুক তাঁকে খলীফা বলে চিনে নিতে কষ্ট হত। তিনি গৃহকর্মেও সাহায্য করতেন। "খেলাফতের আসনে উপবেশন করার পর একটি দরিদ্র মেয়ে বলতে লাগল : এখন তো বড় মুশকিল হয়ে পড়ল। আমাদের বকরী দোহন করবে কে? তিনি এটা শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত মেয়ের বাড়িতে গিয়ে তাদের বকরী দোহন করে দিলেন এবং বললেন, বেটি! তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করোনা, আল্লাহ্ সাক্ষী আছেন, এই খেলাফত আমাকে তোমাদের খেদমত হতে বিরত রাখতে পারবে না।"[৩৪]

হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামের খলীফা। তিনি রাসূল (সঃ)-এর নীতি অনুসরণ করে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার সেই ধারা অনুযায়ী পরবর্তী খলীফাগণ রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ চিন্তা করে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন। এদিক থেকে আমরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জনগণের ঘনিষ্ট বন্ধু বলতে পারি। একবিংশ শতাব্দীর উন্নয়নের যে রোডম্যাপ ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও পৃথিবীব্যাপী চরম দারিদ্র্য লক্ষ্য করা যায়। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) দুঃস্থ মানবকল্যাণের জন্য যে সকল যুগোপযোগী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন তার জন্য তাকে অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়ে।

---

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর (রাঃ)

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেতাব-ফারুক, ডাকনাম-আবু হাফছ, পিতার নাম-খাত্তাব এবং মাতার নাম-হানতামা। তিনি ৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং নবুয়্যতের ষষ্ঠ বছরে ২৬ বছরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি ইসলামী ভাবধারায় জীবন পরিচালনা করেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ইনতেকালের পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। তাঁর খিলাফতের সময়কাল ছিল ২৩ শে জমাদিউল উখরা, ১৩ হিজরী, ২৪ শে আগস্ট, ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ২৩ শে যিলহজ্জ, ১৩ হিজরী, ৩রা নভেম্বর ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর এই সময় ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী যুগের সূচনা করে। তিনি সাফল্যের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অর্ধ পৃথিবী তিনি শাসন করেছেন। তার শাসনামলে ইসলাম এশিয়া থেকে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। হযরত ওমেরর খিলাফত ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শাসন, সংস্কার, জনকল্যাণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিজেতা, প্রথিতযশা প্রশাসক, বৈপ্লবিক সংস্কারক ও ন্যায় পরায়ন শাসক। তাঁর উন্নত শাসন ব্যবস্থা, গভীর প্রজাপ্রীতি যুগ যুগ ধরে শাসকদের জন্য উৎস হিসেবে কাজ করে। অবশেষে এই মহান শাসককে মদীনা শরীফে 'আবু লু'লু' নাম এক অগ্নি উপাসক কর্তৃক হিজরী ২৩ সালে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তার শাসনামল ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করে। তিনি বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য শাসক হয়েছিলেন। আমরা তার জনসেবামলূক কর্মকাণ্ডের উপর আলোকপাত করতে চাই।

উপদেষ্টা পরিষদ (Consultative Body) গঠন

হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকার্য ও জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। যাকে মসলিস-উশ-শুরা বলা হয়। তিনি ঘোষণা করেন যে, "পরামর্শ ব্যতীত কোন খিলাফত চলতে পারে না।[৩৫]" হযরত ওমরের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল উপদেষ্টা পরিষদ। কুরআন এবং নবীর (সঃ) সুন্নাত অনুসারে উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ অনুসারে তিনি সকল সমস্যার সমাধান করতেন। জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি প্রয়োজনে জনগণের মতামতও গ্রহণ করতেন। তাঁর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার পূরণ। জনগণ প্রকাশ্যভাবে তাদের নিজেদের অধিকারের দাবি তুলতে পারত। তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে ইসলামের সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতির প্রতীক বলা হয়। শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। কিংবা নিজে সাধারণ প্রজা থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেননি। তাঁর কাছে ছিল সকলেই সমান। হযরত ওমর (রাঃ)-এর উপদেষ্টা পরিষদ গঠন ছিল সময়োপযোগী এক মানবকল্যাণমূলক পদক্ষেপ। এই পরিষদ তাকে রাষ্ট্র চালনার ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করত, আর তিনি সেই দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন।

অমুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি

হযরত ওমর (রাঃ) একজন মুসলিম বিজেতা। তাঁর রাষ্ট্রের পরিধি বাড়তে থাকলে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। নিজ ধর্ম অনুসারীদের প্রতি নমনীয় থাকাটাই স্বাভাবিক। বর্তমান

---

৩৫. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, মুইউদ্দীন খান এম. এম অনূদিত (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, মে ১৯৭৫), পৃ. ১৬২, ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সময়েও অনেক দেশে বৈষম্য দেখা যায়। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) ব্যতিক্রম এক জনদরদী শাসক ছিলেন। এই সমস্ত লোক মুসলিম রাষ্ট্রে জিযিয়া কর দিয়ে সকল রকম অধিকার ভোগ করত। সম্পদশালী অমুসলিমদের নিকট হতে খারাজ আদায় করা হত। রাষ্ট্রীয় সম্পদ তাদের উপকার বা দুঃস্থ, গরিবদের উপকারে ব্যয় করা হত। জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তিনি অমুসলিমদের ঘর, গীর্জা, বৃদ্ধ ও পশুদের হত্যা বা অত্যাচার ইত্যাদি অমানবিক কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত থাকার জন্য বলতেন। অমুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণে মহানবী (সঃ) বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন–"যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে কষ্ট দেবে, আমি তার বিরুদ্ধে শেষ বিচারের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।"[৩৬]

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর শাসনামলে ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য এক ফরমান জারি করেন, তাতে উল্লেখ ছিল "আমি তাদেরকে এই অধিকার দিয়েছি যে, যখন কোন ব্যক্তি বয়সের জন্যে কাজের অনুপযুক্ত হয়, অথবা কোন দুর্বিপাকে দরিদ্র হয়ে পড়ে এবং এমন অবস্থায় পতিত হয় যে সে তার আপনজনদের নিকটেও দয়ার পাত্রে পরিণত হয়, তখন তাদের জিযিয়া রহিত হয়ে এবং তার পরিবার বায়তুলমাল থেকে ভাতা পাবে।"[৩৭]

অমুসলিমদের প্রতি সহানুভূতি ও তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে সেনাপতি খালিদ বিন অলীদ (রাঃ)-এর একটি চুক্তিনামার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায় তাতে উল্লেখ রয়েছে–

"অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে যে লোক বার্ধক্য, পঙ্গুতা বা বিপদের কারণে অথবা সচ্ছলতা থাকার পর দরিদ্র হয়ে পড়ার কারণে যদি এমন অবস্থায় পড়ে যায় যে, তার স্বধর্মীরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করেছে, তাহলে তার নিকট থেকে জিযিয়া নেয়া বন্ধ করা হবে এবং সে যতদিন ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করবে ততদিন পর্যন্ত তার পরিবারবর্গকে বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণ করা হবে।"[৩৮] হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ তাঁর বসরার শাসনকর্তা আদী বিন আরতাতকে লিখেছিলেন: "তুমি নিজে লক্ষ্য করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং যার উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজনমত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে তাদের দাও।"[৩৯] একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মের লোক বাস করতে পারে, আর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সকলেরই সমান নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে, সেজন্য হযরত ওমর (রাঃ) সকল নাগরিকের সমান অধিকারের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতেন যা তার জনসেবার মানসিকতার উত্তম পরিচয়।

বেতন ও অন্যান্য সুবিধা দান

ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণের জন্য সহায়তাসহ অন্যান্য জনস্বার্থের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) কর্মচারীদের জন্য বেতনের ব্যবস্থা করেন। কর্মচারীরা যাতে দুর্নীতিমুক্ত ও নিজেদের দায়িত্বের প্রতি যত্নশীল থাকে সেজন্য তিনি তাদের জন্য উচ্চ বেতনের ব্যবস্থা করেন। মানুষের জীবনের আর্থিক নিরাপত্তা থাকলে সে কোন অন্যায় করতে পারে না। এজন্যই হযরত ওমর (রাঃ) তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এছাড়াও তিনি কোন কোন কর্মচারীকে গণিমতের মালের অংশ ছাড়াও পাঁচ হাজার দিরহাম পর্যন্ত ভাতা প্রদান করেন। এছাড়াও হযরত ওমর (রাঃ) জনগণের কল্যাণের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। বিজিত দেশের কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তন করেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বিজিত এলাকার ভূমি কৃষকদের হাতে

---

৩৬. এ কে এম নাজির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮
৩৭. মাওলানা আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
৩৮. ড. আবদুল করিম জায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭, ৮৮
৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ছেড়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে তিনি কর্মচারী নিয়োগ করে তাদের নিয়োগপত্রে উল্লেখ করতেন :

১. মিহিন ও অতিরিক্ত মূল্যবান পোশাক পরিধান করতে পারবে না;

২. মোলায়েম রুটি খাবে না;

৩. বাড়ির দরজায় কোন দারোয়ান রাখতে পারবে না। এটা শুধু এই জন্য যে, কোন অভাবী লোক বিনা বাধায় যেন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলকে তার বক্তব্য জানাতে পারে;

৪. রুগ্ন ব্যক্তিদের দেখতে যাবে এবং মৃতের জানাজায় শরীক হবে;

৫. কখনও উৎকৃষ্ট তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না।[৪০]

ঐতিহাসিক মুর বলেছেন, "ওমরের (রাঃ) ভাতা প্রদান রীতি পৃথিবীর ইতিহাসে সম্ভবতঃ অতুলনীয়।"[৪১] জনগণের কল্যাণসাধনের জন্য ঐ সকল উপদেশ জনসাধারণের সামনে পড়া হত। আবার রাষ্ট্রে নিয়োজিত সকল কর্মচারীর প্রতি সমানভাবে খেয়াল রাখতেন। আর্থিক সচ্ছলতার জন্য নির্ধারিত বেতন ভাতা প্রসংগে উল্লেখ্য যে, "প্রত্যেক কর্মচারীকে তিনি এই পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতেন, যাতে সে অসদুপায়ে উপার্জন করার কল্পনাও না করে। ঘুষ ইত্যাদির দিকে কারও দৃষ্টি ছিল না। সরকারি কর্মচারীরা যে শুধু অসদুপায়ে উপার্জন করতেন না তাই নয়; বরং যে কোন প্রকারের খারাপ কাজকেই তাঁরা কোনসময় প্রশ্রয় দেননি। ঐ ধরনের কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে তাঁরা যে কোন উপায়েই হোক দমন করতেন।"[৪২]

ভূমি বন্দোবস্ত

হযরত ওমর (রাঃ) শাসন ক্ষমতায় বসে চিন্তা করলেন যে, বর্তমান প্রচলিত আইন অনুযায়ী কৃষকদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি কৃষকদের আর্থিক উন্নতির কথা চিন্তা করে ভূমি বন্দোবস্ত আইন প্রবর্তন করেন। করনীতি প্রবর্তনের জন্য তিনি ইরাকে জমি জরিপ করেন। আমাদের দেশেও বর্তমানে যেমন কৃষি শুমারি করা হয় ঐ একই নিয়মে জমির শ্রেণী অনুযায়ী করের ও তারতম্য করা হয়। তিনি প্রত্যেক মালিকের জন্য যথেষ্ট লা-খারাজ হিসেবে ছেড়ে দেন। নগদ অর্থ বা উৎপাদিত ফসল হতে এককালীন বা মেয়াদী কর দেয়া হত। আর করের ব্যাপারে তিনি জিম্মীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি মিশর ও সিরিয়াতেও ভূমি বন্দোবস্ত দেন।

জনকল্যাণের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা

হযরত ওমর (রাঃ) জনকল্যাণের জন্য রাজস্ব ব্যবস্থা চালু রাখেন যা মুহাম্মদ (সঃ) এর সময়ে নির্ধারিত হয়। আর এই রাজস্বের অর্থ ব্যয় করা হত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে। ইসলামের সেই যুগে রাজস্বের উৎস ছিল পাঁচ প্রকার যেমন :

১. খারাজ বা ভূমিকর;[৪৩]

২. যাকাত;[৪৪]

৩. জিযিয়া;[৪৫]

---

৪০. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

৪১. Sir william Muir, *Life of Mahomet* (London : 1856), Vol. 1, P. 95; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

৪২. মাওলানা মোহাম্মদ গরীব উল্লাহ ইসলামাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭

৪৩. আল্লামা আহমদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া বালাযুরী (র.), *ফুতুহুল বুলদান*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৯৮), পৃ. ৪৬১

৪৪. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ১৯৫-১৯৮

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

৪. খুমুস (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ);[৪৬]

৫. আলফে (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়)।[৪৭]

সাধারণ মানুষের উপকারের কথা চিন্তা করে মহানবী (সঃ) নিজেই এই রাজস্বের প্রবর্তন করেন। তাঁর নির্দেশ মোতাবেক জমিতে উৎপাদিত ফসল, সোনা-রূপা, উট, মেষ, ছাগল ইত্যাদির উপর কর নির্ধারণ করা হয়, এর সাথে হযরত ওমর (রাঃ) জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কয়েকটি নতুন কর প্রবর্তন করেন। ঐ সকল করসমূহ জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন রাস্তাঘাট, পুলনির্মাণ, জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির জন্য এ অর্থ বরাদ্ধ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চ স্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। দেশের মানুষের বেকারত্ব দূর করার জন্য এ অর্থ দিয়ে মিল, কল-কারখানা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। দরিদ্র কৃষকদের কথা চিন্তা করে কৃষকদেরকে দেয়া হয় সুদমুক্ত কৃষিঋণ। তাঁর এই রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে বলা যায়–"ফারুকে আযম (রাঃ)-এর রাজস্বনীতি ইসলামের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রাক ইসলামী আমলে যদিও রাজবংশ আরবে অধিকার বিস্তার করে রাজত্ব করেছিল কিন্তু কারো আমলে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। ফারুকে আযম (রাঃ) নতুন পদ 'সাহেবুল খেরাজ' (কালেক্টর) সৃষ্টির মাধ্যমে কর আদায়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা করেন এবং উহা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'সাহেব বায়তুল মাল' (ট্রেজারার) নিয়োগ করেন।"[৪৮] এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক পি.কে হিট্টি বলেন, "রাজস্ব বণ্টনকার্য সম্পন্ন করার জন্য আদমশুমারীর প্রয়োজন হয় এবং পৃথিবীর ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে এটাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারী।"[৪৯]

গরিব কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন

হযরত ওমর (রাঃ) প্রাচীনকালের শোষণমূলক ভূস্বত্ব ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন করে অবহেলিত ও দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি সাধন করেন। পূর্বে রোমানরা সিরিয়া ও মিশর জয় করে সেখানে সকল জমি কৃষকদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। স্থানীয় কৃষকদের কোন জমি না থাকায় তারা অভাব অনটনের মধ্যে পড়ে। হযরত ওমর (রাঃ) এই সকল এলাকা দখল করে গরিব কৃষকদের মধ্যে অনাবাদি জমি ভাগ করে দেন। জনগণের কল্যাণের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) আইন করেন যে, "মুসলমানগণ কোন অবস্থাতেই এই সমস্ত জমির মালিক হতে পারবে না। এমনকি কেউ নগদ মূল্যে কৃষকদের নিকট হতে এই সমস্ত জমি খরিদও করতে পারবে না। এতে তিনি ক্ষান্ত হননি। যে সমস্ত বিজয়ী মুসলমান ঐ সমস্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) তাদের জন্য কৃষিকার্য নিষিদ্ধ করে দেন। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষি কার্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞ দেশীয় কৃষকরা যেমন দক্ষতার সহিত চাষাবাদ করতে পেরেছিল। আরবের অনভিজ্ঞ লোকের দ্বারা তা সম্ভবপর হত না। বিশ্বের ইতিহাসে এই দিক দিয়ে তিনি নতুন এক নজীর সৃষ্টি করেন"।[৫০]

"ইরাক বিজয় ও খাস জমি, ইরাকের বিজয়ের পরপরই সিরিয়া, মিসরের উর্বর ভূমি এলাকায় ইসলামী বাহিনীর বিজয় অভিযান চলতে থাকে। কৃষি উৎপাদনের জন্যে এসব এলাকা ছিলো বিখ্যাত। হযরত ওমর (রাঃ) তার দুরদর্শিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনেকটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইরাকে কিছু সংখ্যক সৈন্যের মধ্যে সরকারি খাস জমি বণ্টন করা হয়েছিল। এরপর হযরত ওমর (রাঃ)

---

৪৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ১৯৮৮), ৬ষ্ঠ, পৃ. ৩১

৪৭. *প্রাগুক্ত*

৪৮. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১২; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২, ১১৩

৪৯. P. K. Hitti, *History of the Arabs* (London : 1970), P. 259; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫, ২০৬

৫০. সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:)*, হাফেজ মুনির উদ্দিন আহম্মদ অনূদিত (ঢাকা : আল-কোরআন একাডেমী, ২০০০), সংস্করণ-১, পৃ. ২৫৩; অধ্যাপক কে. আলী *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭, ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

নতুন ভূমি নীতি ঘোষণা করেন। সাহাবাদের অনেকে সমালোচনা করেন কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তার ঘোষিত নীতিতে অবিচল থাকেন। ইতিহাসে এ সম্পর্কে বহু চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণও পাওয়া যায়। হযরত ওমর (রাঃ)-এর অভিমত ছিলো যে, অধিকৃত ভূমিসমূহ মুসলমানদের সম্মিলিত মালিকানা হিসেবে বায়তুলমাল এবং ক্ষমতাসীন সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। স্থানীয় লোকদের যে জমি কৃষি কাজের জন্য রাজস্ব নীতির ভিত্তিতে দেয়া হবে"।[৫১]

গৃহ নির্মাণ ও পূর্ত বিভাগীয় কাজ

ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি বেড়ে যাওয়ায় জনকল্যাণের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) গৃহ নির্মাণ প্রকল্প কর্মসূচী হাতে নেন। বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মোতাবেক দালানকোঠা নির্মাণের কাজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই অধিবাসীদের জন্য দালানকোঠা নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে যেমন সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসন সুবিধা দেওয়া হয়, তখনও এই সুবিধা দেয়া হত। বর্তমানকালে দালানকোঠা নির্মাণ এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মনে করা হয় কিন্ত আমার মনে হয়, এই শিল্পের পথিকৃৎ হযরত ওমর (রাঃ)। শহর বা নগর পরিকল্পনার যে ধারণা তিনি দিয়েছিলেন বর্তমান সময়েও তা অতুলনীয়। শহর বা নগরায়নের মূল উদ্দেশ্য হল অধিবাসীদের নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া। স্বাস্থ্য রক্ষা, হাওয়া, বাতাস, রোদ, বৃষ্টি, পানীয় জলসহ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা পরিকল্পনাকারীর দায়িত্ব। এক্ষেত্রে হযরত ওমর তাঁর গভর্নরদেরকে নির্দেশ দেন– "তোমাদের শাসনাধীন এলাকার অট্টালিকাসমূহ একতলার ওপর আরো তলা বাড়িওনা। উঁচু অট্টালিকা যখন তোমরা তৈরী করবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য দুর্ভাগ্যের দিন।"[৫২]

এখানে উল্লেখ্য যে, গৃহ, গণপূর্ত ও শহরায়নের জন্য উপযুক্ত লোক হল ইঞ্জিনিয়ারগণ। অথচ হযরত ওমর কোন মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ইউনিভার্সিটিতে না পড়েও জনগণের কল্যাণের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী অট্টালিকা নির্মাণের হুকুম জারি করেন। বর্তমান সময়ে যেমন পরিবেশ দুষণ দেখা যায় তখন কিন্তু এরকম ছিলনা। তার কারণ ছিল ছোট ছোট শহর, অনুচ্চ দালানকোঠা, ঘর-বাড়ি, যার ফলে পরিবেশসহ জনস্বাস্থ্যকে রক্ষা করা সম্ভব হয়। জনসাধারণের জন্য তার গৃহনির্মাণ কর্মসূচী সম্পর্কে বলতে হয়, "ফারুকে আযম (রাঃ) সরকারিভাবে তিন শ্রেণীর গৃহনির্মাণ করেছিলেন। প্রথমত, ধর্মীয় গৃহাদি, মসজিদ, খানকা ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, সামরিক প্রয়োজনের গৃহাদি, কেল্লা, ছাউনি, ব্যারাক ইত্যাদি। তৃতীয়ত, সরকারি গৃহাদি যথা দারুল ইমারত, ধনভাণ্ডার, শাসকদের ভবন ইত্যাদি।"[৫৩]

শহর নির্মাণ

আমাদের বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এরকম দেশের গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করা বেশ সহজ। কিন্তু যে সকল দেশ নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত সেখানে দিনে প্রচণ্ড গরম আবার রাতে প্রচণ্ড শীত। আরব দেশ সেই রকম একটি দেশ। তাছাড়া এদেশের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। এরকম দেশের খলীফা হয়ে হযরত ওমর (রাঃ) দেশকে বসবাসের উপযোগী করে তোলাসহ নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করলেন। আর এলক্ষ্যে তিনি দেশকে শহরায়নের পথে নিয়ে যান। গ্রামীণ জীবন থেকে শহর জীবন অধিক উন্নত, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ সকল রকম নাগরিক সুবিধা শহর জীবনে বিদ্যমান। তাঁর সময়ে যে সকল বিখ্যাত শহর গড়ে ওঠে তার মধ্যে ছিল–

১. বসরা;
২. কুফা;
৩. ফুস্তার;

---

৫১. সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩, ২৫৪
৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
৫৩. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১৭; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. মুসেল;
৫. প্যালেস্টাইন;
৬. হিমস;
৭. দামেশ্‌ক;
৮. মিসর।[৫৪]

রসরা শহরে প্রথমে আটশত লোক বাস করে। পরে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দান করার ফলে খুব দ্রুত এই সংখ্যা লক্ষাধিক হয়ে যায়। আর এ শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তৎকালীণ সময়ের শ্রেষ্ঠ, যার ফলে বহু দিন ইহা মুসলমানদের গৌরবের বস্তু হয়ে থাকে। এ শহরে চল্লিশ হাজার লোকের বসবাসের উপযোগী গৃহ নির্মাণ করা হয়। এ শহরের সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করতে গেলে বলতে হয় "হযরত ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে ইহার সড়কগুলো চল্লিশ হাত প্রশস্ত করে তৈরি করা হয়। এখানে যে জামে মসজিদ নির্মিত হয় তাতে একসাথে চল্লিশ হাজার মুসলমান নামায আদায় করতে পারে।"[৫৫]

ফুস্তাত শহরটিও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে নির্মিত হয়, তবে এই শহর নির্মিত হওয়ার সাথে ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ঘটনা জড়িত আছে। মুসলীম বীর হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) যখন মিসর জয় করে নীলনদ ও মাকতাম নামক পাহাড়ের মাঝে সামরিক তাবু, দুর্গ ইত্যাদি স্থাপন করেন এমন সময় একটি কবুতর তার তাবুতে বাসা বাঁধে। তখন তিনি তাবু সেভাবে রেখে চলে যান। পরবর্তীতে এ তাবুকে কেন্দ্র করে এ শহর গড়ে ওঠে। এ শহর সম্পর্কে এক পর্যটক বলেন "এই শহর বাগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্যের কেন্দ্র ও ইসলামের গৌরব। এখানকার জামে মসজিদ অপেক্ষা মুসলিম জাহানের আর কোন মসজিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার এত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় না। এখানকার সামুদ্রিক বন্দরে দুনিয়ার অধিক সংখ্যক জাহাজ নোংগর করে থাকে।"[৫৬]

হযরত উমর (রাঃ)-এর শহরায়নের উজ্জল প্রমাণ হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত মুসেল শহর। আর এই শহরটি গ্রাম্য পরিবেশে গড়ে উঠে। অবহেলিত, বঞ্চিত, অজপাড়াগাঁকে যে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আদর্শ শহর হিসেবে গড়ে তোলা যায়, এটা ছিল সেরকম একটি শহর। হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক এখানে মসজিদ মাদ্রাসাসহ ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। এই শহরটি সমুদ্র উপকূলে গড়ে তোলা হয়। শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সমুদ্র উপকূলে প্রহরা নিযুক্ত করা হয়। এই শহরের সুযোগ-সুবিধা ও গুরুত্বের জন্য পরবর্তীতে এখানে একটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।[৫৭]

লংগরখানার ব্যবস্থা

হযরত উমর (রাঃ) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রশাসনিক সংস্কারের সাথে সাথে নাগরিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণসাধন। আর এই কল্যাণসাধনের জন্য তিনি নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যার মধ্যে একটি হল গরিব, দুঃখী, বৃদ্ধ, অন্ধ, আতুর ইত্যাদি অবহেলিত, সুবিধা-বঞ্চিতদের জন্য সরকারিভাবে বিশেষ বিশেষ এলাকায় লংগরখানা স্থাপন। লংগরখানায় কোন ভেদাভেদ থাকে না। যার যত খুশী খেতে পারে হোস্টেলের মত টাকা দিতে হয় না। বর্তমানে যেমন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য অস্থায়ী খাদ্যভাণ্ডার খোলা হয়। হযরত ওমর (রাঃ) নিজ রাজ্যে মানুষের খাদ্যাভাব দূর করার জন্য লংগরখানার ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই কর্মসূচী সম্পর্কে বলা হয়েছে "১৮শ হিজরীতে হেজাজে

---

৫৪. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১৬, অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮
৫৫. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১৩৭
৫৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭
৫৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল ঐ সময় তিনি সকল প্রদেশ হতে দ্রুত পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য আনয়ন করে দুর্ভিক্ষের মোকাবেলা করেছিলেন। এমনকি যতদিন এই এলাকার দুর্ভিক্ষের মোচন হয়নি ততদিন পর্যন্ত তিনি শুকনা রুটি (ছাড়া উন্নতমানের খাদ্য গ্রহণ করেননি) ভক্ষণ করে মানবতার এক চরম দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন।"[৫৮]

তিনি নিজে জনগণের নৈতিকমানের প্রতি খেয়াল রাখতেন গরিব-দুঃখীর অনাহারের প্রতি তিনি সর্বদা নজর দিতেন। অনেক সময় রাজ্যের বাদশা হয়েও ফকির মিসকীনের সাথে আহার করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, "তিনি নিজে খাদ্য গ্রহণকালে ফকীর, মিসকিন ও ক্রীতদাসদেরকে নিজের সঙ্গে বসিয়ে খাওয়াতেন।[৫৯] তিনি বলতেন : ক্রীতদাস ও ফকির মিসকীনের সঙ্গে একত্রে আহার করাকে যারা লজ্জাকর বা মর্যাদাহানিকর মনে করে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"[৬০]

তাঁর এই কাজকর্মের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি খাদ্যাভাব দূর করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে প্রয়োজনীয় ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে এরশাদ করেন- "খাও পান কর এবং অপব্যয় করো না, আল্লাহ্ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না।[৬১]"

হযরত ওমর (রাঃ)-এর জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণে আরও বলা যায়–"এতিম, অভিভাবকহীন শিশুদের লালনপালনের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সম্রাজ্যের মধ্যে কেউ না খেয়ে আছে কিনা তা অবলোকনের জন্য তিনি বিভিন্ন সময় গভীর রাত্রিতে একাকী রাজপথে বের হতেন এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছিয়ে দিতেন।"[৬২]

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীতে বাস করছি। এই সময়কে উন্নতির চরম যুগ বলা হয়। বর্তমানে সকলক্ষেত্রেই উন্নতির বিপ্লব ঘটেছে। এমনকি যোগাযোগের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বিশ্বের দ্বাদশ বৃহত্তম সেতু নির্মাণ করা হয়েছে অথচ তৎকালীণ সময়ে মুসলিম বিশ্ব এত উন্নতি লাভ করেনি। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) খিলাফতে আরোহন করে রাজ্যের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কারসহ যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনেন এবং এক্ষেত্রে তিনি উন্নতি সাধন করেন। যেমন বলা হয়েছে, "সড়কপথসমূহ ছিলো নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক, সড়ক নির্মাণে কোনো কারচুপি হতোনা। একারণে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও কোন সড়কে ভাঙ্গন বা ফাটল দেখা যেতো না। মিসর থেকে মদীনার দূরত্ব ছিলো অনেক। একারণে মিসর থেকে খাদ্যশস্য মদীনায় পরিবহনে হযরত ওমর (রাঃ) জাহাজের ব্যবস্থা করেন। সামুদ্রিক জাহাজে বন্দর পর্যন্ত খাদ্যশস্য পৌঁছাতো। তারপর উটের পিঠে একদিন একরাত সময়ে সেই খাদ্যশস্য মদীনায় পৌঁছাতো।"[৬৩]

হযরত ওমর (রাঃ) নানাবিধ জনহিতকর কাজে যে মনোযোগী ছিলেন তার প্রমাণ ইতিহাসেও পাওয়া যায়, যেমন বলা হয়–"তাঁর আমলে অসংখ্য সরকারি ভবন, মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি নির্মিত হয়। আল্লামা শিবলী নোমানীর মতে, হজরত ওমরের শাসনামলে ফুস্তার শহরে ৩৬টি মসজিদ, ৮০০ রাস্তা এবং ১১৭০টি স্নানাগার ছিল।"[৬৪]

---

৫৮. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১৮; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪, ২১৫
৫৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩
৬০. *প্রাগুক্ত*
৬১. সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩১
৬২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪
৬৩. সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯
৬৪. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ১৫৭; অধ্যাপক কে, আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

মুসাফিরখানা নির্মাণ

হযরত ওমর (রাঃ) দুঃস্থ মানবকল্যাণের জন্য তাঁর রাজ্যে মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। পথিক, প্রবাসীদের জন্য তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত ওমরের রাজ্যের বিস্তৃতি বেশি হওয়ায় তিনি মনে করেন কেউ যদি কোন প্রয়োজনে খলীফার কাছে আসে তাহলে তার জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আর এলক্ষ্যে তিনি মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। আমাদের দেশেও এক সময় গ্রাম অঞ্চলে অনেক বাড়িতে দেখা যেতো কাছারী বা বৈঠকঘর, যেখানে দূরের কোন অতিথি, ফকির, মিসকিন রাত যাপন করতো, কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। হযরত ওমর (রাঃ) মানুষের কল্যাণের জন্য এই মুসাফিরখানা নির্মাণ করেন। যেখানে এই শ্রেণীর মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন "যদি ফুরাত নদীর তীরেও একটি কুকুর অনাহারে মারা যায়, উমরকে তার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট জওয়াব দিতে হবে।"[৬৫]

পানির কূপ ও সরাইখানা স্থাপন

পানি মানুষের জীবন। আবার বিশুদ্ধ পানি ছাড়া জীবন অচল। ইসলাম ধর্ম বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। নবী করিম (সঃ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করায়েছে যে স্থানে পানি পাওয়া যায় সে যেন একটি দাসমুক্ত করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে পানি পান করায়েছে যেখানে পানি পাওয়া যায় না সে যেন তাকে জীবন দান করল।"[৬৬]

হযরত ওমর (রাঃ) জনকল্যাণের জন্য শহর-বন্দর স্থাপন করেন এবং এক শহর থেকে অন্য শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা-ঘাটেরও ব্যবস্থা করেন এবং দূরত্ব বেশি হলে রাস্তার মাঝে মাঝে পানির কূপ ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য হোটেল বা সরাইখানার ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে বিশুদ্ধ পানি বতলজাত করে বাজারে ছাড়া হয় এবং মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যবহার করে। আবার অনেক দূরে কোথাও যেতে হলে পথিমধ্যে লাঞ্চ বা ডিনার সেরে নেয়। এসকল পদক্ষেপের পথিকৃৎ বলা চলে হযরত ওমর (রাঃ)-কে। হযরত ওমর (রাঃ) মদীনা হতে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ পথের পার্শ্বে অনেকগুলি পুলিশী পাহারা, সরাইখানা ও ঝর্ণাধারা নির্মাণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে আরও বলা হয়েছে "তিনি মদীনা শরীফ হতে আরম্ভ করে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পানির কূপ, সরাইখানা ও পথিকদের নিরাপত্তার জন্য পানাহারের ব্যবস্থা করেছিলেন।"[৬৭]

খাল খনন কর্মসূচী

হযরত ওমর (রাঃ) দেশের মানুষের মঙ্গল ও জীবনযাত্রার মানের উন্নয়নকল্পে খাল খনন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য তেল সমৃদ্ধ এলাকা হলেও এক সময় সেখানে কৃষি কাজ করে মানুষের জীবন ধারণ করতে হত। দেশের অনুন্নত এলাকাকে আবাদ করার জন্য দেশব্যাপী তিনি খাল খনন করেন। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই ভারত তার সীমান্তে গঙ্গা নদীতে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে তার অনুন্নত এলাকায় ফসল উৎপন্ন করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক স্থানে বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য খাল খনন করা হয়েছে। এসকল কর্মসূচী বহু আগেই হযরত ওমর (রাঃ) গ্রহণ করেন। তার খাল খনন কর্মসূচীর উপর আলোকপাত করতে গেলে বলতে হয়– "কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন ও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য খলীফা সমগ্র দেশে কূপ বা খাল খনন করে সেচকার্য সম্পাদনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেছিলেন। বসরায় মিষ্টি পানি সরবরাহের উদ্দেশ্যে দজলা নদী হতে খাল খনন করা হয়। এই খালের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় নয় মাইল। এই প্রসঙ্গে নহরে মা'কাল, নহরে মা'আদ ও নহরে আমীরুল মু'মিনীন-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"[৬৮]

---

৬৫. এ কে এম নাজির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৬৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু মাজাহ, আল-কাযভীনি, *সুনানু ইবনে মাজাহ* (দিল্লী : আল-মাকতাবা রহীমিয়া, ১৩৮৫ হিঃ), ২য় খণ্ড

৬৭. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১৪, ২১৫; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

৬৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ে আমরা দেখি মিশরের সুয়েজ খাল, পানামা খাল, জার্মানীর কিয়েল খাল, চীনের গ্রান্ড খাল ইত্যাতি বিখ্যাত খালসমূহ বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উন্নত বিশ্বের সাথে অনুন্নত বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্য রক্ষাকল্পে এসকল খালের গুরুত্ব অত্যধিক। অথচ বহু আগেই হযরত ওমর (রাঃ) এ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তার সময় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন, পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য বিভিন্ন খাল খনন করা হয়। যেমন বলা হয় "এই সময়ে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সেচ ব্যবস্থার জন্য অনেকগুলো খাল খনন করা হয়। ইহাদের মধ্যে বসরায় আবু মুসা খাল, ইরাকের মা'কাল খাল, পারস্যের মা'আদ খাল এবং মিসরের আমিরুল মু'মিনীন খাল উল্লেখযোগ্য। আমিরুল মু'মিনীন খাল খনন করায় লোহিত সাগরের সহিত নীলনদের সংযোগ স্থাপিত হয়। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ যেমন সুগম হয়েছিল, তেমনি মিসর হতে আরবে শস্য পরিবহণ সহজ হয়েছিল।"[৬৯]

জনশিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। যে জাতি যত শিক্ষিত তারা তত উন্নত। এক সময় আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হত অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ। কারণ শিক্ষা দীক্ষায় তারা পিছিয়ে ছিল। অথচ শিক্ষার গুরুত্ব মুহাম্মদ (সঃ) অনেক আগেই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন "শিক্ষা লাভ প্রত্যেক নর-নারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য।" আবার বলা হয়েছে "শিক্ষার জন্য তোমরা প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।" ইংরেজীতে বলা হয়- Education is the backbone of a Nation; আমাদের পবিত্র কুরআনে প্রথমেই কিন্তু পড়ার জন্য বলা হয়েছে[৭০]। শিক্ষার গুরুত্ব অত্যধিক বিধায় আমাদের দেশে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। সবার জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আবার এলক্ষ্যে দেশব্যাপী স্যাটেলাইট স্কুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় পর্যন্ত গঠন করা হয়েছে। অথচ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, হযরত ওমর (রাঃ) সার্বজনীন শিক্ষার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আর এলক্ষ্যে তিনি সর্বত্র জনশিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। যেমন- বিজিত দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন করে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেজন্য তিনি প্রত্যেক রাজ্যে ও এলাকাতে বড় বড় আলেম ও সাহাবাগণকে হাদীস ও ফিকাহ শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত ওমরের শিক্ষা কর্মসূচীতে বলা যায়–"তাঁর সময়ে বহু মাদ্রাসা স্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীকালে এইসব মাদ্রাসায় পৃথিবীর বিখ্যাত আলিমগণ শিক্ষালাভ করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ), ইমাম নাখঈ (রহঃ) ইমাম হাম্মাদ (রহঃ) প্রমুখ।"[৭১]

হযরত ওমর (রাঃ) বহু বিখ্যাত বিদ্যালয় স্থাপন করার ফলে মুসলিম খিলাফত বহুদিন পর্যন্ত টিকে ছিল। "মুসলমানগণ কেবলমাত্র আরবেই নয়, বরং সমগ্র বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এমন সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে অথবা খ্রীষ্টান রাজ্যে ও পাওয়া যায়না।"[৭২]

হযরত ওমর (রাঃ) অনগ্রসর বেদুঈনদের জন্যও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তাঁর এই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে "বাস্তুহারা অনগ্রসর বেদুঈনদের জন্য হযরত ওমর (রাঃ) কুরআন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। একাজে আবু সুফিয়ান নামক এক সাহাবীকে নিযুক্ত করেন। কেউ কুরআন পড়তে না পারলে শাস্তি দেওয়া হত।"[৭৩]

---

৬৯. আল্লামা শিবলী নো'মানী, *আল ফারুক*, পৃ. ২১৪, ২১৫; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ২১০, ২১১

৭০. সূরা আলাক, আয়াত : ১

৭১. মাওলানা মোহাম্মদ গরীব উল্লাহ ইসলামাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬

৭২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৪; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

৭৩. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলাম শিক্ষা* (ঢাকা : সোনালী সোপান, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৫), পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী মুদ্রার প্রচলন

ইসলামী মুদ্রার প্রচলন হযরত ওমর (রাঃ) কে ইসলামের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র শাসক হিসেবে পরিচিতি দান করেছে। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করেন, তারপর মনে করেন যে, মুসলমানদের আলাদা সংস্কৃতি থাকা দরকার আর এলক্ষ্যে তিনি তাঁর রাজ্যে ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন করেন। তিনি জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করতেন। তার শাসনামলের আগে আরবে কোন ইসলামী মুদ্রা ছিলনা বলে অনেক ঐতিহাসিক ধারণা করেন। আবার ইসলামী মুদ্রার প্রচলন কে করেন তা নিয়েও অনেকের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তবে আল্লামা বালাযুরী একটি মত দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন, "১৮শ হিজরীতে হযরত ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা প্রচলন করেন এবং সেই বছরই তিনি ডাক বিভাগ যথারীতি চালু করেন।"[৭৪]

হাসপাতাল নির্মাণ

মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে চিকিৎসা একটা অধিকার। কোন রাষ্ট্রের মানুষের মৌলিক অধিকার পুরণ না হলে তাকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট হাত পাততে হয়। বর্তমান সময়ে আমরা দেখি আফ্রিকার অনুন্নত দেশসমূহে চিকিৎসার অভাবে অল্পদিনেই মানুষ মারা যায়। সেখানে এইড্‌সের মত প্রাণঘাতি অসুখ কেড়ে নিচ্ছে অসংখ্য প্রাণ। এসকল দেশে নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র। আমাদের দেশেও ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন হাসপাতলকে অধিক শয্যাবিশিষ্ট করা হচ্ছে। আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, আমরা যে চিকিৎসার কথা ভেবে হাসপাতাল নির্মাণ করি বহু আগেই সেই প্রকল্প হযরত ওমর (রাঃ) গ্রহণ করেন। তিনি সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করার জন্য তার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ক্লিনিক, ডিসপেনসারী ইত্যাদি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।[৭৫]

হাদীসে এসেছে–"মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন বলবেন, "হে বনি আদম! আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে যাওনি। বান্দা জবাবে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে আপনার রোগের খবর নিতে যেতাম, আপনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক? তিনি বলবেন : তুমি কি জানতে না যে আমার অমুক বান্দা রোগগ্রস্ত ছিল? তুমি কি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি জান না, তুমি যদি তাঁর রোগের খোঁজ-খবর নিতে যেতে আমাকে তার কাছে পেতে"।[৭৬]

হযরত ওমর (রাঃ) ছিলেন মানব দরদী, জনকল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতাল নির্মাণ করেন, আর সর্বসাধারণ সেখান থেকে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারতো।

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমৃত্যু মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। খিলাফত লাভের পর তাঁর নানামূখী জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী তাঁকে ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে আমরা তাঁর জীবনের সকল বিষয়ের প্রতিফলন ফুটিয়ে তুলতে পারি–

হে ওমর! আমীরুল মোমেনীন!!
রুক্ষ মরুর রুক্ষ মানুষ
সূক্ষ্ম চিন্তা উঠে জেগে!
সোনার পরশ পেয়ে সোনা হয়ে যায়
বিশ্বের বিস্ময়, অমরত্ব পায় সীমাহীন ত্যাগে!!
কে সেই মানুষ,

---

৭৪. আল্লামা আহমদ ইবন ইয়াহ্ইয়া বালাযুরী (র.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬
৭৫. বিস্তারিত দ্র. Walkar, *History of the Law of Nations* (কেম্ব্রিজ : ১৯৫৮), ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪-৬৬; অধ্যাপক কে, আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫
৭৬. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

রাতের অতন্দ্র প্রহরী!
নগরীর সকল প্রাণী নিবিড়ে ঘুমায়।
কার সে বিনিদ্র আঁখি
মদীনার অলি গলি ঘুরে
বৃদ্ধার জীর্ণ কুটিরে
খাদ্যের বোঝা নিজ কাঁধে নিয়ে
অভাবীর সম্মুখে নামায়!!
কোন্ সে হৃদয়!
যে উদার হৃদয়ে ছিলো
সীমাহীন ভয়, ছিলো একরাশ আশা।
আল্লাহর ভয়ে ভীত সে হৃদয়
তাঁরই সন্তুষ্টির আশায় ছিলো উন্মুখ
কলজের টুকরো হয়ে কলজেয় ছিলো
নবীর প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা।।
ছিলো না হিংসা, দ্বেষ, ছিলো না অহংকার
লোভ-লালসা, স্বজনপ্রীতির দুর্বলতা,
ছিলোনা আরাম-আয়েশ,
মোজাহিদ তিনি নির্ভীক, দ্বীনের সাধনায় পূর্ণ হৃদয় তার
এ কোন্ বাদশা ঘুমায়!
সেখানে বৃক্ষতলে ছিলো না বিছানা
শিয়রে শক্ত শেকড়, এ বুঝি বালিস তার?
জোড়া তালি দেয়া পিরহানে ঢাকা,
ঘর্মাক্ত অবয়ব!
এই কি তিনি আধেক, পৃথিবীর রাজত্ব যার!!
ওরা হতবাক, চোখে বিস্ময়, জিজ্ঞাসা!
কোন্ সে সোনার পরশে তৈরি হয়েছে
এই খাদহীন সোনা!
যার হৃদয় জুড়ে রয়েছে শুধুই
আল্লাহ ও তার রসূলের ভালোবাসা।।
নিরলস জীবন তার, ছিলো না বিশ্রাম!
নির্বিলাস, সংযমী, স্বল্পাহারী
কখনো করেনি পূর্ণ ক্ষুধা নিবারণ
তাকে তো সবাই জানি–জানি তার নাম ॥
আমার নবীর হাতে যিনি রেখেছেন হাত–
সুখে দুখে ছিলেন আমার নবীর সাথী
দ্বীনের সেবায় নিরলস কাজ করেছেন দিন রাত ॥
দ্বিতীয় খলিফা তুমি,
হে ওমর! আমীরুল মু'মেনীন!!
নবীর সীরাত তোমায় করেছে ধন্য
মালিকের মেহমান তুমি,
এখানে তোমার নাম অম্লান, অমলিন!! [৭৭]

---

৭৭. সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওসমান (রাঃ)

হযরত ওসমান (রাঃ) ইসলামের তৃতীয় খলীফা। তিনিই সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন।[৭৮] হযরত ওমর (রাঃ) এর শাহাদতের পর তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিয়ে হযরত ওমরের অসমাপ্ত কর্মকাণ্ড সমাপ্ত করার পাশাপাশি তিনি রাষ্ট্রের উন্নতির কথা চিন্তা করলেন। আর এ লক্ষ্যে তিনি বেশ কিছু যুগান্তকারী জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁর খিলাফতের শেষ দিকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও আত্মীয়করণের অভিযোগ তোলা হয়, যার ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত তাকে শহীদ হতে হয়। তিনিই ইসলামী খিলাফতের সবচেয়ে বেশীদিন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর আমলে ইসলাম আফ্রিকা থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি রাসূলের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তার সকল সম্পত্তি ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। তাকে উসমান গণি বলা হত।[৭৯] তিনি লেখা-পড়াজানাসহ নম্র ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন।[৮০] তাঁর পিতার নাম ছিল আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ্।[৮১] ৭০ বছর বয়সে তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে স্বীয় রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে চাই।

সাধারণের জন্য 'বি'রে রূমা' ক্রয়

হযরত ওসমান (রাঃ) তৎকালীণ ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে একজন, তিনি মদীনায় এসে নিজের চোখে মুসলমানদের নানাবিধ সমস্যা দেখতে পেলেন যার মধ্যে অন্যতম হল পানীয় সমস্যা। পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মুসলমানগণ মদীনায় হিযরতের ফলে প্রথম দিকে তাদেরকে আর্থিক সংকটে কাটাতে হয়েছে। এ অবস্থায় হযরত ওসমান (রাঃ) প্রথমে পানির সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। আরব দেশ মরুভূমির দেশ, মরুভূমির এই দেশে মাঝে মধ্যে ঝর্ণাধারা ও কূপের পানির ব্যবস্থা ছিল যার উপর নগরবাসীদের নির্ভর করতে হত। এই সময়ে মদীনায় 'বি'রে রূমা' নামে একটি কূপ ছিল যার মালিকানা ছিল একজন ইহুদি। সে সুযোগ বুঝে অত্যন্ত চড়া দামে মুসলমানদের নিকট পানি বিক্রি করতো। হযরত ওসমান (রাঃ) উক্ত কূপের অর্ধেক ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পানি উঠানো নিয়ে ইহুদির দুষ্টামি ও ছলচাতুরীর জন্য হযরত ওসমান (রাঃ) অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে সম্পূর্ণ কূপটি কিনে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

এই কূপ ক্রয় সম্পর্কে বলা হয়েছে–"মুহাজিরীন যখন মদীনায় পৌছান, তখন সেখানে পানির অধিক অভাব ছিল। সারা শহরে মাত্র 'বি'রে রূমা' নামে এক ইহুদির পানযোগ্য একটি কূপ ছিল। সে তাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছিল। মুহাজিরীনদেরও এতদূর ক্ষমতা ছিলনা যে, পানি ক্রয় করে পান করবে। হযরত ওসমান ১৮ হাজার দিরহাম দিয়ে ঐ কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।"[৮২]

---

৭৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬২; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

৭৯. ইবন কাসীর, *আল-বিদায়া ও'য়ান নিহায়া*, (তা. বি), ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০০

৮০. আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক* (মিশর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭; মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৮

৮১. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮

৮২. আবু দাউদ সুলায়মান ইবন আল-আশ'আস আস্সাজিসতানী, সুনানু আবু দাউদ (কানপুর : বাব ফী ফাদ'লি সা'য়ি'ল-মা'), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

তার এই জনসেবার জন্য তিনি বিশ্ব ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা তিনি খিলাফত লাভের আগেই শুরু করেন।

মসজিদ সম্প্রসারণ

নবী করিম (সঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদে নববী সম্প্রসারণ করা হয়। আর তার জন্য হযরত ওসমান জমি কিনে দেন। সেসময় মসজিদ আকারে আয়তনে ছোট হওয়াতে স্থান সংকুলাণের অভাব দেখা দেয়। এ অবস্থায় নবীজি মদীনার মসজিদের স্থান সম্প্রসারনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু তার হাতে জমি কেনার মত যথেষ্ট অর্থ ছিলনা। অপরদিকে সাধারণ মানুষের নামাজ পড়াসহ অন্যান্য প্রয়োজনে নানারকম সমস্যা দেখা দেয়। এ মসজিদ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হত। যাকে বর্তমান সময়ে মন্ত্রণালয় বা সচিবালয় যাই বলিনা কেন। সেই মসজিদে নববী সম্প্রসারণের জন্য জমি ক্রয় করার সময় ওসমান গণি এগিয়ে আসেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর খেদমত সম্পর্কে বলা যায়- "রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আমল হতেই মসজিদে নববী নির্মাণের দিকে হযরত ওসমান (রাঃ) গভীর আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদে নববী আরও বড় আকারে তৈরি করার সংকল্প নিলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদের পার্শ্ববর্তী জমি ক্রয় করে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে পেশ করেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) উহা গ্রহণ করেন এবং সাহাবীগনের উপস্থিতিতে মসজিদ পুনঃনির্মাণ করেন।"[৮৩] হযরত ওসমান (রাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, মসজিদ কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ইহা সর্বসাধারণের জন্য, এখানে সকল ভেদাভেদ ভুলে মানুষ জড় হয়। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মসজিদে নববীকে সম্প্রসারণের জন্য জমি ক্রয় সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য–"সেই সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) অনেক উচ্চমূল্যে এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করলেন এবং সেই অংশ হুজুর (সঃ)-এর জীবদ্দশায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হুজুর (সঃ) উভয়স্থানে তাঁকে বেহেশতের শুভ সংবাদ দান করেন।"[৮৪]

যুদ্ধ তহবিলে দান

ইসলাম সার্বজনীন, ইসলামের আবির্ভাব মানুষের কল্যাণের জন্য। মুহাম্মদ (সঃ) যখন পৃথিবীতে আসেন তখন পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত তমসাচ্ছন্ন ছিল। তিনি নবুয়্যত লাভ করে সমগ্র পৃথিবীর শাসনতন্ত্রকে পরিবর্তন করে এক সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করেন। আর এজন্য তাকে অনেক সময় যুদ্ধ বিগ্রহ পর্যন্তও করতে হয়েছে। হযরত ওসমান (রাঃ) রাসূলের সবচেয়ে ধনী সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলামের প্রয়োজনে মানুষের প্রয়োজনে অকাতরে ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন। নবম হিজরীতে নবীজি যখন জানতে পারেন যে, রোম সম্রাট হীরাক্লিয়াস লক্ষাধিক সৈন্যসহ মদীনা আক্রমণে আসছে তখন তার মোকাবেলা করার জন্য নবীজি মুসলমানদের সহযোগিতা চাইলেন। সকলে সামর্থ অনুযায়ী মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য-সহযোগিতা করলো; কিন্তু হযরত ওসমান প্রায় একাই সকল ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি ঐ সময় ইসলামের প্রতিষ্ঠা ও খেদমতের জন্য যে পরিমাণ সাহায্য সহানুভূতি দান করেন তা ছিল-

১. দশ হাজার সৈন্যের অস্ত্র সরবরাহ;
২. তাদের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা;
৩. এই সকল সৈন্যের সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা;
৪. নয়শত উট দান;
৫. একশত ঘোড়া দান;
৬. এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান;
৭. মোট সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা।[৮৫]

---

৮৩. মাওলানা মুহাম্মদ গরীব উল্লাহ ইসলামাবাদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩
৮৪. আল্লামা আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবন জারীর আত্তাবারী , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮; মুহাম্মদ হাসীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০
৮৫. মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত ওসমান (রাঃ)* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট-২০০১), পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণমুদ্রাগুলি দেখে নবীজি অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন। যেমন বলা হয়েছে–"স্বর্ণমুদ্রাগুলি প্রাপ্ত হয়ে হুযুর এত খুশী হলেন যে, মুদ্রাগুলোকে এক হাত হতে অন্য হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে বলতে লাগলেন–অদ্য হতে আর কখনও ওসমানকে কোন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না।"[৮৬]

তাবুক যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন সম্পর্কে আরও বলা যায়- "তাবুক অভিযানের সময় অর্থাভাবে মুসলমানগণ যখন গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন তখন তিনি নগদ এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা ও তিনশত উট দান করেছিলেন।"[৮৭]

তার এই যুদ্ধ ব্যয় সম্পর্কে তারীখুল ইসলামীতে বলা হয়েছে–"তাবুকের যদ্ধে তিনি দশ হাজার সৈন্যের খরচ বহন করেন। ইহা ছাড়া এক হাজার উট, সত্তরটি ঘোড়া, এক হাজার দিনার চাঁদা হুজুর (সঃ)-এর দরবারে পেশ করেন। হুজুর (সঃ) খুশী হয়ে বলেন, 'আজকের পরে ওসমান যদি এ জাতীয় কোন ভাল কাজ নাও করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই।"[৮৮]

নাগরিকদের জন্য বেতন, ভাতা বৃদ্ধি ও বৃত্তি প্রদান

বর্তমান সময়ে যেমন কোন রাষ্ট্রকে উন্নতি লাভ করতে হলে নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়াসহ নানামূখী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়। এমনকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়। আর এলক্ষ্যে তাদের বেতনের স্কেল নির্ধারন ও অবসর ভাতার ব্যবস্থা করতে হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) ক্ষমতায় যেয়ে তিনি এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেন। তার শাসনামলে বহু এলাকা ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়, যার ফলে রাজ্যে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর তখন তিনি সাধারণ নাগরিকদের জন্য বৃত্তি, ভাতা হিসেবে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর এই কর্মসূচী সম্পর্কে বলা যায়–"ওসমান (রাঃ) যে সময় খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন মদীনায় খাদ্যাভাব অত্যন্ত প্রকটরূপ ধারণ করায় মদীনাবাসীগণ নিতান্ত কষ্টভোগ করছিলেন। মদীনায় সে বৎসরটি ছিল অজন্মার বৎসর। মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিরই বেশী কষ্ট হচ্ছিল। খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) এটা অনুভব করে করুণায় বিগলিত হলেন। তাঁর খিলাফতের বয়স তখন সবেমাত্র নয়দিন, সেই সময় তিনি এক ফরমান জারী করে রাজধানীর সকল স্বাধীন নাগরিকের ভাতা সমান হারে একশত দিরহাম করে বাড়িয়ে দিলেন। মদীনাবাসী সকলে এতে যারপরনাই খুশী হলেন।"[৮৯]

সাধারণের জন্য সরকারি লঙ্গরখানা

হযরত ওসমান (রাঃ) অত্যন্ত খোদাভীরু লোক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, মানবসেবা পরম ধর্ম। মানুষের সেবা করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্টি করা যায়। এলক্ষ্যে তিনি হযরত ওমরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত লঙ্গরখানাসমূহের দ্বার রমজান মাসে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিতেন। লঙ্গরখানা খোলা হয় সাধারণত অভাব, অনটন, দায়গ্রস্থ লোকের সুবিধার জন্য। হযরত ওসমান (রাঃ) লঙ্গরখানাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। আমাদের দেশে যেমন সংকটের সময় সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারি সাহায্য তহবিল গঠন করেন, ঠিক তেমনি হযরত ওসমান (রাঃ) জনগণের অভাবের সময় সরকারি লঙ্গরখানার ব্যবস্থা করেন।

জনস্বার্থে রাস্তা ও সেতু নির্মাণ

আমরা একবিংশ শতাব্দীর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি। বর্তমানে পৃথিবী সর্বক্ষেত্রে উন্নতির চরমশিখরে। নিমিষেই পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যাওয়া যায়। এতসব উন্নতি মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই। যখন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তখন তা কেবল ব্যক্তি স্বার্থের জন্যই করা হয় না বরং তার

---

৮৬. *প্রাগুক্ত*

৮৭. মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, *আসাহহুস সিয়ার* (দিল্লী : কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৬৮), পৃ. ৩১৮; ইমাম আহমদ ইবন মুহাম্মদ হাম্বল আশশায়বানী, *আল মুসনাদ* (কায়রো : মাত্‌বা'আ আশশারকিল্প ইসলামিয়া, ১৯৬৭), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৩

৮৮. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

উপকারীতা সার্বজনীন চিন্তা করা হয়। হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তের সাথে যোগাযোগ করার জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। আবার যেখানে পুল, সাঁকো, কালভার্ট নির্মাণ প্রয়োজন সেখানে তাই করেন। ইসলামী খিলাফতের আগে আরবে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম ছিল উট, যাকে মরুভূমির জাহাজ বলা হত। কিন্তু ক্রমান্বয়ে দৃশ্যপট পাল্টাতে থাকে। হযরত ওসমান (রাঃ) সাধারণ মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বহু রাস্তা নির্মাণ করেন। আবার রাস্তা দীর্ঘ হলে মানুষের জন্য লাঞ্চ, ডিনারের জন্য সরাইখানারও ব্যবস্থা করেন।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক আলোচনা করতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "হযরত ওসমানের খিলাফতকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। নিত্যনতুন রাজ্যসমূহ সংযোজিত হওয়ার ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন বহু বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং রাজস্ব আয় বহুলাংশে বেড়ে যায়। খলীফা এই বর্ধিত রাজস্ব জনহিতকর কার্যেই ব্যয় করতেন। লোকের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বহু সড়ক নির্মাণ করেন। এই সমস্ত সড়কগুলির পার্শ্বে স্থানে স্থানে যাত্রীদের সুবিধার্থে বহু সরাইখানাও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত সরাইখানায় পানীয় ও খাদ্যের সু-ব্যবস্থা থাকত। পথিকেরা দূর-দূরান্তের সফরে যেতেও পথে আশ্রয়, খাদ্য এবং পানির অভাব ভোগ করত না। মদীনা শহরটি তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যের রাজধানী হওয়ার কারণে বহু দূর-দূরান্তের দেশসমূহ হতেও সরকারি ও বেসরকারি লোকজনকে মদীনায় আসতে হত। এরূপ ক্ষেত্রে যাতায়াতের রাস্তা এবং রাস্তার স্থানে স্থানে সরাইখানার ব্যবস্থা করা যে খলীফার কত দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল তা বলাই বাহুল্য। এতদ্ভিন্ন এই রাস্তা ঘাটের সুব্যবস্থার ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ মালপত্র ও বাণিজ্যিক পণ্য দ্রব্য পরিবহণেরও যে সুব্যবস্থা হয়েছিল তাতেও সন্দেহ নেই।"[৯০]

কূপ খনন প্রকল্প

মরুভূমির দেশে পানির সমস্যা বড় সমস্যা। আবার পানির অপর নাম জীবন। কোন প্রাণীই পানি ছাড়া বাঁচতে পারেনা। পানি আবার কৃষি কাজের জন্য অতীব জরুরী। পানি ছাড়া কৃষি কাজ অচল। বৃক্ষরোপন কর্মসূচীতেও পানির দরকার বর্তমানে যেমন স্যালো টিউবওয়েল, গভীর নলকূপ ইত্যাদির মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে প্রয়োজনীয় পানির চাহিদা মিটানো হয়। আর এ সকল কিছুই কিন্তু বিজ্ঞানের দান। এক সময় ছিল যখন কূপ খননের মাধ্যমে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হত। কূপের পানি দিয়ে চাষাবাদ করা হত। আরব দেশ মরুভূমির দেশ। সেখানে প্রথমদিকে কূপ খননের মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা হত। হযরত ওসমান (রাঃ) জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে কূপ খনন প্রকল্প গ্রহণ করে মানুষের পানির অভাব পূরণ করেন। এ সম্পর্কে বলা যায়- "মরুভূমির দেশ আরবে পানির ন্যায় জরুরী ও জটিল প্রশ্ন আর নাই। হযারত ওসমান (রাঃ) এ সম্বন্ধেও অমনোযোগী থাকেন নাই। তিনি মদীনায় বসতি স্থাপনের পরই মদীনার মুসলমানদের পানির কষ্ট দূরীকরণের নিমিত্ত ইহুদীদের একটি কূপ ক্রয় করে জনগণের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।[৯১] এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যথেষ্ট দো'আ লাভ করেন। এটা পূর্বেও বলা হয়েছে। খিলাফত লাভের পরেও তিনি সরকারি অর্থে রাজধানী শহরে এবং রাজধানীর বাইরেও নানাস্থানে বহু সংখ্যক কূপ খনন করে দেশবাসীর পানির অসুবিধা দূর করেন।"[৯২]

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কূপ খননের কথা *খেলাফতে রাশেদা* গ্রন্থে এভাবে বলা হয়েছে- "রাজধানীতে যাতায়াতের সব কয়টি পথ অধিকতর সহজগম্য ও আরামদায়ক করে তোলা প্রশাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধান ও জনগনের চলাচল নির্বিঘ্ন করার জন্য একান্তই অপরিহার্য ছিল। হযরত উসমান (রাঃ) ইহার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া তাঁহার উদ্যোগে মদীনা ও নজদের পথে পুলিশ চৌকি স্থাপন করা হয় এবং মিষ্টি পানির জন্য কূপ খনন করা হয়।"[৯৩]

---

৯০. *প্রাগুক্ত*
৯১. *প্রাগুক্ত*
৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৯৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আশারা মোবাশ্‌শারা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে- "খামারের আশে পাশে কূপ খনন করিয়া পানির সুবন্দোবস্ত করেন, বনু হাবীবার অধিকারে একটি বিরাট কূপ ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ) উহা ক্রয় করিয়া খামারের জন্য দান করেন। ইহার পরও পানির অভাব ছিল। আর একটি কূপ খনন করিয়া পানির অভাব তিনি চিরতরে মিটাইয়া দেন।"

অতিথিশালা নির্মাণ

আরবদের চিরাচরিত অভ্যাস হল আতিথেয়তা, এমনকি সে শত্রু হলেও। তাদের আতিথেয়তা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রাসূল (সঃ) মুসলমানদেরও আতিথেয়তার নির্দেশ দিয়েছেন। খুলাফা-ই-রাশেদীনের প্রত্যেক খলীফা এই বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতেন। দূর-দূরান্তের অতিথিদের জন্য হযরত ওসমান (রাঃ) রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা নির্মাণ করেন। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপকতার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল মদীনা, আর বিভিন্ন প্রয়োজনে রাজধানীতে মানুষের ভীড় একটু বেশি থাকে। অনেক দূরের মানুষের যেন কোন রকম কষ্ট না হয় সেজন্য হযরত ওসমান (রাঃ) অতিথিশালার ব্যবস্থা করেন। আর অতিথিশালা নির্মাণ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য- "সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বহু বাসগৃহ, রাস্তা, সেতু, মসজিদ ও অতিথিশালা নির্মিত হয়।"[৯৪]

বাঁধ নির্মাণ

পৃথিবীর শুরু থেকেই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার জন্য যুগে যুগে মানুষ বিভিন্ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তা আবার ধ্বংসও হয়েছে। পৃথিবীকে আবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মানুষ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। রাস্তার প্রয়োজন হলে সেখানে রাস্তা, খাল খননের প্রয়োজন হলে খনন আবার যেখানে বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় সেখানে বাঁধ নির্মাণ করে অনাবাদী এলাকা চাষযোগ্য করে তুলেছে। হযরত ওসমান (রাঃ) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মনে করলেন যে, মদীনাকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে সেখানে কৃষি কাজ করা যাবে এবং শাক-সবজি, ফল-মূল, তরি-তরকারি উৎপন্ন করা যাবে। তাই তিনি মদীনায় 'মাহজুর'[৯৫] নামক বাঁধ নির্মাণ করেন। যা ছিল সকলের নিকট প্রশংসনীয়। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে বহির্বিশ্বের নিকট মদীনার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। তাঁর এই বাঁধ নির্মাণের কথা প্রসঙ্গে বলা যায় "মদীনায় বন্যা প্রতিরোধের জন্য প্রকাণ্ড মাহজুর বাঁধ নির্মিত হয়। মদীনায় অবস্থিত বনাতনা'ইলাহ্ নামক খাল হইতে আরসায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া তিনি উক্ত স্থানকে চাষোপযোগী করিয়াছিলেন।"[৯৬]

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বলেন- "খায়বরের দিক হইতে কখনো কখনো বন্যার পানি আসিয়া মদীনাকে প্লাবিত ও নিমজ্জিত করিয়া দিত। ইহার ফলে শহরবাসীরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। এমনকি মসজিদে নববীরও উহার দরুণ ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছিল। এই কারণে হযরত ওসমান (রাঃ) মদীনার অদূরে একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সাধারণ জনকল্যাণের দৃষ্টিতে হযরত ওসমান (রাঃ) নির্মিত এই 'মাহজুর' বাঁধ তাঁহার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।"[৯৭]

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনকল্যাণমূলক এই অবদান সম্পর্কে মাওলানা নূরুর রহমান বলেন- "বহুকাল যাবৎ মদীনাবাসীরা একটি অসুবিধা ভোগ করে আসছিল যে, খায়বরের দিক হতে দোয়াব প্রণালী বেয়ে মাঝে মাঝে বন্যার স্রোত মদীনায় এসে পড়ত এবং মাঠের শস্য নষ্ট করে ফেলত। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেরা সাধারণতঃ এ সমস্ত নিম্নাঞ্চলে গম, ফুট, তরমুজ ও শাক-সবজির চাষ করিত। এই নিম্নাঞ্চলগুলি নদীর শুষ্ক তলার ন্যায় দীর্ঘ এবং সরু, এর দুই পার্শ্বে পানির স্রোত বহিত এবং সেই প্লাবন

---

৯৪. বিস্তারিত দ্র. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৯৫. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১

৯৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘস্থায়ী না হলেও শস্যের বিশেষ ক্ষতি করত। হযরত ওসমান (রাঃ) এই দুরবস্থা হতে চারীদিগকে রক্ষা করার জন্য মদীনা হতে কিঞ্চিত দূরে একটি বাঁধ ছেড়ে প্রয়োজনের সময় আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি আনা যেত।"[৯৮]

মোটকথা মানুষের সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে হযরত ওসমান (রাঃ) এই মাহ্জুর বাঁধ নির্মাণ করেন। যার জন্য তিনি সর্বমহলে সমাদৃত হন।

চারণভূমি রক্ষণাবেক্ষণ

চারণভূমিতে সাধারণত চতুষ্পদ জন্তু বিচরণ করে বেড়ায়। আরবে এরকম চারণভূমির প্রয়োজন দেখা দেয়ায় হযরত ওসমান (রাঃ) এই চারণভূমির ব্যবস্থা করেন। আমাদের দেশে পাবনা ও সিরাজগঞ্জে গোচারণের জন্য চারণভূমি আছে। আরার সাভারে স্থাপন করা হয়েছে খামার। চারণভূমির গুরুত্ব অত্যধিক, কারণ এখানে গৃহপালিত জন্তু অবাধ বিচরণ করতে পারে। গৃহপালিত জন্তু আমাদের বিভিন্ন উপকার করে থাকে। তৎকালীণ সময়ে সাধারণত ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য উট ও ঘোড়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, কারণ এদেরকে যুদ্ধে ব্যবহার করা হত। আর এসকল জন্তুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারণভূমির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এজন্য ওসমান (রাঃ) প্রয়োজনীয় জীবজন্তু রক্ষার জন্য চারণভূমি রক্ষণের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে *আশরা মোবশ্শারা* গ্রন্থে বলা হয়েছে- "হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত আমলে ঘোড়া এবং উহার উষ্ট্র পালন এবং উহার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র শাসনাধীন অঞ্চলে বিশাল চারণভূমি গড়িয়া তোলা হয়। রাজধানীর আশেপাশেও অসংখ্য চারণভূমি তৈয়ার করা হয় এবং চারণ ভূমির নিকটেই পানির ব্যবস্থা করা হয়।"[৯৯]

জনকল্যাণের জন্য হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চারণভূমি সংরক্ষণের উপর আলোকপাত করলে দেখা যায়, "হযরত ওসমান (রাঃ) সামরিক প্রয়োজনে উট ও ঘোড়া পালন এবং সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিশাল চারণভূমি গড়ে তুলেছিলেন। রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও অসংখ্য চারণভূমি সংরক্ষণ করা হয়েছিল।"[১০০]

হযরত ওসমান (রাঃ) গ্রন্থে বলা হয়েছে[১০১]- "মরুভূমির দেশে মানুষের খাদ্য এবং পানীয়ের সমস্যার চেয়ে গৃহপালিত পশুগুলির খাদ্য এবং পানীয়ের সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দুম্বা, ছাগল, মেষ ও উটসমূহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে চারণভূমি আবশ্যক। হযরত ওসমান (রাঃ) পশুগুলির এই প্রয়োজন মিটানোর জন্য বাক্কী নামক ময়দানে সংরক্ষিত চারণভূমির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এই যে, হযরত ওসমানের এই জনকল্যাণকর কার্যটিও বিদ্রোহীদের অভিযোগের কারণ হইয়াছিল। চারণভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া মাত্রই কতকলোক খলীফার দুর্ণাম করিতে লাগিল যে, তিনি নিজের বিরাট পশু পালনের জন্যই সর্বসাধারণের অধিকার খর্ব করিয়া এই সমস্ত চারণভূমি সংরক্ষিত করিতেছেন। খলীফা উহার উত্তরে বলিলেন, তাঁহার নিজের প্রয়োজনে তিনি একাজ করিতেছেননা, বায়তুলমালের এবং সদ্কা তহবিলের উটগুলি যাহাতে খাদ্যের অভাবে মরিয়া না যায়, সেই জন্যই তিনি এই চারণভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।"

চারণভূমি রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জনকল্যাণের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, গৃহপালিত জন্তু মানুষের বিভিন্নমুখী উপকার সাধন করে, তাই তিনি তাঁর রাজ্যে চারণভূমির রক্ষণ ব্যবস্থা করেন।

---

৯৮. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৯৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, পৃ. ১৫৬
১০০. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১, ৭২; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০
১০১. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থদের জন্য সাহায্য

প্রত্যেক যুগেই সমাজে কিছুনা কিছু দুঃস্থ দরিদ্র লোক থাকে। কোন রাষ্ট্রে বেশি আবার অন্য কোথায়ও কম, বর্তমান পৃথিবীর স্বাধীন দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

১. উন্নত দেশসমূহ;

২. উন্নয়নশীল দেশসমূহ;

৩. অনুন্নত দেশসমূহ।

অনুন্নত দেশসমূহে দরিদ্রতার হার প্রবল, যেখানে মানুষের জীবনযাত্রার মান অতি নগণ্য। যেখানে মানুষের মাঝে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি, অভূক্ত, বস্ত্রহীন ও তৃষ্ণার্তের জন্য মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। প্রয়োজনীয় ও পরিমিত আহারের অভাব লেগেই থাকে। অথচ এই অবস্থায় শাসক শ্রেণীর দায়িত্ব হল মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটানো। এ সম্পর্কে মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন- "সকল মানুষের প্রতি সকল মানুষের যে হক আছে, তাই সকল মানুষের প্রতি সকল মানুষের কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য ইসলামের বিশেষ তাকীদ রয়েছে। তোমার হক অন্যান্য মানুষের প্রতি রয়েছে, একথা তুমি ভুলে যেওনা। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মানুষের প্রতি তোমার যে কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন কর।"[১০২]

ইসলাম ধর্মে মানুষের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে বার বার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার অন্যদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। আল্লাহ্পাক বলেন[১০৩]- "তোমরা অবৈধভাবে কারও সম্পদ ভক্ষণ করোনা" আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন[১০৪]- "তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্যে গরিব, বঞ্চিত প্রার্থীদেরও হক আছে"

পবিত্র কুরআনের এ সকল আয়াত ও রাসূল (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার যে, ইসলামে মানবকল্যাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এজন্য মনে হয় হযরত ওসমান (রাঃ) দুঃস্থদের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। তিনি খিলাফত লাভের আগে ও পরে বিভিন্নভাবে মানবতার জন্য সেবা করেছেন। যেমন আমরা লক্ষ্য করি–"হযরত ওসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পূর্বে দুঃস্থ মুসলমানদের দুঃখ মোচন এবং শিশু মুসলিম রাষ্ট্রের বিপদ মুক্তির জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছেন একথা যেমন ইতিহাস প্রসিদ্ধ; তেমনি খলীফা হওয়ার পরও তাঁর সেই দানের হাত কখনও সংকোচিত হয়নি। তাঁর খিলাফতকালে মদীনায় একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তখন মদীনাবাসীরা যাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের যথাসর্বস্ব দান করে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নবীজির নিকট হতে তিনি এই শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, একমাত্র আল্লাহই মানুষের ধনদৌলত এবং রিজিকের মালিক। নবীজির সেই মহান শিক্ষা হযরত ওসমানের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিল।"[১০৫]

কুরআন সংকলন

আল কুরআন মুসলমানদের জন্য সংবিধান। কুরআনে মানব জীবনের সকল দিক আলোচনা করা হয়েছে। মানুষের সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত এ মহাগ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ মহাগ্রন্থখানা হযরত আবু বকরের সময় সংকলন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে কুরআন পাঠ করে থাকি এই কুরআন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর সময় সংকলন করা হয়েছে। ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমানের সময় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিধি অনেক বেড়ে যায়, নতুন নতুন এলাকার মুসলমানদের মধ্যে এই কুরআন পাঠ করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়, বিশেষ করে আবু হুযায়ফা (রাঃ) যখন আর্মেনিয়া ও আজারবাইযান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তখন এই সমস্যা প্রকট আকারে লক্ষ্য করেন, তখন তিনি মদীনায় ফিরে এসে এ

---

১০২. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল্লাহ্র হক বান্দার হক* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৮৮), পৃ. ১২০

১০৩. সূরা নিসা, আয়াত : ২৯

১০৪. সূরা যারিয়াত, আয়াত : ১৯

১০৫. মাওলানা নুরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বলেন। হযরত ওসমান (রাঃ) তখন হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট রক্ষিত পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করে কয়েকটি প্রতিলিপি তৈরী করেন, আর এ বিষয়ে যাতে কোন মতবিরোধ না থাকে সেজন্য বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন কপিগুলিকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। এজন্য তাঁকে 'কুরআন সংকলনকারী' বলা হয়। তারপর অসংখ্য কপি প্রতিলিপি করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যে ধারা এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। *ফাদাইলুল কুরআন* গ্রন্থে বলা হয়েছে–"হযরত উসমান (রাঃ) কুরআন পঠনে যাতে পার্থক্য দেখা না দেয় সেজন্য লোকজনকে একই কিরআতে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।"

আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) ইতকান গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে–"সাধারণভাবে এটা প্রসিদ্ধ যে, হযরত ওসমান কুরআন সংগ্রহকারী ছিলেন, আসলে তিনি তা ছিলেন না।"[১০৬]

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর কুরআন সংকলনের বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তিনি কুরআন পঠন-পাঠনে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে এ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যা কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের জন্যই নয় বরং তা সার্বজনীন।

খিলাফাতে রাশেদা গ্রন্থে বলা হয়েছে[১০৭]–"বস্তুত হযরত উসমান (রাঃ) যদি এই পদক্ষেপ গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে তাওরাত, ইন্‌জীল ও অন্যান্য আসমানী গ্রন্থের ব্যাপারে উহাদের প্রতি বিশ্বাসী লোকেরা যে মারাত্মক ধরনের মতভেদ ও বৈষম্যে নিমজ্জিত হইয়াছে, শেষ নবীর উম্মতরাও অনুরূপ বিভেদ ও বৈষম্যে পড়িয়া যাইত এবং কুরআন মজীদেরও অনুরূপ দুর্দশা ঘটিত, ইহাতে একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নাই। তাই ইসলামের ইতিহাসে হযরত উসমান (রাঃ)-এর এই মহান কীর্তি চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।"

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত ওসমান (রাঃ) বিজেতা, শাসক, জনদরদী ও জনসেবক হিসেবে শ্রেষ্ঠত্য অর্জন করেছিলেন। নিজের জীবন উৎসর্গ করেও ইসলামের সংহতিকে অক্ষুন্ন রাখা ও জনকল্যাণ বিধান ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। তিনি ছিলেন খাটি দেশ প্রেমিক ও শান্তিকামী মানুষ। তিনি প্রয়োজনবোধে কখনও কঠোর হননি। তাঁর এই সরলতার সুযোগে তাঁর শাসনামলের শেষের দিকে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয়। এতকিছুর পরও ইসলাম তথা জনকল্যাণের জন্য তাঁর অবদান চির অম্লান।

---

১০৬. শাহ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১০৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম , *আল্লাহ হক বান্দার হক*, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী (রাঃ)

ইসলামী খিলাফতের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)[১০৮]। তিনি হযরত ওসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের পর ৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন। তিনি নবীজির চাচাতো ভাই। তাঁর পিতার নাম আবু তালিব। দশ বছর বয়সের সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তিনি ইসলমের সেবায় নিয়োজিত। তিনি যখন খিলাফত লাভ করেন তখন ইসলামী রাষ্ট্রের চারিদিকে বিদ্রোহের ডামাডোল বেজে উঠেছে। তার প্রধান কারণ ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)-এর হত্যা, প্রথমে এই অবস্থায় হযরত আলী (রাঃ) খিলাফতের দায়িত্ব নিতে রাজী হননি, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অরাজকতা এবং বিখ্যাত ব্যক্তিদের অনুরোধে খলীফার পদ গ্রহণ করেন। খুলাফা-ই-রাশেদীনের অন্য তিন খলীফার মত জনকল্যাণমূলক কাজ হযরত আলী করতে পারেননি[১০৯]। কারণ তিনি এক অরাজকতাপূর্ণ সময়ে খলীফার পদে বসেন এবং ইসলামী রাষ্ট্রকে গুছিয়ে আনার আগেই তাকে হত্যা করা হয়। এত কিছুর পরও ইসলামের জন্য তাঁর খেদমত অনস্বীকার্য। ইসলামে জনস্বার্থে তাঁর অবদান সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করতে চাই।

রাজস্ব বিভাগ

রাজস্ব বিভাগের কাজ হল যাকাত, উশরসহ অন্যান্য প্রাপ্য রাজস্ব আদায় এবং বায়তুলমাল পরিচালন ও সংরক্ষণ। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) অন্যান্য খলীফার ন্যায় যথারীতি রাজস্ব বিভাগ জনস্বার্থে চালু রাখেন। রাজস্ব আয় হল সরকারি আয়, সরকার যে সকল খাত থেকে রাষ্ট্রীয় আয় করে তা রাজস্ব আয়ের অন্তর্গত। জনগণের ব্যাপারে হযরত আলী অত্যন্ত উদার ছিলেন। রাজস্ব প্রদানের ব্যাপারে তিনি কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। তাঁর নীতি ছিল যারা ভূমি থেকে উপকার লাভ করে ফসল উৎপাদনের পর লাভের একটি অংশ সরকারকে প্রদান কররে। তার কারণ হল ইসলামী খিলাফত তাদের ও ফসল রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভিন্ন কর্মচারী নিয়োগ করেছে। তাদের বেতন ভাতা প্রদানের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তবে একথাও ঠিক যে, রাজস্ব আদায়ে যেন কোন রকম অন্যায় ও অত্যাচার না হয় সেদিকে হযরত আলী সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে যেন হযরত আলী রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের রাজস্ব আদায়ের পূর্বে কঠোরভাবে সতর্ক করতেন যেন তারা কোন রকম অনাচার, অত্যাচার বা অতিরিক্ত কর আরোপ না করে। তিনি নির্দেশ দিলেন– "কর প্রদানকারীকে কোন দৈহিক বা মানসিক কষ্ট প্রদান করবে না, কারও কর বাকী পড়ে থাকলে যদি সে তা আদায় করতে অক্ষম হয়, তবে তার ঘরের আসবাবপত্র বা গ্রীষ্ম ও শীতের বস্ত্র বিক্রয় করে কর আদায় করবে না। গ্রামাঞ্চলে যে ফলবান বৃক্ষ আছে সেগুলির উপর কোন কর ধার্য কর না। ফলবান না হইলেও ঐ সমস্ত গাছ পথিক ও মুসাফিরদের বিশ্রাম গ্রহণের জন্য রেখে দেবে।"[১১০]

বনসম্পদের উপর কর আরোপ হযরত আলীর এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিই প্রথম এই কর ধার্য করেন। তার এই করারোপ ছিল অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কারণ এখানে অর্থ আয়ের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইতোপূর্বে

---

১০৮. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫

১০৯. মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী (রাঃ)* (ঢাকা : এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ডিসেম্বর, ২০০৪), সংস্করণ-২, পৃ. ১৯২

১১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

কোন খলীফা এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেননি। আর হযরত আলী (রাঃ) এইখাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বায়তুল মালের ভাণ্ডারকে আরও মজবুত করেন।

পুলিশ বিভাগ প্রবর্তন

পুলিশের কাজ সমাজে শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা। তৎকালীন সময়ে পুলিশের কাজ ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা, নিরাপত্তা রক্ষা ও অপরাধীকে গ্রেফতার করে বিচারের অধীনে দাঁড় করানো। হযরত আলীর আগে পুলিশ বিভাগ বলতে কিছু ছিলনা, তবে হযরত ওমরের খিলাফতকালে রাত্রিকালে শহরে পাহারাদার নিযুক্ত করা হত। এক্ষেত্রে হযরত আলীই প্রথম পুলিশ বাহিনী গঠন করেন। বর্তমান সময়ে যেমন এস.আই, এস.পি ইত্যাদি পদ বিন্যাস করা হয় তখনও এরকম ছিল। পুলিশ বিভাগের যিনি প্রধান তাকে বলা হত 'সাহেবুশ শুরতাহ'[১১১]।

পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব গ্রাম, শহর তথা রাজ্যময় শান্তি-শৃংখলা, অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ইত্যাদি অসামাজিক কাজ-কর্ম প্রতিরোধ। আর এসকল কাজ-কর্ম অবশ্যই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। এজন্য হযরত আলী (রাঃ) জনগণের কল্যাণ ও সেবাদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত পুলিশ বিভাগ গঠন করেন।

বায়তুল মাল হতে সাহায্য

বায়তুল মাল হল সরকারি কোষাগার বা অর্থ ভাণ্ডার, বর্তমান যেমন অর্থ মন্ত্রণালয়। হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে বায়তুল মালের আয়ের উৎস ছিল অনেক বড় কিন্তু সেই তুলনায় হযরত আলী (রাঃ)-এর সময় তা অনেক ছোট হয়ে যায়। কারণ কিছু এলাকা তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। তবুও যা তাঁর অধীনে ছিল তাই দিয়ে তিনি মানুষের খেদমত করেছেন। বায়তুল মালের অধিকারী যারা তিনি কেবল তাদেরকেই তা দিয়েছেন। তিনি সাধারণ মানুষের অধিকার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সাধারণের জন্য নির্ধারিত অংশ তাদের প্রদান করে নিজের অংশ নিতেন। হযরত আলী মনে করতেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে সকলের সমান অধিকার কেউ খাবে কেউ খাবেনা তা হবে না। এজন্য তিনি বায়তুল মালের সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করতেন। যা ছিল তাঁর মানবসেবার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। অবশ্য তাঁর এই বণ্টননীতি অনেকে সমর্থন দেননি। আর এজন্য তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন–

"তোমরা কি এটাই চাও যে, আল্লাহ্ তায়ালা যাদের উপর আমাকে রক্ষক নিযুক্ত করেছেন, আমি তাদের প্রতি অন্যায় ও অবিচার করি এবং তোমাদিগকে অধিক দান করে তোমাদের সাহায্য কামনা করি? আল্লাহ্ পাকের কসম! আমার দ্বারা এরূপ কখনও হবে না।"[১১২]

হযরত আলীর একথা এবং কসম খাওয়া দ্বারা তার উদার মন ও জনকল্যাণের পরিচয় পাওয়া যায়।

জনসাধারণের জন্য সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা

খুলাফা-ই-রাশেদার প্রত্যেক খলীফা সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। আর এ লক্ষ্যে তারা বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) তাদের ব্যতিক্রম নন। তিনি মনে করেন যে, খিলাফত তাঁর নিকট একটা আমানত আর সকল নাগরিকের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। সাধারণত রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিকট থেকে সহযোগিতা বা সম্মান পেতে হলে তাদের সার্বজনীন সেবা করা দরকার, কারণ মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ অন্তর থেকেই আসে। এ ব্যাপারে জোর করে কোনো কিছু আদায় করা যায় না। আর এজন্য হযরত আলী (রাঃ) প্রজাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের কল্যাণের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। প্রত্যেকের অভাব অভিযোগের প্রতি খেয়াল রেখে তার

---

১১১. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০
১১২. মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী (রাঃ)*, পৃ. ২০২

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান দিতেন। তবে তাঁর শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই তাঁকে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যার ফলে তিনি অন্য খলীফাদের মত জনকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তাঁর ইচ্ছানুযায়ী করতে সক্ষম হননি। এত যুদ্ধ বিগ্রহ, অরাজকতার মধ্যেও যে তিনি সর্বসাধারণের সুখ-শান্তি বিধানের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ইতিহাসে তার মূল্য কম নয়। তিনি জনগণের কথা চিন্তা করে মুয়াবিয়ার সাথে সন্ধি পর্যন্ত করেন। অথচ ইচ্ছা করলে তিনি দমন নীতি প্রয়োগ করতে পারতেন।[১১৩]

শিশুদের জন্য ভাতা প্রদান

মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নতি করার জন্য প্রত্যেক সরকারই কিছুনা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ঠিক তেমনিভাবে হযরত আলী (রাঃ) যে সকল জনহিতকর কাজকর্ম করেছেন তার মধ্যে একটি হল দুগ্ধপৌষ্য শিশুর জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা। যদিও বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের দরুণ তাঁর বায়তুল মালের আয় সীমিত হয়ে পড়ে তারপরও তিনি সর্বসাধারণের জন্য ভাতা প্রদান করেন বায়তুল মাল থেকে। যদিও তা পরিমাণে কম ছিল। আমাদের দেশে বর্তমানে নাগরিকদের জন্য বিভিন্নমুখী ভাতা প্রদান করা হয় যেমন বেকারত্ব, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি, যদিও তার পরিমাণ কম কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুটা হলেও তা তাদের জন্য উপকারী। ঠিক তেমনি হযরত আলী কম হোক বেশী হোক জনকল্যাণে তিনি এই ভাতা প্রদান করেন। তিনি দুগ্ধপৌষ্য শিশুর জন্য ভাতা নির্ধারিত করে দেন। যা তাঁর বেঁচে থাকার জন্য এক নিশ্চয়তা। তাঁর এ কর্মসূচী সম্পর্কে উম্মে আলা বলেন,[১১৪] "আমার একান্ত শৈশবকালে আমার পিতা আমাকে কোলে করে হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলে তিনি আমার জন্য ভাতা নির্ধারিত করে দিয়ে বললেন, গোশত এবং রুটিভোজি মানুষ যেরূপ ভাতা পেতে পারে, দুগ্ধপৌষ্য শিশুও তদ্রূপ ভাতা পাওয়ার অধিকারী[১১৫]।

আবু ওবায়দা বলেন, এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আমর একটি সন্তান জন্মিলে আমি তাকে কোলে করে হযরত আলীর নিকট গেলাম। তিনি আমার সন্তানের জন্য একশত দিরহাম ভাতা নির্দিষ্ট করে দিলেন।"[১১৬]

সর্বসাধারণের জন্য কুরআন শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষাই জাতীর মেরুদণ্ড। ইসলাম ধর্মে শিক্ষার জন্য অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) এজন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। বিশেষ করে কুরআন শিক্ষা প্রকল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কুরআন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন মসজিদে কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আর এজন্য তিনি বিভিন্ন উপায়ও অবলম্বন করেন। মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি বলতেন কেউ যদি কুরআন শিক্ষা করে, তবে তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে। যেমন বর্ণিত আছে- "দুই হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী কুরআন শিক্ষার জন্য বৃত্তি পেত। ইহা ছাড়া তিনি নিজেও মানুষকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতেন।"[১১৭]

আমাদের দেশে যেমন শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীসহ বিভিন্নমূখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় হযরত আলী (রাঃ) কুরআন শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৃত্তি প্রদান করেন।

ফকির মিসকীনের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা

একটি সমাজে ধনী-দরিদ্র, ফকির-মিসকীনসহ সকল শ্রেণীর মানুষ বাস করে। এক্ষেত্রে ধনীর দায়িত্ব হল গরিব, দুঃখী তথা অভাবীর অভাব পুরণ করা, তা সাময়িক হোক বা চিরস্থায়ী হোক। আল্লাহপাক মানুষ

---

১১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫
১১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪
১১৫. *প্রাগুক্ত*
১১৬. *প্রাগুক্ত*
১১৭. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে। গরিব বা অভাবী বলে কাউকে অবহেলা করা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) দরিদ্রদের সাহায্য প্রদানে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ফকির মিসকীনদেরকে খানা খেতে দিতেন। আবার অভাবগ্রস্থ, অবহেলিত, দারিদ্র্যপীড়িত, অসহায় ইত্যাদি এসকল মানুষকে খুঁজে তাদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হতে মুক্ত করে দিতেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর রাজ্যে সকল ধরনের ফকির-মিসকীন তথা অসহায়দের জন্য খাদ্যবস্ত্রের ব্যবস্থা করেন যা তার মানবসেবার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

হযরত আলী (রাঃ) তাঁর গভর্নরদেরকেও দরিদ্র, অসহায়দের সাহায্য সহানুভূতির জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। যেমন–*ইসলামের সোনালী যুগ* গ্রন্থে বলা হয়েছে- "আলী (রাঃ) একজন গভর্ণরকে লিখেন, দরিদ্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণী হচ্ছে পঙ্গু ও ছিন্নমূল গোষ্ঠী। তারা অন্যান্য মানুষের নিকট থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার যোগ্য।"[১১৮]

আরবী ভাষা সাহিত্যে বিশেষ অবদান

হযরত আলী একজন পণ্ডিত লেখক ও কবি ছিলেন। তাঁর *নাহজুল বালাগা* ও *দীওয়ানে আলী*[১১৯] আজও আরবী সাহিত্যে গৌরবের বস্তু। হযরত আলীর জন্যই আরবী সাহিত্যের মান-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। হযরত আলী আরবী ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবদান ও তার গুণগতমান কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সময়ের ব্যবধানে তা হয়ে ওঠে সার্বজনীন। হযরত আলীর তত্ত্বাবধানে আরবী ব্যকরণ সংকলিত হয়। যার জন্য আরবী ভাষার মান বেড়ে যায়। বর্তমানে জাতিসংঘের অফিসিয়াল যে ভাষাগুলি আছে তার মধ্যে আরবী একটা। হযরত আলী একজন জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। তাঁর অবদান সম্পর্কে বলা হয়েছে "হযরত আলী (রাঃ) অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি কবি, সাহিত্যিক, ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর লিখিত *দীওয়ানে আলী* আজও আরবী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর বক্তৃতা ও অভিভাষণ আরবী ভাষা সাহিত্যে গৌরবের বস্তু। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ দোওয়াইলী সর্বপ্রথম আরবী ব্যকরণ সংকলন করেন। ধর্মীয় জটিল ব্যাপারে আলীর সিদ্ধান্তকেই হযরত ওমর (রাঃ) চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতেন।"[১২০]

পরিশেষে বলা যায় যে, হযরত আলী (রাঃ) তার রাজ্যের সকল অশান্তি, বিশৃংখলা দূর করে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন এবং তার ছয় বছরের শাসনামলে কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ-কর্ম করেছিলেন, যা আজও সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হয়ে আছে। অন্যদিকে উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফীন যুদ্ধ তাঁর শাসনামলের দুটি হৃদয় বিদারক ঘটনা। শেষ পর্যন্ত ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাকে কুচক্রীদের চক্রান্তে শাহাদৎ বরণ করতে হয়।[১২১]

---

১১৮. এ কে এম নাজির আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

১১৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬১; শাহ মুহাম্মদ আবদুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১২০. মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী* (রাঃ), পৃ. ১২৫; মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৭

১২১. মাওলানা নূরুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম শাসন আমলে মানবকল্যাণ কার্যক্রম

খুলাফা-ই-রাশেদার চারজন খলীফা ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তাঁরা মুহাম্মদ (সঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা নাগরিকদের কল্যাণের জন্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। মুসলিম জাহানের খলীফা হয়েও কেউ কেউ রাতের অন্ধকারে প্রজাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের বাস্তব অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যেক্ষ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তাদের এই জনসেবা ও জনকল্যাণমূলক শাসনের দৃষ্টান্ত বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। তবে তাদের পরবর্তী সময় থেকে অন্যান্য মুসলিম আমলেও মানবকল্যাণের জন্য মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ীও সেবা, খেদমত করা হয়েছে। নিম্নে আমরা সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই :

রেজিস্ট্রি দফতর গঠন

এটি একটি প্রশাসনিক দফতর যা আমীর মুয়াবিয়ার সময় চালু করা হয়। আর এই বিভাগটি জনগণের স্বার্থের কথা লক্ষ্য করেই প্রবর্তন করা হয়। এই দফতর চালু করার পর কেন্দ্র থেকে সরকারি আদেশ, নিষেধ, নীতিমালা, আইন-কানুন ইত্যাদি জালিয়াতির হাত থেকে রক্ষা পায়। সরকার সব সময় জনগণের মঙ্গল কামনা করে, আর জনগণ সরকারি আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ মেনে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক কাজ কর্ম করে। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে যেমন ভূমি রেজিষ্ট্রিসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড রেজিস্ট্রি করে থাকি, ঠিক এই বিভাগের প্রবর্তন আমীর মুয়াবিয়া করেন। যা ছিল সার্বজনীন ও কল্যাণজনক কর্মসূচী।[১২২]

ডাক বিভাগের উদ্ভাবন

পৃথিবীর আদি থেকেই মানুষ মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখতো, আর এজন্য তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতো, যাকে বর্তমান সময়ের ডাক বিভাগের অন্তর্গত মনে করা যায়। ডাক বিভাগের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ যোগাযোগ রক্ষা করা যায়। আর এটা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন একটি যোগাযোগ মাধ্যম যা সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ব্যবহার করে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে আমীর মুয়াবিয়া এই ডাক বিভাগের প্রবর্তন করেন।[১২৩] যার সুফল আজও মানুষ ভোগ করছে। তাঁর সময়ে ডাক পরিবহনের জন্য ঘোড়া ও উট ব্যবহার করা হত। তবে বর্তমানে তার সংস্কার করে যানবাহনসহ উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, বর্তমান সময়ে ইজিপোস্ট, জি.ই.পি, রেজিস্ট্রিসহ দ্রুততম কুরিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থা আছে। যা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করে যাচ্ছে আর এ ব্যবস্থার উদ্ভাবক মুসলিম শাসক আমীর মুয়াবিয়া।

গীর্জা নির্মাণ

শাসক হিসেব মুয়াবিয়া (রাঃ) অত্যন্ত উদার ছিলেন। অত্যাচারীদের কঠোর হস্তে দমন করেন আবার দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের প্রতি ছিলেন উদার ও সুবিবেচক। তাঁর শাসনামলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ পাশাপাশি বাস করত। তাঁর সময়ে যে সকল বিধর্মী ধর্মান্ধতায় বিশ্বাস করতো তাদের প্রতিও তিনি ছিলেন উদার। তাঁর প্রজাসুলভ শাসনে জনগণ সুখ-শান্তিতে বাস করত। তিনি গণতান্ত্রিক

---

১২২. Philip K. Hitti, *History of Syria* (London : 1951), P. 25; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩২, ৩৩৩

১২৩. Philip K. Hitti, *History of Syria*, P. 27; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৩

Dhaka University Institutional Repository

শাসক ছিলেন। রাজ্যের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। বিধর্মী, অনাথ, অসহায়, গরিবদেরও তিনি সাহায্য-সহানুভূতি দান করেছেন। তিনি বিধর্মীদের ধর্মীয় কাজেও স্বাধীনতা দিয়েছেন এমনকি তাদের গীর্জা পর্যন্ত নির্মাণ করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে- "মাবিয়া ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এডেসার গীর্জা পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।"[১২৪]

খাল খনন ও কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি

একটি রাজ্যের সকল এলাকাই সমতল হয়না। পাহাড়, পর্বত, উঁচু-নিচু, উর্বর ও অনুর্বর ইত্যাদি বিভিন্ন রকম এলাকা থাকে। আবার দেশ যদি কৃষি নির্ভর হয় তাহলে দেশের মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়নকল্পে কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা জরুরী। আর এজন্য অনুর্বর অঞ্চলে চাষাবাদের ব্যবস্থা করার জন্য সেচ ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। আমরা ইসলামের ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময় কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতির মাধ্যমে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মান অনেক উন্নতি লাভ করে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষ বাড়তে থাকে এবং অভাব, দরিদ্রতা, ছিন্নমূল, ভবঘুরে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়।

এই অবস্থার উন্নতির জন্য উমাইয়া শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁর রাজ্যময় খাল-খনন করে অনুন্নত কৃষি জমিতে সেচের মাধ্যমে সোনালী ফসল উৎপন্ন করার ব্যবস্থা করেন, যা দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটায়। তাঁর এই কর্মসূচী ছিল দেশ থেকে দরিদ্রতা, অভাব, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি দূর করে সবার জন্য নিরাপদ জীবনের ব্যবস্থা। খুলাফা-ই-রাশেদীনের পরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাধারণ মানুষের সেবাদানের জন্য খাল খনন কর্মসূচী ইসলামের ইতিহাসে সত্যিই তাঁর জনসেবার পরিচয় বহন করে।[১২৫]

প্রথম ওয়ালিদের জনহিতকর কর্মসমূহ

উমাইয়া শাসক প্রথম ওয়ালিদ[১২৬] বিভিন্নমূখী জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যার ফলে মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হয়। অনাথ, দরিদ্র, দুঃস্থদের জন্য তিনি বিভিন্ন মক্তব-মাদরাসা ও এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিকের ব্যবস্থা করেন এবং সমাজের অবহেলিত, অসহায়দের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দান করেন। এছাড়া অক্ষম, অসহায়, বৃদ্ধ ও অন্ধদের জন্য বিভিন্ন সাহায্য-সহানুভূতির ব্যবস্থা করেন। অন্ধ, অচল, পাগল, মানসিক বিকারগ্রস্থ ইত্যাদি দুঃস্থ মানবের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। এসকল জনকল্যাণকর কাজকর্ম ছাড়াও তিনি তাঁর রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। তাঁর এই জনকল্যাণকর কাজের উপর আলোচনা করতে গেলে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, "ওয়ালিদ একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। জনহিতকর কার্যের জন্য তাঁর রাজত্বকাল প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং বৃদ্ধ, অন্ধ ও খঞ্জদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। অন্ধ, অচল ও উন্মাদের জন্য তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র রাস্তা নির্মাণ করিয়ে রাস্তার পার্শ্বে সুবিধাজনক স্থানে কূপ খনন করান।"[১২৭]

যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের সন্তানদের জন্য পেনশন-ব্যবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আল্লাহ্ তায়ালা মরু আরবের বুকে প্রেরণ করেন ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে শান্তি ও মুক্তি দেয়ার জন্য। কারণ ঐ সময় বিশ্বের মানুষের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল।

---

১২৪. Philip K. Hitti, *History of Syria*, P. 29

১২৫. Dr. Zaki Ali, *Islam in the World* (Lahore : 1947), P. 178

১২৬. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৭০, ২৭১

১২৭. অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩

Dhaka University Institutional Repository

এক কথায় সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করেছিল এক তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতি। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ইসলামী আইন-কানুন অনুযায়ী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে খুলাফা-ই-রাশেদা ও উমাইয়া শাসকগণ ইসলামের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। এই সকল যুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর যোদ্ধারা অংশ নেন কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক অভাবী, অসহায় যোদ্ধাও থাকতো। এই শ্রেণীর যোদ্ধাদের মধ্যে যারা যুদ্ধে শহীদ হত তাদের জন্য উমাইয়া শাসক দ্বিতীয় ওমর 'পেনশন' ব্যবস্থা চালু করেন।[১২৮] যা একটি মানবিক আবেদন ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী।

নহর-ই যুবাইদা

আব্বাসীয় খলীফা হারুন-অর-রশিদ তাঁর স্ত্রী যুবায়দাকে নিয়ে ৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় হজ্ব পালনের জন্য যান। আর এই হজ্ব তাঁর জন্য আজও স্মৃতি বহন করে। হজ্ব পালনের জন্য তাঁর স্ত্রী যুবায়দা মক্কা এসে জনগণের অপরিসীম পানির কষ্ট দেখে ব্যথিত হন।[১২৯] তিনি তাদের পানির এই কষ্ট দূর করার জন্য এক লক্ষ দিনার খরচ করে নহর-ই-যুবাইদা নামে একটি খাল খননের ব্যবস্থা করেন। যার ফলে হজ্বের প্রধান স্থানসমূহ মক্কা, মিনা ও আরাফাত ময়দানে পানি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এই খাল ইসলামের ইতিহাসে নহর-ই যুবাইদা নামে প্রসিদ্ধ। যা আজও মানবকল্যাণের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কাগজের কল প্রতিষ্ঠা

আব্বাসীয় শাসক খলীফা হারুন-অর-রশিদ রাজ্যময় শিল্প কল-কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সময় বিখ্যাত বিখ্যাত বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও নতুন নতুন গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করা হয়, আর এর জন্য কাগজের প্রয়োজন পড়ে। তিনি মনে করলেন কাগজ কল স্থাপন করলে বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে, আবার কাগজের চাহিদাও পূরণ হবে। এলক্ষ্যে তিনি ৭৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদে একটি Paper Mill প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে সমাজের কিছু লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।[১৩০] তাঁর এ কর্মসূচীকে আমরা জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে চাই।

ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতি

আব্বাসীয় শাসনামলে রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীর বহু উন্নতি সাধিত হয়। আল মামুন[১৩১] ও মুতাসিমের[১৩২] আমলে চিকিৎসার উন্নতিকল্পে ভেষজ বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি জীব, তাকে সেবা করলে বস্তুত আল্লাহ্‌র সেবা করা হয়। রোগীর সেবা তার চিকিৎসা ও খোঁজ খবর নেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে এক মহান দায়িত্ব। বর্তমান পৃথিবীতে উন্নয়নের জোয়ার বয়ে চলেছে অথচ এখনও নির্জনে নিভৃতে নিরন্ন হাহাকার পঙ্গু অসহায় মানুষের অভাব নেই। ক্যান্সার, এইড্‌সের মত প্রাণঘাতি ব্যাধি আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দরিদ্র দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। রোগে-শোকে মানুষের সেবা ও তার পাশে দাঁড়ানো মানবতার দাবি ইসলামের দাবি। একজন মুসলমান একে তার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে সেবা দান করবে। সুস্থ জীবন রক্ষাকল্পে চিকিৎসা সেবা জরুরী। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি। আল্লাহ্ তায়ালা রোগও নাযিল করেছেন এবং তা নিরাময়ের জন্য ঔষধের ব্যবস্থাও করেছেন, বিভিন্ন সময়ে মানুষ ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে আসছে।

---

১২৮. বিস্তারিত দ্র. আহ্‌মাদ যাকী সাফওয়াত, উমার ইব্‌ন আবদিল আজিজ (কায়রো : ১৯৪৮), পৃ. ৩৭-৪২

১২৯. Hamiduddin Khan, *History of Muslim Education* (Bairut : 1954), P. 201; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮৭

১৩০. Salem Azzam, Islam and Contemporary Society (London : Islamic Council of Europe, 1982), P. 122; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০০

১৩১. P. K. Hitti, History of Arabs, P. 301; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৫

১৩২. P. K. Hitti, History of Arabs, P. 302; অধ্যাপক কে. আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০

Dhaka University Institutional Repository

এসকল দিক বিবেচনা করে আব্বাসীয় আমলে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের চিকিৎসা সেবাদানের জন্য ঔষধ তৈরী প্রণালীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যার ফলে সমাজের অবহেলিত, অসহায়, অক্ষম, দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হয়।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উক্তির আলোকে আমরা একথা বলতে পারি যে, খুলাফা-ই-রাশেদা ও তৎপরবর্তী মুসলমান শাসনামলে ইসলামের অধিকৃত এলাকাতে যে সকল জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড করা হয় তার জন্যই ইসলামী শাসনামল আজও মানুষের মনে জাগরিত। মুহাম্মদ (সঃ) মানবসেবার যে পথ দেখিয়েছেন তাকে পুঁজি করে পরবর্তীতে মুসলিম শাসকেরা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে মানবসেবার প্রতি উৎসাহী হয়ে সমাজের অসহায় গরিব, দুঃখী মানুষের ভাগ্যাহত ও আর্ত-মানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। বর্তমান সময়ে যেমন সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সেবা সংস্থাসমূহ অবহেলিত মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার মূল কর্মসূচী আমাদের মনে হয় সেই খুলাফা-ই-রাশেদা থেকেই শুরু হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে দুঃস্থ মানবসেবায় নিয়োজিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : পরিচয় ও কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে দুঃস্থ মানবসেবায় নিয়োজিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : পরিচয় ও কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের নিকট থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত শক্তিশালী নয় যে, রাতারাতি মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যাবে। এলক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সেবা সংস্থাসমূহও একাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল ও দারিদ্র্য-পীড়িত দেশ হিসেবেই আমরা পরিচিত।

এই দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পেতে ও অভাবী মানুষকে স্বনির্ভর করতে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গড়ে উঠেছে অনেক দেশী ও বিদেশী সেবা সংস্থা। ঠিক একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এখানে বেশ কিছু ইসলামী সেবা সংস্থাও গড়ে উঠেছে। তারা ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে দুঃস্থ মানুষের সেবা দিয়ে যাচ্ছে তারা মনে করে এতিম, অনাথ, পথহারা, অসহায়দের লালন-পালন, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের উপকার করা সম্ভব। আর এরই মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় হবে। কারণ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্।[১] যার ফলে ধনীর সম্পদে রয়েছে ফকির ও মিসকীনের হক।[২] ধনী শুধুমাত্র সম্পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত।

আমাদের এ দেশ মুসলিম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ নানা ধর্মের লোক স্বাধীনভাবে বসবাস করছে।[৩] ইসলামে সেবাদানে কোন ভেদাভেদ নেই। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ থেকে সেবামূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা মুসলমানদের পাশাপাশি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ সেবা ভোগ করছে ও উপকৃত হচ্ছে। এজন্য এ সকল সেবা সংস্থা সমূহের পরিচয় ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানা দরকার। নিম্নে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কতগুলো সেবা সংস্থার পরিচিতি ও কার্যক্রমের পর্যালোচনা করা হলো।

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৪

২. সূরা জারিয়াহ, আয়াত : ১৯

৩. মুসলমান ৮৮.৩% হিন্দু ১০.৫% বৌদ্ধ ০.৬% খ্রিস্টান ০.৩% অন্যান্য ০.৩%, গোলাম মোস্তফা কিরণ, *আজকের বিশ্ব* (ঢাকা : প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০০১), পৃ. ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম
(ইসলামী জনকল্যাণ সংস্থা)

১৯৮৬ সালের সমিতি আইনে নিবন্ধিত আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম[৪] ইসলামী বিধি-বিধানের আলোকে পরিচালিত স্বশাসিত সংস্থা। বিশ শতকের সূচনাপর্বে অবিভক্ত ভারতের অন্তর্ভূক্ত সুরাটের ইব্রাহীম মোহাম্মদ ডুপ্লে নামে এক ধর্মভীরু ও দানবীর ব্যক্তি মুসলিম জনতার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণগত রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুঃস্থ মানবতার সেবাদানের উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতায় ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম" নামে একটি সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।[৫] আর্তমানবতার সেবা এই জনকল্যাণমুখী সংস্থার প্রধান কাজ। ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জাস্টিস সারফুদ্দিন, প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর, নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন, শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক, স্যার মোঃ আজিজুল হক, খান বাহাদুর এস. কে ফজল এলাহি, জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী, খান বাহাদুর মনজুর মোরশেদ এবং আরও অনেক ব্যক্তিবর্গ ধারাবাহিকভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত মুসলিম সমাজের সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা, কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ও স্বার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।[৬]

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের (১৩৬৬ হিজরী সালে) সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় "আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম" তার কার্যক্রম আরম্ভ করে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব এস এম সালাউদ্দিন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় আঞ্জুমানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ-এর সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে আসছেন। ১৯৪৭ সাল হতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।[৭]

জনাব এ এফ এম আব্দুল হক ফরিদী (এড-হক কমিটি) এ.ডি.পি.আই.ইস্ট বেঙ্গল, জুলাই ১৯৪৭-জুন ৪৯;

জনাব হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রি, ইস্ট বেঙ্গল, জুন ১৯৫০-জুলাই৫৫;

জনাব বিচারপতি হামোদুর রহমান, জুলাই ১৯৫৫-জুন ১৯৫৭;

জনাব বিচারপতি এস এম মোর্শেদ, জুলাই ১৯৫৭-আগস্ট ১৯৫৮;

জনাব এ. এফ. এম. আবদুল হক ফরিদী, ডি.পি.আই সেপ্টেম্বর-১৯৫৮-জুলাই১৯৬৭;

জনাব বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ, জুলাই ১৯৬৭-নভেম্বর ৬৭;

জনাব বিচারপতি সৈয়দ এ. বি. মাহমুদ, ডিসেম্বর ১৯৬৭-জুলাই ১৯৭২;

জনাব বিচারপতি আমিনুল ইসলাম, আগস্ট ১৯৭২-ডিসেম্বর ১৯৭৬;

জনাব বিচারপতি এ. এফ. এম. আহসান উদ্দিন চৌধুরী (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি), ১৯৭৬-৮১;

জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, (প্রাক্তন মন্ত্রী), ১৯৮১-১৯৯২;

জনাব এ.বি.এম গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন মন্ত্রী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২-ডিসেম্বর ৯২;

জনাব বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, ডিসেম্বর ১৯৯২-ডিসেম্বর ১৯৯৩;

---

৪. আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ৫, এস কে দাস রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

৫. *শতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মরণিকা ২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

৬. *বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০৩*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম

৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

জনাব এ.বি.এম.জি কিবরিয়া (সরকারের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, ১৯৯০-৯১ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রদূত) ১৯৯৩ হতে বর্তমানে সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

"আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম" একটি অরাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কল্যাণমুখী সংগঠন। সংগঠনটি নিঃস্ব, দরিদ্র এবং অসহায় লোকের সেবায় নিয়োজিত আছে। সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রাক্তন মন্ত্রি এবিএম গোলাম মোস্তফা, প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব ও রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব এমআর ওসমানী ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা জনাব হাফিজ উদ্দিন খান প্রমুখ।[৮]

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কার্যক্রম [৯]

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম দেশব্যাপী আর্তমানবতার সেবার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

ক. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন। ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক হাসপাতাল ও রাস্তার বেওয়ারিশ লাশ দাফন এবং সামর্থ্যহীনদের লাশ দাফনে যথারীতি সাহায্য দান করা।

খ. জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিনা-পয়সায় চিকিৎসার জন্য এ্যাম্বুলেন্সের সহায়তা দান।

গ. বিনা পয়সায় গরীব মুসলমান ছেলেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এলাকাভিত্তিক স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাতনা করানো।

ঘ. ছেলে ও মেয়েদের এতিমখানায় রেখে শিক্ষাসহ তাদের কর্মক্ষম নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ. ঈদুল ফিতর উৎসবে গরিব জনসাধারণের মধ্যে নতুন কাপড় বিতরণ করা। দুঃস্থ মুসলিম পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দান এবং দুর্যোগকালে ত্রাণ সামগ্রী প্রদান।

চ. আধুনিক নিয়মে দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সমীক্ষা প্রণয়ন।

ছ. ছেলে-মেয়েদের জন্য মানবিক বিষয়ের বাইরে ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক কারিগরী শিক্ষার প্রণয়ন।

জ. একজন নাগরিক হিসেবে কর্মক্ষম করার জন্য এতিম, বিধবা, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করা।

ঝ. আশ্রয়হীনা মহিলা ও শিশুদের জন্য আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঞ. দেশে প্রাকৃতিক ও অভাবিত দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনে স্বল্প মেয়াদি পূনর্বাসন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ট. মোবাইল ক্লিনিকসহ জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত ও পীড়িত জনসাধারণের চিকিৎসা প্রদান করা।

ঠ. আঞ্জুমানের আদর্শের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখা।

ড. দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য এককালীন সাহায্য প্রদান।

---

৮. *বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ঢ. মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান।

ণ. গরিব ও নিঃস্ব পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা।

ত. নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান করা।

থ. ঢাকার বাইরে লাশ পরিবহণের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা।

উল্লেখিত কার্যক্রম ব্যতীত নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিষয়ে আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলামের ভবিষ্যত পরিকল্পনা রয়েছে। যথা : [১০]

ক. ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় আরো বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

খ. ঢাকায় স্থান পাওয়া গেলে নিজস্ব কবরস্থান নির্মাণ।

গ. হাসপাতাল, এতিমখানা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও আরো কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন।

ঘ. জেলখানায় সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন কয়েদীদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ. ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন।

চ. শহর ও গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ও শিশুদের জন্য ইসলামী বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা করা।

ছ. প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য চিকিৎসা সেবা প্রদান।

জ. সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে আঞ্জুমানের শাখা অফিস স্থাপন।

ঝ. কাকরাইলের ৪২, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোডস্থ ০.৫০ একর জমিতে ২৫ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাম অফিসিয়াল কাজে ব্যবহার উপযোগী ইমরাত নির্মাণ।

ঞ. ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী দাফনের জন্য ঢাকা মহানগরীতে দাফন প্রকল্প (ফিউনারেল পার্লার প্রজেক্ট) চালু করা।

ব্যবস্থাপনা

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম-এর প্রধান অফিস ঢাকা-১২০৪, ৫ এ.কে দাস রোড, গেন্ডারিয়ায় অবস্থিত। এটি সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা পরিষদের অধীনে পরিচালিত একটি জাতীয় স্বেচ্ছা সেবী প্রতিষ্ঠান। এর সদস্যগণ সাধারণভাবে নির্বাচিত এবং আজীবন সদস্য। অনুমোদিত নিয়ম কানুন অনুসারে উক্ত সংস্থা শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক কার্যাদি সম্পন্ন করে। "আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম" এর কমিটি, সাব-কমিটিসমূহ সমাজের সমস্যা গভীরভাবে বিবেচনা করে চিহ্নিত করে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন পদ্ধতিতে সাহায্য করেন। কতিপয় সার্বক্ষণিক কর্মচারী প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তার অধীনে প্রশাসনিক ও অর্থসংক্রান্ত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছেন। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম স্বচ্ছ অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন। বার্ষিক ও ষান্মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মাসে নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক অভ্যন্তরীণভাবে হিসাব নিরীক্ষা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিষদের অনুমোদনক্রমে চার্টার্ড একাউন্টেন্টের ফার্ম বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করেন। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম একটি ত্রৈমাসিক সংবাদ বুলেটিন "আঞ্জুমান বার্তা" বের করে থাকে। আঞ্জুমানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনার ব্যাপারে সাধারণ সভায় নির্বাচিত ১২ সদস্যের একটি স্বেচ্ছাভিত্তিক বোর্ড অব ট্রাস্টি আছে।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের অবস্থান ও ঠিকানা :

প্রধান কার্যালয় : ৫ এস কে দাস রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা- ১২০৪। টেলিফোন : ৮৮০-২-২৪৮১৬৬, ৮৮০-২-২৩৯৮০৮।

---

১০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

অফিস কাম সেবাকেন্দ্র : ১০৬, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০। টেলিফোন : ৮৮০-২-৯৩৩৬৬১১।

দি কমোডিটিস ফাস্ট লিমিটেড আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে তাদের ফ্যাক্স ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। ফ্যাক্স নং ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৭৪৮৩।

Web site : http://www.agni.net/ami-bangladesh.

এ সংস্থাকে বাংলাদেশ গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা তাদের ই-মেইল (সিডিআরবি) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

ই-মেইল : cdrb@dhaka.agni.com (সিডিআরবি) ফ্যাক্স ৮৮-০২-৮১৭২৭৭।

স্বীকৃতি

সামাজিক ও মানবিক কল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম নিম্নোক্ত পুরস্কার লাভ করেছে।[১১]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার ১৯৮৪।

স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার ১৯৯৬।

এসব পুরস্কার দুর্গত মানবতার অ সেবা প্রদানের জন্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম স্বর্তঃস্ফূর্তভাবে লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী লস এঞ্জেলসের কনরাড এৰ হিলটন ফাউন্ডেশন ১৯৯৯ সালে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে পুরস্কার প্রদানে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করেছে। উক্ত পুরস্কার পৃথিবীর যে কোন শ্রেণীর আর্থিক সর্বোচ্চ পুরস্কার।[১২]

আঞ্জুমানের ঢাকা ভিত্তিক কর্মতৎপরতা

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ঢাকা মহানগরীতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[১৩]

ক. মুসলিম দরিদ্র পরিবারের এবং মুসলিম বেওয়ারিশ লাশ দাফন।

খ. জাতি-ধর্ম ও জাতীয়তা নির্বিশেষে বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবহার।

গ. দু'টি এতিমখানার বালক-বালিকাদের রক্ষণাবেক্ষণ।

ঘ. ঢাকাস্থ গেন্ডারিয়ায় নাম মাত্র মাহিনার একটি জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয় এবং বালক-বালিকাদের জন্য বিনা বেতনের প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা।

ঙ. বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ। এ ধরণের চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণের জন্য ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয় নিয়মিত কাজ করছে।

চ. যথাযথ চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মুসলমান বালকদের বিনামূল্যে খাৎনা করা।

ই. পি. আই কর্মসূচী

ক. বিদ্যালয়, এতিমখানা ও রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পবিত্র কুরআন শিক্ষা।

খ. দরিদ্র অসহায় পরিবারগুলোকে নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা।

গ. দরিদ্র পিতামাতার কন্যাদের বিয়েতে আর্থিক সাহায্য দান।

ঘ. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক সাহায্য দান।

ঙ. ঈদুল ফিতরের সময় ও শীতের মওসুমে দরিদ্র জনগণকে নতুন বস্ত্র দান।

চ. দুর্যোগের সময় রিলিফ সংক্রান্ত কাজ।

ছ. ১৯৭০ সালে গেন্ডারিয়া এলাকায় ফজলুল হক মহিলা কলেজ স্থাপন।

---

১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

১২. *বাৎসরিক প্রতিবেদন ১৯৯৯*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, পৃ. ৫

১৩. *বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০৩*, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে কয়েক বছরের বেওয়ারিশ লাশ দাফন ও রোগীদের এ্যাম্বুলেন্স সহায়তার একটি পরিসংখ্যান প্রদত্ত হলো–

ক. বিনামূল্যে বেওয়ারিশ ও অসহায় পরিবারের লাশ দাফন : [১৪]

বছর	সংখ্যা
১৯৯২-৯৩	১৯৭৬
১৯৯৩-৯৪	২১৫২
১৯৯৪-৯৫	২০২৪
১৯৯৫-৯৬	১৮৭৬
১৯৯৬-৯৭	২২০০
১৯৯৭-৯৮	২২৮৪
১৯৯৮-৯৯	২৩৭৮
১৯৯৯-০০	২৪৩৮
২০০০-০১	২৭০৮
২০০১-০২	৩০৯৩
২০০২-০৩	৯০৭

খ. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করছে।[১৫]

বছর	সংখ্যা
১৯৯২-৯৩	৩৩৫০
১৯৯৩-৯৪	৩৩৫৩
১৯৯৪-৯৫	৩৯০৫
১৯৯৫-৯৬	৫০০৪
১৯৯৬-৯৭	৪০৩৩
১৯৯৭-৯৮	৪৯৬৫
১৯৯৮-৯৯	৬৪৫২
১৯৯৯-০০	৭১১০
২০০০-০১	৭১৭৭
২০০১-০২	৬১৭৪
২০০২-০৩	৩২৪১

সাংগঠনিক বিষয়

সাংগঠনিকভাবে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সর্বজনবিদিত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অতীতে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশবরেণ্যে ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিলেন। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালনার জন্য ১৮৬০ সালের সমিতি আইনের বিধান অনুযায়ী একটি রুলস এন্ড রেজুলেশন রয়েছে যার সর্বশেষ সংশোধনী আনা হয়েছে ২০০১ সালে। বিধি অনুযায়ী এই সংস্থার দুই ধরণের সদস্য থাকার বিধান রয়েছে। যথা-

ক. আজীবন সদস্য

খ. সাধারণ সদস্য

---

১৪. *প্রাগুক্ত*

১৫. *বাৎসরিক প্রতিবেদন* ১৯৯৯, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে স্বশাসিত এই সংস্থায় আজীবন সদস্য ১৮৯ জন এবং সাধারণ সদস্য রয়েছে ৫১ জন। এই সদস্য মণ্ডলীর মধ্য থেকেই সাধারণ সভায় ৫জনকে প্রেট্রন ও ১২ জনকে ট্রাস্টি মনোনীত করা হয়েছে। একজন সম্মানিত ট্রাস্ট্রি মারা যাওয়ায় বর্তমান ট্রাস্টি ১১ জন। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ৭৮ জন সদস্য সমবায়ে একটি ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠিত হয়ে থাকে। প্রতি ৪বছর পর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সম্মানীত সভাপতিসহ সকল সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানটির সংবিধান অনুযায়ী তাঁরা প্রতিমাসে সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া ব্যবস্থাপনা পরিষদ সংস্থার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি কমিটি গঠন করেছে। তাঁরাও সময়ে সময়ে বসে কর্মপরিধি অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে পরামর্শসহ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকেন। ঢাকার বাইরে বর্তমানে এই সংস্থার ৩৭টি শাখা অফিস আছে। শাখা পরিচিতি নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. দিনাজপুর শাখা

১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত দিনাজপুর শাখার সভাপতি জনাব সৈয়দ মোসাদ্দেক হোসেন লাবু, সহ-সভাপতি জনাব মাসুদ হাসান চৌধুরী ও জেলা প্রশাসক চীফ পেট্রন। বেওয়ারিশ ও দরিদ্র ব্যক্তিদের লাশ দাফন, মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা, আরবী শিক্ষা প্রদান, বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান, দরিদ্র ব্যক্তিদের সাহায্য প্রদান, ত্রাণ কার্যক্রম ও শীতবস্ত্র বিতরণ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। বর্তমানে শাখার সদস্য সংখ্যা ৫২। শবেবরাত রাতে সংগৃহীত অর্থ, যাকাত, ফেৎরা ও সদস্যদের চাঁদা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের দান দ্বারা শাখা পরিচালিত হয়।[১৬]

২. চট্টগ্রাম শাখা

১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্টেডিয়াম শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা), নূর আহমদ রোড, চট্টগ্রাম, এই ঠিকানায় বর্তমানে শাখার দাপ্তরিক কার্যক্রম নির্বাহ করা হচ্ছে। শাখার নির্বাহী কমিটির সভাপতি চট্টগ্রাম মেট্রো পলিটন পুলিশ কমিশনার ইঞ্জিনিয়ার মুনাওয়ার আহমেদ শাখার সাধারণ সম্পাদক। শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল বেওয়ারিশ লাশ পরিবহন ও দাফন, রোগিদের এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রদান, ইপিআই কার্যক্রম। বর্তমানে শাখায় ২টি নতুন এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে। পতেঙ্গা বেড়ীবাঁধ সংলগ্ন উত্তর হালিশহর মৌজায় সরকারের নিকট থেকে খাস জমি নিয়ে কবরস্থান করার বিষয়টি শাখায় সভাপতির মাধ্যমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শাখার বর্তমান সাধারণ সদস্য ৮৯ জন এবং আজীবন সদস্য ১৪ জন। শাখার বর্তমান আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক।[১৭]

৩. সাতক্ষীরা শাখা

১৯৭৯ সালে সাতক্ষীরা শাখা স্থাপিত হলেও দীর্ঘদিন এর কার্যক্রম স্থগিত থাকে। ২০০৩ সালে জেলা প্রশাসক জনাব এ ওয়াই এম একরামুল হক সভাপতি, জনাব অধ্যাপক আবুল মোতালেব চৌধুরী ও জনাব এড: মোঃ আব্দুস সাত্তার সাহেবকে সহ-সভাপতি করে শাখার নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। শাখার নিকট থেকে কোন কার্যক্রম ভিত্তিক মাসিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। শাখার নিজস্ব কোন জমি নেই।[১৮]

৪. কুমিল্লা শাখা

১৯৮১ সালে কুমিল্লা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এডভোকেট মুহাম্মদ মুহসিনুজ্জামান চৌধুরী সাহেব এই শাখার সভাপতি এবং জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান উপ-পরিচালক কর্মকর্তা। গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০৩ কুমিল্লা শাখার ৩ বছর মেয়াদি (২০০৪-২০০৬) কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সরকার থেকে

---

১৬. *প্রাগুক্ত*
১৭. *প্রাগুক্ত*
১৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত ০.৩৭ একর জমিতে শাখার বর্তমান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে বেওয়ারিশ লাশ দাফন, বিনামূলে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান, রিলিফ বিতরণ, ত্রাণ কার্যক্রম, চিকিৎসা ও সাহায্য শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। টিক্কারচর গোরস্থানে বেওয়ারিশ লাশ গোসলের জন্য শাখার নিজস্ব গোসলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। কুমিল্লা শাখার সাধারণ সদস্য ৩২৮জন, আজীবন সদস্য ১৯ জন।[১৯] শাখার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।

৫. খুলনা শাখা

১৯৮১ সালে খুলনা শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। এই শাখার সভাপতি আলহাজ্ব সরোয়ার খান। বর্তমানে শাখার কার্যক্রমে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। কেন্দ্রীয় অফিসের প্রতিনিধিবৃন্দ পূর্বের কমিটি বাতিল করে একটি ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।[২০]

৬. নাটোর শাখা

১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত নাটোর শাখার সভাপতি নাটোরের জেলা প্রশাসক এবং জনাব নুরুল ইসলাম মুকুল উপ-পরিচালক, বর্তমানে নাটোর পৌরসভার মালিকানাধীন গাড়িটি গোরস্থানে উত্তর পশ্চিম কোণে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত অফিস কক্ষে শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, শীতবস্ত্র বিতরণ শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।[২১]

৭. বি.বাড়িয়া শাখা

১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বি.বাড়িয়া শাখার ১২৫জন সাধারণ সদস্য এই শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ব্রাহ্মনবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক এই শাখার সভাপতি এবং চমন শিকদার জুলকারনাইন সাহেব উপ-পরিচালক। শাখা স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত আয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বেওয়ারিশ লাল দাফন, জাতীয় টিকা দিবস, জাতীয় বৃক্ষরোপন দিবসে অংশগ্রহণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সাহায্য প্রদান শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।[২২]

৮. নেত্রকোনা

নেত্রকোনা জেলা প্রশাসক ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শাখার সভাপতি এবং উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন টি এ রহমত উল্লাহ। রোগী পরিবহন, লাশ দাফন, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান, আরবী ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ কার্যক্রম, পবিত্র ঈদের সময় দরিদ্রদের মাঝে নতুন কাপড় প্রদান শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া নেত্রকোণা শহরে দানে প্রাপ্ত ১.৩১ একর জমিতে দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান, কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসা, চিকিৎসা এবং বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের সাহায্যার্থে প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।[২৩]

৯. যশোর শাখা

প্রফেসর মোঃ শমসের আলী ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শাখার সভাপতি এবং জনাব শেখ জাফর উদ্দিন কচি সাধারণ সম্পাদক। যশোর রেল রোডে সিএন্ডবি অফিসের বিপরীতে একটি ঘর ভাড়া করে অফিস চালানো হচ্ছে। শাখার নিজস্ব কোন জমি নেই। দরিদ্র ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন, শীতবস্ত্র বিতরণ, দরিদ্র ব্যক্তিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, রিলিফ প্রদান এই শাখার উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড। এই শাখার সাধারণ সদস্য ৯০ জন এবং আজীবন সদস্য ৭জন।[২৪]

---

১৯. *প্রাগুক্ত*
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
২১. *প্রাগুক্ত*
২২. *প্রাগুক্ত*
২৩. *প্রাগুক্ত*
২৪. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

১০. রাজশাহী শাখা

জেলা প্রশাসক রাজশাহী ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শাখার সভাপতি এবং জনাব এ. কিউ. এম ফজলুল হক সাধারণ সম্পাদক। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, শীতবস্ত্র প্রদান, ত্রাণ কার্যক্রম, পবিত্র কুরআন শিক্ষা প্রদান, শিক্ষা ও পুনর্বাসন, কেন্দ্রীয় কারাগারে পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রকল্প চালু, দুঃস্থ ও নিজস্ব ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এই শাখার সাধারণ সদস্য ১২৭ জন এবং আজীবন সদস্য ৬৩জন। রাজশাহী শাখার নিজস্ব কোন অফিসঘর নেই।[২৫] শাখার কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

১১. গাইবান্ধা শাখা

১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত গাইবান্ধা শাখার সভাপতি জনাব শফিকুল ইসলাম আলমগীর এবং এর প্রধান পৃষ্ঠপোষকও তিনি। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, রোগী পরিবহন, পবিত্র ঈদুল ফিতরের সময় ২০০টি নতুন শাড়ি এবং ১০০টি নতুন লুঙ্গি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে প্রেরিত ১০০টি শীতের চাদর, ২০টি কম্বল, ৭০টি বিভিন্ন ধরণের শীতবস্ত্রসহ স্থানীয়ভাবে আরও ২০০টি শীতবস্ত্র শীতার্ত ও দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করে থাকে এ শাখা। এছাড়া দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এই শাখার সাধারণ সদস্য ১৩৯জন এবং আজীবন সদস্য ৩৩জন।[২৬] এ শাখার কার্যক্রম প্রশংসার দাবীদার।

১২. বাগেরহাট শাখা

বাগেরহাট শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের এই শাখার সভাপতি বেগম মাহতাব উদ্দিন। প্রধান পৃষ্টপোষক মাননীয় প্রাক্তন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রি ডাঃ মোফাজ্জেল হোসেন এবং উপদেষ্টা পরিষদে আছে মংলা পোর্টের চেয়ারম্যান জেলা প্রশাসক পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, শীতবস্ত্র বিতরণ, ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা, দুঃস্থ মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য প্রদান এই শাখার একটি উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড, এই শাখায় একটি সাব-অফিস করা হয়েছে, এবং এই শাখার আজীবন সদস্য ৫জন, সাধারণ সদস্য ৯০ জন। শাখার বিষয়ভিত্তিক সাব-কমিটি রয়েছে ৫টি।[২৭] এই শাখার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় না।

403515

১৩. ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। কিন্তু বিগত বছরে এই সংস্থার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমানে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। লাশ দাফন, দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে নতুন কাপড় প্রদান, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান, ত্রাণকার্য দরিদ্র বালকদের সুন্নাতে খাতনা এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।[২৮] কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য শাখাকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম উপদেশ প্রদান করে যাচ্ছে।

১৪. ফেনী শাখা

ফেনী আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল কাশেম (সিনিয়র) ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শাখার সভাপতি। দরিদ্র বালকদের সুন্নাতে খাতনা এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। একটি অস্থায়ী কার্যালয়ে বর্তমানে ফেনী শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[২৯]

---

২৫. *প্রাগুক্ত*
২৬. *প্রাগুক্ত*
২৭. *প্রাগুক্ত*
২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
২৯. *প্রাগুক্ত*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ঝিনাইদহ শাখা

আলহাজ্ব মোঃ খায়রুল বাশার ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের ঝিনাইদহ শাখার সভাপতি এবং এডঃ এ. কে. এম আজিজুর রহমান হলেন সাধারণ সম্পাদক। লাশ দাফন, সুন্নাতে খাতনা, শীতবস্ত্র বিতরণ এই শাখার উল্লেযোগ্য কার্যক্রম।[৩০]

১৬. মাদারীপুর শাখা

মাদারীপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান খান ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই শাখার সভাপতি এবং জনাব আব্দুর রব মিয়া সাধারণ সম্পাদক। বেওয়ারিশ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের লাশ দাফন, ভ্যানের মাধ্যমে রোগী পরিবহন, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য প্রদান।[৩১] ত্রাণ কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়।

১৭. রংপুর শাখা

রংপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে। শাখার ১৯ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটির সভাপতি হলেন রংপুর জেলার জেলা প্রশাসক এবং জনাব আব্দুর রাজ্জাক সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন।[৩২] এই শাখার কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়। ইদানীং এই শাখার কার্যক্রম কেন্দ্রীয় অফিস অবগত নয়।

১৮. বগুড়া শাখা

১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বগুড়া শাখার এড্হক কমিটির সভাপতি হলেন বগুড়া জেলার জেলা প্রশাসক। শাখার নিকট থেকে কোন প্রতিবেদন বা পত্র পাওয়া যায় না।[৩৩] শাখার কার্যক্রম কেন্দ্রীয় অফিস অবগত নয়।

১৯. পাবনা শাখা

পাবনা শাখা কার্যক্রম শুরু করে ২০০০ সালে। এই শাখা সভাপতি হচ্ছে আলহাজ্ব নুরুদ্দিন আহমেদ (বাবুল)। প্রধান পৃষ্টপোষক পাবনা জেলার জেলা প্রশাসক এবং উপ-পরিচালক জনাব শেখ মোঃ রেজাউল করিম। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, রোগী পরিবহন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুঃস্থ ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, সুন্নাতে খাতনা এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া ফ্রী ক্লিনিকের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবাও দেয়া হয়। এই শাখার আজীবন সদস্য ২০০ জন এবং সাধারণ সদস্য ৩১০ জন। শাখার কার্যক্রম ভাল এবং অর্থনৈতিক অবস্থাও সন্তেষজনক।[৩৪]

২০. হবিগঞ্জ শাখা

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হবিগঞ্জ শাখার এডহক কমিটির সভাপতি হলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ সিরাজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান। এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ত্রাণ বিতরণ, চিকিৎসা সেবা ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন। এই শাখার কার্যক্রম সন্তোষজনক নয়।[৩৫]

২১. মুন্সিগঞ্জ শাখা

মুন্সিগঞ্জ শাখা কার্যক্রম আরম্ভ করে ২০০১ সালে। এই শাখার এড্হক কমিটির আহবায়ক আবুল বাশার এবং সদস্য সচিব এডঃ মোঃ আক্তার হোসেন। বেওয়ারিশ ও নিঃস্ব ব্যক্তিগণের লাশ দাফন, মোবাইল

---

৩০. *প্রাগুক্ত*
৩১. *প্রাগুক্ত*
৩২. *প্রাগুক্ত*
৩৩. *প্রাগুক্ত*
৩৪. *প্রাগুক্ত*
৩৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মেডিকেল ইউনিটের মাধ্যমে ফ্রি চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান, ত্রাণকার্য, দরিদ্র মেধাবি ছাত্রদের সাহায্য, গরিব ব্যক্তিগণ কন্যার বিবাহে সাহায্য দান এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।[৩৬]

২২. মানিকগঞ্জ

১০ ডিসেম্বর ২০০২ইং তারিখে সাধারণ সভার সুপারিশ অনুযায়ী জনাব মাহবুবুল ইসলামকে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, দুঃস্থদের সাহায্য ও আঞ্জুমানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ড তারা পরিচালনা করছে।[৩৭]

২৩. রাজবাড়ি শাখা

রাজবাড়ি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। এই শাখার এড্হক কমিটির আহবায়ক হলেন জেলা প্রশাসক রাজবাড়ি এবং সদস্য সচিব হলেন প্রভাষক চৌধুরী আহসানুল করিম (হিটু চৌধুরী)। শাখা কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দরিদ্র ও বেওয়ারিশ ব্যক্তির লাশ দাফনসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছেন।[৩৮]

২৪. ঠাকুরগাঁও শাখা

১১ জুলাই ২০০৩ ইং তারিখে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরগাঁও শাখা ২১ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। জেলা প্রশাসক ঠাকুরগাঁও শাখার সভাপতি। বেওয়ারিশ লাশ দাফন, আর্ত-মানবতার সেবা এই শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।[৩৯]

২৫. জামালপুর শাখা

জামালপুর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১১ জুলাই ২০০৩ তারিখে। এই শাখার সভাপতি জনাব মোঃ আবুল হালেম, জামালপুর, জেলা প্রশাসক। ১৬ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটির মাধ্যমে বিভিন্ন সেবামূলক শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৪০]

২৬. টাঙ্গাইল শাখা

টাঙ্গাইল শাখা কার্যক্রম আরম্ভ করে ২৮ মার্চ ২০০৩ তারিখে। কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদিত এই শাখা মাননীয় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটি আঞ্জুমানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন। নিয়মিত কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত এড্হক কমিটি শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।[৪১]

২৭. জয়পুরহাট শাখা

জয়পুরহাট শাখা কার্যক্রম শুরু করে ৩০ মে ২০০৩ইং তারিখে। কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদিত এই শাখা পৌরসভার চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে ১০জন সম্মানিত পৃষ্টপোষক ও ৪১ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি আঞ্জুমানের কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করেছেন। নিয়মিত কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত এডহক কমিটি শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৪২]

---

৩৬. *প্রাগুক্ত*
৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৩৮. *প্রাগুক্ত*
৩৯. *প্রাগুক্ত*
৪০. *প্রাগুক্ত*
৪১. *প্রাগুক্ত*
৪২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

২৮. পঞ্চগড় শাখা

পঞ্চগড় শাখা কার্যক্রম শুরু করে ৩০ মে ২০০৩ তারিখে। কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদিত এই শাখা জেলা প্রশাসক পঞ্চগড় সভাপতি করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি এড্হক করে শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৪৩]

২৯. মাগুরা শাখা

মাগুরা শাখা কার্যক্রম শুধু করে ২৪ অক্টোবর ২০০৩ তারিখে। কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদিত এই শাখা মাগুরা জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটি দ্বারা শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৪৪]

৩০. কিশোরগঞ্জ শাখা

কিশোরগঞ্জ শাখা কার্যক্রম শুরু করে ৩০ মে ২০০৩ তারিখে। কেন্দ্রীয় অফিসের অনুমোদিত এই শাখা ১২ সদস্য বিশিষ্ট এড্হক কমিটি দ্বারা শাখার কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।[৪৫]

প্রশাসনিক কার্যাবলী

জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বার্থে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম-এ যুগ্ম-সচিব অথবা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের প্রশাসন ক্যাডারের একজন অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য নিরীক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে থাকেন। এছাড়াও হিসাব কাজে দক্ষ ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল পর্যায়ের অবসরপ্রাপ্ত একজনকে উপনির্বাহী পরিচালক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার্থে একটি অরগ্যানোগ্রাম ও সার্ভিস রুলস প্রণয়ন করেছে, যা ১৯৯৫ সাল হতে কার্যকর রয়েছে।[৪৬] পরবর্তীতে কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে সহকারী পরিচালকসহ কিছু কিছু পদ সৃষ্টি করা হলেও এখনও এগুলো অরগ্যানোগামে স্থান পায়নি। এই অরগ্যানোগ্রামকে সময় উপযোগী করার প্রক্রিয়া বিবেচনাধীন রয়েছে।[৪৭]

ক. প্রশাসন শাখা

খ. হিসাব শাখা

গ. বেরিয়েল শাখা

এতিমখানা ও স্কুল পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিচালকসহ মোট ৯৫ জন সদস্য বিশিষ্ট এক কর্মীবাহিনী আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকে সংস্থার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন।

ক. প্রশাসনিক শাখা

প্রশাসনিক শাখায় বর্তমানে একজন পরিচালকসহ মোট ৭জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। প্রশাসনিক শাখায় অন্যান্য অফিস আদালতের ন্যায় প্রয়োজনীয় রেজিষ্ট্রার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে অর্থ-কমিটি, ট্রাস্টি বোর্ড, যানবাহন কমিটি, এতিমখানা কমিটি। এড এন্ড পার্সোনাল কমিটি, রিলিফ কমিটি, চিকিৎসা বিষয়ক কমিটি, ডোকেশনাল উপআনুষ্ঠানিক কমিটি কোরবানী পশুর চামড়া সংগ্রহ কমিটি, নির্মাণ ও সম্পদ সংরক্ষণ কমিটি, স্কুল সভা কমিটি গঠন করা হয়েছে।[৪৮]

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*
৪৪. *প্রাগুক্ত*
৪৫. *প্রাগুক্ত*
৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৪৭. *প্রাগুক্ত*
৪৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

খ. হিসাব শাখা

হিসাব শাখা প্রতি অর্থ বছরে বাজেট প্রণয়ন করে থাকে। হিসাব শাখায় একজন হিসাব রক্ষকসহ ১জন ক্যাশিয়ার ও একজন দান কালেক্টর কর্মরত আছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যয়ের হিসাব তারা রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এছাড়াও যাকাত, ফেতরা, দান, সদস্য চাঁদা, কোরবানির পশুর চামড়া বিভিন্ন রশিদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা সঠিকভাবে রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করেন।[৪৯]

গ. বেরিয়েল শাখা

৭জন ডিউটি অফিসারসহ সংস্থার যানবাহনগুলি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১জন যানবাহন সুপারভাইজার ২জন মেকানিক হেলপার, ১৯জন ড্রাইভার এবং ১৭ জন ক্যারিয়ার নিয়োজিত রয়েছে। এই শাখার জন্য মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ৪৮জন। এই শাখার ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় থেকে নিম্নরূপ সেবা প্রদান করা হয়েছে।[৫০]

প্রতি মাসের কার্যক্রম	জুলাই/০৩	আগস্ট/০৩	সেপ্টে:/০৩	অক্টো:/০৩	নভে:/০৩	ডিসে:/০৩	ছয়মাসের মোট সংখ্যা
ফ্রি রোগী পরিবহণ	৫৬৫	৫৮১	৫৭৩	৬০৪	৫৬৭	৩৭৮	৬৯৯৮ টি
ফ্রি লাশ পরিবহণ	৭৩	৮১	৭৯	৭৪	৮৩	৬১	৯২০ টি
বেওয়ারিশ লাশ দাফন	১৪৩	১৫৩	১৬৩	১৫২	১৫৫	১৪১	১৬৭৪ জন

ঘ. এতিমখানা

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বর্তমানে ৩টি এতিমখানা পরিচালনা করছে। বালক এতিমখানাটি বর্তমানে ৪৪নং রজনী চৌধুরী রোডের পাঁচতলা ভবনটিতে পরিচালিত হচ্ছে। ৭,৬২৮,৩৭৮ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই ভবনে ২০০ জন এতিম বালক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের। বালক এতিমখানার একাংশে বর্তমানে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। বালিকা এতিমখানাটি প্রধান কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত। এখানে ৬৯জন ছাত্রী বসবাস করছে। ভবনটির বাস অনুপযোগী বিধায় এই দালানের পার্শ্ববর্তী স্থানে ৬তলা বিশিষ্ট একটি দালান তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের। এই ভবনটি নির্মাণের ফলে প্রধান কার্যালয়টি আধুনিকায়ন এতিম ও অসহায় মেয়েরা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আবাসনের সুবিধা পাবে। ২০০৩ সালে হিসাব অনুযায়ী এতিমখানায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পরিসংখ্যাণ ও পদোন্নতি নিম্নে বর্ণিত হল :[৫১]

---

৪৯. *প্রাগুক্ত*
৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
৫১. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বালক এতিমখানা

শ্রেণীর নাম	ছাত্র সংখ্যা	উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা	অনুত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা
শিশু শ্রেণী	-	-	-
প্রথম শ্রেণী	৩	১	২
দ্বিতীয় শ্রেণী	৩	৩	-
তৃতীয় শ্রেণী	৬	৬	-
চতুর্থ শ্রেণী	৬	৬	-
পঞ্চম শ্রেণী	৭	৭	-
ষষ্ঠ শ্রেণী	১৯	৯	১১
সপ্তম শ্রেণী	৪	৩	১
অষ্টম শ্রেণী	-	-	-
মোট	৪৮	৩৪	১৪

বালিকা এতিমখানা

শ্রেণীর নাম	ছাত্র সংখ্যা	উত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা	অনুত্তীর্ণ ছাত্র সংখ্যা
শিশু শ্রেণী	-	-	-
প্রথম শ্রেণী	১০	৫	৫
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬	৪	২
তৃতীয় শ্রেণী	৮	৮	-
চতুর্থ শ্রেণী	৫	৫	-
পঞ্চম শ্রেণী	৯	৯	-
ষষ্ঠ শ্রেণী	১০	১০	-
সপ্তম শ্রেণী	১	১	-
অষ্টম শ্রেণী	১	১	-
মোট	৫৫	৪৬	৭

ঙ. নরসিংদীস্থ ঘাটোহারায় একটি বালক এতিমখানা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম পরিচালনা করছে। এই এতিমখানায় ২০ জনের অধিক ছাত্র থাকার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে ৯জন অসহায় ছাত্র আছে। তিনটি এতিমখানায় বালক বালিকাদের জন্য ৩জন হোমসুপার, খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে ৯জন গৃহশিক্ষক এবং আরবী ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মোয়াল্লিম রয়েছে। তাছাড়া বালিকাদের জন্য একজন খণ্ডকালীন ড্রেস মেকিং ও সেলাই প্রশিক্ষক রয়েছে।[৫২]

চ. নারায়ণগঞ্জের তল্লায় দানে প্রাপ্ত ১৫ শতাংশ এবং আঞ্জুমানের ক্রয়কৃত ৫শতাংশ মোট ২০ শতাংশ জমিতে একটি বালিকা এতিমখানা পরিচালনার জন্য ১তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছে।[৫৩]

---

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১
৫৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য ও ত্রাণ কার্যক্রম

আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম দরিদ্র অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা, দুঃস্থ ব্যক্তিদের কন্যার বিবাহে সাহায্য, সম্বলহীন পরিবারবর্গকে মাসিক পেনশন, দরিদ্র বালক-বালিকাদের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য এবং পবিত্র ঈদুল ফিতরের সময় যাকাত কমিটির তত্ত্বাবধানে নতুন শাড়ি, লুঙ্গি প্রদান ইত্যাদি খাতে আঞ্জুমানে মুফিদুল ইসলাম নিম্নলিখিত সাহায্য প্রদান করেছে–

ক্রমিক নং	সাহায্যের বিবরণ	টাকার পরিমাণ
০১	বিবাহ	২৫,৫০০/-
০২	চিকিৎসা সাহায্য	৬৯,৯০০/-
০৩	মাসিক পেনশন	৩৫,২০০/-
০৪	শাড়ি, লুঙ্গি বিতরণ	২,৬১,৫০০/-
০৫	শিক্ষা সাহায্য	৩০,০০০/-
০৬	অন্যান্য সাহায্য সেবা	২৪,৪৮৯/-

২০০৩ সালে শীত মৌসুমে শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য প্রায় চার লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ১৫০০ পিছ কম্বল, ১০০০ পিছ কোট এবং ৩৫০০ পিছ চাদর ও জামা কাপড় ত্রাণ কমিটির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে।[৫৪]

উপ-আনুষ্ঠানিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র, বাড্ডা

বাড্ডা স্বাধীনতা স্মরণীতে একটি ভাড়া করা কক্ষে বর্তমানে ২ শিফটে আঞ্জুমানের নিজস্ব খরচে ২জন শিক্ষয়িত্রীর মাধ্যমে দরিদ্র বালক-বালিকাদের জন্য প্রতি শিফটে ২ ঘণ্টা করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সকালে ১ ঘণ্টা ১জন শিক্ষক নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কোরআন ও বুনিয়াদি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করছেন। এ পর্যন্ত এখান থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে ৮০ জন। ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে ৩০ জন বালক-বালিকাকে। এছাড়াও ১৩৬/৪, নয়াতলায় তিনতলা বিশিষ্ট একটি ভবন আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম দান হিসেবে পেয়েছে। এই ভবনের নিচতলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[৫৫]

প্রাইমারী ও জুনিয়র হাই স্কুল শাখা

জামিলুর রহমান ইসলামিয়া প্রাইমারী স্কুল ১৯৭৭ সালে গেন্ডারিয়ার ১২/১, অক্ষয় দাস লেনে প্রাথমিকভাবে যাত্রা শুরু করে। অতঃপর ১৯৯৬ সালে আঞ্জুমান জামিলুর রহমান গার্ল হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। শুরু থেকেই স্কুলটির প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ভার আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বহন করে আসছে। এখানে ১০জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ১জন ক্রীড়া শিক্ষক আছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার প্রযুক্তির উপর শিক্ষা প্রদান করা হয়। আঞ্জুমান জামিলুর রহমান ইসলামিয়া জুনিয়র গার্লস হাই স্কুলের ২০০৩ সালের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল–[৫৬]

---

৫৪. *প্রাগুক্ত*
৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
৫৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণী	মোট	মোট	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণ	মোট	শতকরা	অনুত্তীর্ণ	অনুত্তীর্ণ	মোট	শতকরা
	শিক্ষার্থী	পরীক্ষার্থী	ছাত্র	ছাত্রী	উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী	উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী	অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী
১ম	৫১	৪০	১৯	১৩	৩২	৮০	০৩	০৫	০৮	২০
২য়	৫৪	৫৩	২১	২০	৪১	৭৭.৩৫	০৫	০৭	১২	২২.৬৫
৩য়	৫৫	৪৬	১৮	০৮	২৬	৫৬.৫২	০৭	১৩	২০	৪৩.৪৮
৪র্থ	৪১	৩৮	১৬	১৭	৩৩	৮৬.৮৪	০১	০৪	০৫	১৩.১৬
৫ম	৫১	৪৭	২	২৮	৪০	৮৫.১০	০২	০৫	০৭	১৪.৯০
৬ষ্ঠ (ক)	৪০	৩৩	-	২৩	২৩	৬৯.৭০	-	১০	১০	৩০.৩০
৬ষ্ঠ (খ)	৩৯	৩৭	-	২০	২০	৭৪.৩৬	-	০৮	০৮	২৫.৬৪
৭ম	৬৪	৫৫	-	৫০	৫০	৯০.৯০	-	০৫	০৫	০৯.১০
৮ম	৩৯	৩৫	-	৩৫	৩৫	১০০	-	-	-	
মোট	৪৩৪	৩৮৪	৮৬	২২৩	৩০৯		১৮	৫৭	৭৫	

সেবাকেন্দ্র

৪২, কাকরাইল রোডে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে ০.৫০ একর জমি মরহুম জামিলুর রহমানের মা মরহুমা আজিজুন্নেছা সুফিয়া খাতুন দান করেছিলেন। এই জমিতে বর্তমানে ৪ তলা বিশিষ্ট একটি দালান রয়েছে, যা ভাড়া দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে মাসিক ৭২,২২০ টাকা ভাড়া বাবদ আয় হয়। পার্শ্ববর্তী স্থানে ১তলা বিশিষ্ট একটি সেবাকেন্দ্র রয়েছে। সেখান থেকে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম আর্ত-মানবতার সেবায় কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০৩ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই কেন্দ্র নিম্নরূপ সেবা পরিচালনা করা হয়েছে–[৫৭]

প্রতিমাসের কার্যক্রম	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে:	অক্টো:	নভে:	ডিসে:	ছয়মাসের মোট সংখ্যা
ফ্রি রোগী পরিবহণ	১৯৩	১৯৯	১৭০	২০৮	১৭১	১৫২	১০৯৩
ফ্রি লাশ পরিবহণ	৩৯	৩৬	৪১	৩৩	৪৩	৩৮	২৩০
বেওয়ারিশ লাশ দাফন	০৮	০৬	১১	১৫	১৯	০৮	৫৭

৫৭. *স্মারক গ্রন্থ ১৯০৫-২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম; *শতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মরণিকা ১৯০৫-২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম; *আঞ্জুমান বার্তা*, এপ্রিল ২০০৫; *Anjuman News*, July, 2004, P. 3; *ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT 2004*, ANJUMAN MUFIDUL ISLAM, P. 9; *প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও আর্থিক প্রতিবেদন ২০০৪*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

আয়ের উৎস

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের বর্তমান আয়ের উৎস আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের সদস্যদের আর্থিক অনুদান। সংগৃহীত কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ, ব্যক্তিগত অনুদান, সরকারি অনুদান, কাকরাইলের বাড়ি ও ঢাকার বদন্য ব্যক্তিদের প্রদত্ত দোকান ভাড়া অধিকাংশ আয়ের উৎস। এসব উৎস থেকে আয় অপ্রতুল এবং যথাযথভাবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অনিশ্চিত এমনকি সংস্থার বর্তমান কর্মতৎপরতার জন্য পর্যাপ্ত নয়। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এখন পর্যন্ত বিদেশি দাতা সংস্থা যারা সাহায্যের হাত বাড়াতে অভ্যস্ত তাদের নিকট থেকে কোন অনুদান গ্রহণ করেনি। আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম দেশে ও বিদেশে বসবাসকারী জনগণের আর্থিক সক্ষমতার উপর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা পোষণ করে। তারা আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামকে এর ভবিষ্যত কর্মসূচী বাস্তবায়নে আল্লাহর ওয়াস্তে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মসূচী সম্প্রসারণে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত অর্থের আবশ্যকতা গভীরভাবে অনুভব করে, স্থায়ী আয়ের একটি উৎস খোলার জন্য ঢাকাস্থ কাকরাইলে ২৫ তলা বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দাতা জামিলুর রহমানের নাম একাধিক প্রতিষ্ঠানে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম কর্তৃপক্ষ জামিলুর রহমানের নামে ঐ ভবনের নামকরণ করেন এবং জামিলুর রহমানের নামে একটি কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে।

অর্থ প্রদানের পদ্ধতি

নগদ অর্থ, ক্রস চেক, ব্যাংক ড্রাফট-এর মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম। এসবই আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ঢাকা বরাবরে সরাসরি প্রদান করা যায়।

ক্রস চেক ও ব্যাংক ড্রাফট, ডাকযোগে অথবা বার্তাবাহক মারফত নির্বাহী পরিচালক বরাবরে পাঠাতে হবে। এতে দাতার নাম ও ঠিকানা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যাতে সঠিকভাবে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র প্রেরণ করা যায়।

সমুদয় অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি রশিদের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক সংস্থা বা বিদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেনি। সংস্থাটি সাহায্যের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল। দেশের জনসাধারণ সময়ের প্রেক্ষিতে স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহর রহমতে একটি সুস্থ সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠন করতে পারবে বলে আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বিশ্বাস করে। জনগণের ওপর সহযোগিতাই আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলামের শক্তি ও প্রেরণার উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন[৫৮] একটি বেসরকারি সেবা সংস্থা। এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)। আহ্ছানিয়া মিশনের বর্তমান কার্যক্রমের পরিচিতির আগে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক, দেশবরণ্যে সমাজসেবক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় সূফীসাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বাঙালি মুসলিম জনতার গর্ব এবং তৎকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটে এক আলোকিত মানুষ। সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় পুরো সময়টাই তিনি অনগ্রসর মুসলিম জাতির সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে ব্যয় করেছেন। ইংরেজ শাসনামলে ভারতবর্ষে মুসলমানদের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, দৃষ্টিভঙ্গির পশ্চাদপদতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় তাঁর মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দেয়। মুসলমান জাতির এ অবক্ষয় থেকে মুক্ত করে নতুন জীবনদৃষ্টি, বিশ্ববীক্ষা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এভাবে তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। এই বিরাট, বিপুল এবং প্রায় এক শতাব্দীকালের কর্মী পুরুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্মরিত হচ্ছেন। তাঁর বিস্তৃত কর্মময় জীবন এখন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

বাল্যকাল ও শিক্ষা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তদানীন্তন খুলনা জেলার এবং বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুন্শী মুহাম্মদ মফিজ উদ্দিন একজন ধর্মপ্রাণ, দানশীল ও বিত্তবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পিতামহ মুন্শী মুহাম্মদ দানেশ ও একজন ধর্মপ্রাণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন তাঁর পিতামহের একমাত্র পুত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান।

তাঁর পিতা এবং পিতামহের বাল্যকাল থেকেই তাঁর সুশিক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল। পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই তাঁর শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষা শেষে তিনি নলতা মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এরপর তিনি টাকী গর্ভমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণী) বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থানে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানে ৯ম শ্রেণী) উত্তীর্ণ হন।[৫৯] বছরের শেষভাগে তিনি কলকাতার এলএমএস ইনস্টিটিউশনে (লণ্ডন মিশনারী স্কুল) দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমানে ৯ম শ্রেণী) ভর্তি হন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ১৮৯০ সালে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স (বর্তমান এসএসসি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ.এ (বর্তমানে এইচ. এস. সি) এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৪ সালে বি.এ পাশ করেন। ১৮৯৫ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ পাশ করেন।[৬০]

---

৫৮. ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : বাড়ি নং ১৯, সড়ক নং ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯

৫৯. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, পৃ. ১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (ঢাকা : ১৯৮৭), ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১, ১৮২; এ. টি. এম ফাখরুদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিশেষ অবদান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ২১

৬০. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, পৃ. ১; এ. টি. এম ফাখরুদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র) : শিক্ষা বিস্তারে তাঁর বিশেষ অবদান*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ঢাকা, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

পেশাগত জীবন

১৮৯৬ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করেন। চাকুরি জীবনের শুরুতে তিনি কিছুদিনের জন্য রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সুপারনিউমারী টিচার পদে নিয়োগ পান।[৬১] এ সময়ে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন এ ডব্লিউ ক্রফট। অল্প কয়েকমাসের মধ্যে তিনি উচ্চ বেতনে ফরিদপুরের অতিরিক্ত ডিপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ পান।[৬২] অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টরের নতুন পদে কাজ করার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ছয়মাস তিনি স্কুল সাব ইন্সপেক্টর পদে কাজ করেন। এখানে তাঁকে বহু স্কুল পরিদর্শন করতে হয়।[৬৩]

১৮৯৮ সালে ১লা এপ্রিল তিনি অস্থায়ী সাব ইন্সপেক্টরের পদ ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে যোগদান করেন।[৬৪] এরপর তিনি বাখেরগঞ্জ জেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ পান। তাকে এই পদে নিয়োগ প্রদান করেন ডিরেক্টর মার্টিন। তাঁর দপ্তর ছিল বরিশালে। ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সাত বছর কর্মরত ছিলেন। এসময় ডিরেক্টর মার্টিন সাব অর্ডিনেট এডুকেশন সার্ভিস থেকে প্রভিনসিয়াল এডুকেশন সার্ভিস এর জন্য ১২ জনের নাম মনোনীত করে বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নাম এই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং ডিরেক্টর কর্তৃক তিনি মনোনীত হন। এর ফলে তিনিই সর্বপ্রথম ইন্সপেকটিং লাইন থেকে টিচিং লাইন এর প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি পান এবং ১৯০৪ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। এখানে অবস্থান কালে তিনি মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন এবং দীর্ঘদিনের অন্তরায়গুলো দূরীকরণে সচেষ্ট হন।[৬৫]

রাজশাহীতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য প্রয়োজনীয় মাদ্রাসার অভাব ছিল। কলেজের কয়েকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মাদ্রাসার ক্লাস চলত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মিশনারীদের বিস্তৃত এলাকা হুকুম দখল করে তা মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করেন।[৬৬] রাজশাহীতে সে সময় কোন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় মুহাম্মদ এমাদউদ্দিন আহমদ সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এসময় পূর্ববঙ্গ আসামের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর এইচ.শার্প রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তার কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ১৯০৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ দান করেন। তিনি দীর্ঘ সতের বছর চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থান করে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেন।[৬৭] ডিরেক্টর শার্প খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মদক্ষতা, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল ছিলেন। ফলে চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উন্নতিকল্পে তাঁর প্রস্তাবিত অর্থ প্রদানে তিনি কার্পণ্য করেননি। যথাযথ অর্থ প্রাপ্তির ফলে সাব ডিভিশনাল স্কুলগুলোর অবয়ব ও সৌষ্টব বৃদ্ধি করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। ফেনী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, চট্টগ্রাম শাখাও তাঁর সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফসল। চট্টগ্রামের নিকটস্থ পাহাড়তলীতে। বিশালকার বিদ্যালয়টি নির্মাণের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। এছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া হিন্দু জমিদার বাড়িতেও তিনি অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৮]

১৯১২ সালে দিল্লীর সম্রাট পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সম্মেলন ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কয়েক বছরের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত

---

৬১. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, পৃ. ২
৬২. *প্রাগুক্ত*,
৬৩. *প্রাগুক্ত*,
৬৪. *প্রাগুক্ত*,
৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবনধারা* (ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৭), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ১৯
৬৬. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, পৃ. ২
৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
৬৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হন এবং চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা চলে আসেন। তিনি যখন চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত ছিলেন সে সময় তাকে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর 'বঙ্গদেশের মোছলেম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর' হিসাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) পদোন্নতি লাভ করেন।[৬৯] এই পদে তিনি পাঁচ বছর ছিলেন। অবিভক্ত বাংলায় খানবাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ) আগে বা পরে কোন ভারতবাসী এই পদে নিযুক্ত হননি। তিনি অবসর গ্রহণ করলে পুনরায় ইংরেজ অফিসার মিস্টার বর্চমলিকে নিয়োগ করা হয়। বাঙালির জন্য এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সহকারী ডিরেক্টরের পদ কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) কলকাতায় চলে আসেন। নিজ পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি কিছুদিন অবিভক্ত বাংলা ও আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৯ সালে ৫৫ বছর বয়সে এই মহান ব্যক্তিত্ব সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৭০]

শিক্ষা সংস্কার

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) নিরলস সুদীর্ঘ কর্মজীবন শিক্ষা বিভাগেই অতিবাহিত হয়েছে। কর্মজীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে তিনি সুচারুরূপে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সক্রিয় অংশ গ্রহণে শিক্ষা ক্ষেত্রে তথা মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার বিপুল সংস্কার সাধিত হয়। তাঁর শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যক্রমগুলো হচ্ছে-[৭১]

ক. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতির প্রচলন বাতিল করে কেবল রোল নং লেখার রীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। এর ফলে কোন ছাত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার সুযোগ থাকবে না। তিনি সর্বপ্রথম অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় এই রীতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এরপর এই অনুকরণে তিনি তৎকালীন আই.এ এবং বি.এ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার নিয়ম রহিত করে রোল নং লেখার নিয়ম প্রবর্তন করেন।

খ. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) উচ্চ মাদ্রাসা ও মাধ্যমিক মাদ্রাসা ঘরের শিক্ষার মান উন্নয়ন করেন এবং মাদ্রাসা পাশ ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুকূলে সুযোগ সৃষ্টি করেন।

গ. তিনি তৎকালীন স্কুল কলেজে মৌলভীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের পার্থক্য দূর করেন।

ঘ. তৎকালীন সময়ে উর্দুকে ক্লাসিক্যাল হিসেবে গণ্য করা হতো না। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের উর্দুভাষী ছাত্রদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) আন্তরিক প্রচেষ্টায় উর্দূ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে পঠিত হয়।

ঙ. তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলস্বরূপ ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মি. হারলি এই কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন।

চ. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক মুসলমান শিক্ষকের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, মোছলেম ইনস্টিটিউট প্রভৃতি তাঁর অবদানের সাক্ষ্য বহন করে।

---

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৭০. *প্রাগুক্ত*

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবনধারা* (ঢাকা : জয় প্রকাশনী, ১৯৮৮), ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৯২-৯৬; এ.এফ.এম এনামুল হক, *হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-এর জীবন ও কর্ম* (ঢাকা : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ২১-২২; পরবর্তীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামিয়া কলেজটির নাম পরিবর্তন করে 'মাওলানা আজাদ কলেজ' করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ছ. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবিস্মরণীয় অবদান রাজশাহী কুলার হোস্টেল নির্মাণ। মুসলমান ছাত্রদের জন্য এই হোস্টেল নির্মাণকালে তিনি বহু মাত্রিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কিন্তু সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি তাঁর কর্মে সফল হন। তিনি ইংরেজ প্রশাসনের অনুমোদন আদায়ে সমর্থ হন।

জ. তিনি মক্তবের জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকদের লেখা পুস্তক ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন।। এর ফলে মুসলমান লেখকগণ পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ পান এবং মুসলমান পুস্তক প্রকাশকগণের অবস্থার উন্নতি হয়। তৎকালীন মসদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা এবং টিকে থাকার পিছনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

ঝ. স্কুল-কলেজে মুসলমানদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা তিনি নির্ধারণ করেন এবং গরীব ও মেধাবি ছাত্রদের বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বৈদেশিক উচ্চ শিক্ষার জন্য মুসলমানদের সরকারি বৃত্তি প্রাপ্তির পথও তিনি সুগম করেন।

ঞ. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন এবং পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলমান পরীক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক কর্মচারিদের মধ্যে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা, স্কুল কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমান আসন সংখ্যা নির্ধারণ করেন।

ট. তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে নিউস্কিম মাদ্রাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হাইস্কুলে আরবী অধিকতরভাবে দ্বিতীয় ভাষা (Second Language) রূপে গৃহীত হয়।

ঠ. মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের শিক্ষা ও শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

ড. অবিভক্ত বাংলার গভর্ণর ১৯১৪ সালের ৩০ জুন ২৪৭৪ সংখ্যক রেজিলিউশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনটি বিশেষ ধারার স্বপক্ষে সুপারিশ করার জন্য এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির সুপারিশ মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদূরপ্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ঢ. তৎকালীন পূর্ববঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত যত কমিটি বা কনফারেন্স হত তার সবকটিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সদস্য বা অন্য কোন পদে জড়িত থাকতেন। আইন পরিষদে যখন শিক্ষার মাধ্যম (Medium of education) কি হবে তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত হয়, তখন চীপ সেক্রেটারি খানবাহাদুর আহসানউল্লা (রঃ) লিখিত এ সম্পর্কিত প্রবন্ধের বক্তব্য ও সুপারিশ সমর্থন করেন এবং বিষয়টি উক্ত পরিষদের গোচরীভূত করেন।

ণ. ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে উপস্থিত হলে দারুণ বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে এটি বিবেচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এই কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা সমর্থন করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে অবদান

অক্লান্ত কর্মী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর সুদীর্ঘ কর্মবহুল জীবনে কেবল শিক্ষাক্ষেত্রেই অবদান রাখেননি। এর নিরলস কর্মতৎপরতার পাশাপাশি তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সমান

Dhaka University Institutional Repository

দক্ষতায়। সমাজ ও দেশ, বাংলা ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি, ইতিহাস, শিক্ষা, ধর্ম, জীবন কথা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য (১৯৯৮), হিস্ট্রি অব দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড (History of the Muslim World) (১৯৩১), ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (১৯২৬), তরিক শিক্ষা (১৯৪০), শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান (১৯৩১), কোরআন ও হাদীসের আদেশাবলী (১৯৩১), ছুফী (১৯৪৭), সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৪৯), ইসলামের মহতী শিক্ষা (১৯৪৯), মহাপুরুষদের অমিয় বাণী (১৯৫০), ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি (১৯৫৬), টিচার্স ম্যানুয়েল (১৯৫২) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৭২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) সাহিত্য ভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল স্বদেশ ও স্বজাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা। তিনি তাঁর গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন- "সমাজ সেবাই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৭৩] যে জাতির সাহিত্য নাই সে জাতি উন্নতি সুদূর পরাহত। যদি মোছলেম বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, যদি অন্যজাতির সমকক্ষতা অর্জন করিতে হয়, তবে মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাবে ভাবাপন্ন করিতে হইবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাংলা ভাষার উন্নতি একান্ত আবশ্যক।[৭৪] সমাজসেবা, জাতীয় উন্নয়ন এবং মানুষের চারিত্রিক উন্নতির লক্ষ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বেশ কিছু জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী, বিভিন্ন সুফী সাধকদের জীবনী ছাড়াও রাষ্ট্রনায়ক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করেন।[৭৫]

ইসলামের বিধি বিধানের পাশাপাশি এর অন্তর্গুণ এবং নির্যাসকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। সুফী, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইসলামের মহতী শিক্ষা, তরিকত শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর এই অন্তরভাবনা ও বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি মনে করেন বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ইসলামের গূঢ় রহস্য জানার জন্য উৎসুক। কিন্তু শরিয়তের কঠোর বাধ্যবাধকতা তাদের মনকে আকর্ষণ করতে অক্ষম। শরিয়তের এই কঠোরতা ভেদ করিয়া যে অনাস্বাদিত আনন্দ ও শান্তি লাভ করা যায়, তা অনেকের অবোধ্য।[৭৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ মূল্যবোধ ও উদ্দেশ্যকে স্মরণ রেখে সাহিত্য চর্চা করেন। কিন্তু রচনার প্রসাদগুণে এবং বিষয়বস্তুর সক্রিয় উৎকৃষ্টতায় তাঁর রচনা সময়ের গণ্ডি কাটিয়ে চিরন্তন এবং সৎ সাহিত্যের সম্মান লাভ করেছে।

স্বীকৃতি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সমগ্র জীবন ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পেশাগত জীবনে তিনি সততা ও নিষ্ঠার সাথে সকল দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি একজন দক্ষ, কর্মঠ, দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিবেদিত প্রাণ সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। এজন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন। কর্তব্য কর্মে এই নিষ্ঠা, দক্ষতা ও সততার পুরস্কার হিসেবে চাকরি জীবনে তিনি একাধিকবার দ্রুত পদোন্নতি পেয়েছেন। মধ্যবর্তী বেতন গ্রেড অতিক্রম করে উচ্চতর বেতন গ্রেডে উন্নীত হয়েছেন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকরি জীবনের প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন সরকার তাঁকে ১৯৭১ সালে "খানবাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন।[৭৭] মাত্র ১৫ বছর চাকরি জীবনকালে এই সম্মানলাভ একটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর আগে কোন মুসলমান এই সম্মানসূচক পদ লাভ করেননি। তৎকালীন সাহিত্য সমাজ ও সাহিত্য

---

৭২. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. ৭
৭৩. *প্রাগুক্ত*
৭৪. *প্রাগুক্ত*
৭৫. *প্রাগুক্ত*
৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৭৭. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠনের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ১৯১৭-১৯১৮ সালের কার্যকরী পরিষদের সহ-সভাপতি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৭৮] সমাজসেবা, সমাজ সংস্কৃতি বিশেষ করে দ্বীনি প্রচার কার্যে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার ১৪০৫ হিঃ (মরণোত্তর) এ ভূষিত হন।[৭৯] বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমী তাঁকে ১৯৬০ সালে সম্মানসূচক ফেলোশীপ প্রদান করেন।[৮০]

সেবা সংস্থা প্রতিষ্ঠা

সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) স্বদেশবাসীর 'রুহানী খেদমত' এবং সমাজসেবার জন্য ১৯৩৫ সালের ১৫ই মার্চ 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় (নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন) সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফে অবস্থিত। দেশ-বিদেশে আহ্ছানিয়া মিশনের ১১৭টি শাখা মিশন রয়েছে। এসকল শাখা মিশনের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে।

মানব সেবায় নিয়োজিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপন, গৃহসংস্থান, কারিগরী শিক্ষা, সার্বিক সমাজ উন্নয়ন শিক্ষা উপকরণ তৈরি, গণশিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গ্রন্থ উন্নয়ন ও বন্টন, বস্তি এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন এবং এতদসম্পর্কিত গবেষণা, জরিপ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউল্লা (রঃ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আহ্ছানাউল্লা ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমনিকেশন টেকনলজি, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিশন ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, আহছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউজ, আহ্ছানিয়া ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল।

'আহ্ছানিয়া মিশন' মূলত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বিশ্বাস আদর্শ এবং অন্তর্গত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। মিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তিনি স্থির করেন। স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা। তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্যই ছিল সেবা। এ সম্পর্কে আত্মজীবনীতে খানবাহাদুর আহ্ছানাউল্লা বলেন- "শহর থেকে দূরে সরিয়ে মানবের খেদমত করাই আমি জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছি। খেদমতে যে আনন্দ, মখদুমিরতে আর নাই। আমিত্ব দূরীভূত না হইলে মহব্বতের প্রসার হয় না। সৃষ্টির প্রতি প্রেম না জন্মিলে স্রষ্টার প্রতি প্রেম হয় না। ভ্রাতৃত্ব বিস্তার ও তৎসহ শান্তির সৃষ্টি মদীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"[৮১]

আধ্যাত্ম জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ধর্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আধ্যাত্ম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি কামেল পীর হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। আধ্যাত্ম সাধনা ও ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতা সতত শ্রদ্ধার সাথে স্মরিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর ভক্ত অনুসারী ও গুণগ্রাহীকে দিয়েছিলেন বন্ধুর স্থান। তাঁর স্বভাবসূলভ বিনয়, আধ্যাত্মিকতা ও মানবিক ঔজ্জ্বল্য স্থান কাল পাত্র ভেদে অগণিত মানুষকে দিয়েছে পথের দিশা এবং সুন্দর জীবনের সন্ধান। পীর ও মুরীদের পারস্পারিক সম্পর্ক বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) নিম্নোক্ত বক্তব্যটি সমকালীন দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। "পীরের কর্তব্য মুরীদের অন্তরে ঐশীশক্তি উন্মেষ করা। কোন পীর ঐশীশক্তি পয়দা করিতে পারেন না। তিনি কেবল খোদাপ্রদত্ত শক্তিকে উন্মেষ করেন। সকল লোহাতে ঘর্ষণ করলে অগ্নির উদগম্ হয়। সেইরূপ

---

৭৮. *প্রাগুক্ত*
৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
৮০. *প্রাগুক্ত*
৮১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

খোদা সকল বান্দার হৃদয়ে তাঁহার শক্তি গুপ্ত রেখেছেন। উক্ত শক্তি মহব্বত ও এবাদত দ্বারা উন্মেষ ঘটাতে হয়, আর এর জন্য প্রয়োজন সৎ শিক্ষকের।[৮২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) জীবনকাল ৯২ বছর। ১৯৬৫ সালের ১০ফেব্রুয়ারী তিনি ইন্তিকাল হন। মৃত্যুর পরও তিনি বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের জন্য সমান মর্যাদায় বিরাজিত। তিনি তাঁর কালের অক্ষয় ইতিহাস, অমর মহাপুরুষ এবং অবিস্মরণীয় কর্ম ও কৃতির নীরব স্বাক্ষী। তাঁর মৃত্যুর পর 'দৈনিক আজাদ' (২৮ মাঘ ১৩৭১) পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তাঁর কর্মময় জীবন স্মরণ করে বলা হয়-

"খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মময় জীবনের অনেক কীর্তিই জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মোসলেম শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান প্রেরণা হিসেবে শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। ইহা শিক্ষা বিস্তার, ইসলামের সাধনা এবং মোছলেম জনসাধারণের খেদমতের সুগভীর আগ্রহে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘদিন বাঁচিয়া গিয়াছেন এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি ইসলাম ও মোছলেম সমাজের নীরব কর্ম সাধনায় নিয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই আল্লার কম মেহেরবাণী নহে। তাঁহার মৃত্যুতে সমাজের একটি দিক সম্পূর্ণরূপে শূণ্য হইয়া গেল। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ধার্মিক; কিন্তু গোড়া ছিলেন না কোন অর্থেই। ধর্মশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত যা আমাদের সাহিত্যকে দিয়েছে বৈচিত্র্য আর সমৃদ্ধি।" ড. ওয়াকিল আহমদ এই সাধক পুরুষের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন- "আমার বিশ্বাস খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) বিপুল আয়তনের রচনা চিন্তাশূণ্য ও সারবস্তুহীন ছিল না। বরং যুগের চাহিদা ও ভাবধারার সাথে তাঁর চিন্তাশীল লেখার গভীর সম্পর্ক ছিল।"[৮৩]

সাহিত্য সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের এক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত মন্তব্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্পর্কে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলার নবজাগরণে, বাংলার মুসলমানের নবজাগরণে ছিলেন প্রকৃতার্থে এক রেনেঁসা মানব, ঐহিকতা ও পারত্রিকতাকে যিনি এক করতলে মিলিয়ে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে ভাবয়িত্রী প্রতিভা ও করয়িত্রী প্রতিভার সম্মিলন ঘটেছিলো[৮৪] যিনি পূর্ণ মানব বা ইনসান উল কামেল পদবীতে পৌছবার কল্যাণমূলক অন্যতম নিদর্শন। এবার আমরা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের গঠন ও কার্যক্রম এর প্রতি আলোকপাত করব।

সমাজের দুঃস্থ মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকালের পথ যাত্রার বর্তমানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কার্যকরী সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার লক্ষ্যে সুদমুক্ত ঋণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ উন্নয়ন সহায়তা ইত্যাদি সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাম ও শহর এলাকায় দুঃস্থমানবতার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশ সরকারের অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হয় ১৯৬৩ সালে।[৮৫] একই সাথে এই সংস্থা বহির্সম্পদ বিভাগেও নিবন্ধিত হয়। পরে এনজিও ব্যুরোতে এটি আবার নিবন্ধিত হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি সাধারণ ও একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ রয়েছে। সাধারণ পরিষদ ও সভাপতি বার্ষিক নির্বাচনের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১০০ জন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্পাদক নির্বাহী পরিচালক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।[৮৬]

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ২০০৪ সালে ৭১ জনের একটি জনবল কাঠামো গঠন করা হয়। এর প্রধান নির্বাহী পরিচালক। নিম্নপদে এই জনবল কাঠামো বিন্যস্ত।[৮৭]

---

৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
৮৩. *প্রাগুক্ত*
৮৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ* (ঢাকা : রোহেল পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৪), পৃ. ২১৭
৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৮
৮৬. *প্রাগুক্ত*
৮৭. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

নং	পদবী	সংখ্যা
০১	নির্বাহী পরিচালক	১
০২	পরিচালক	২
০৩	উপ-পরিচালক	২
০৪	প্রকল্প সমন্বয়কারী	১
০৫	সহকারী পরিচালক	৪
০৬	কর্মসূচী কর্মকর্তা	১
০৭	কর্মকর্তা	৩
০৮	অফিস সহকারী ও টাইপিস্ট	৬
০৯	অফিস কর্মী	১২
১০	প্রশিক্ষক	৬
১১	শিক্ষক	৭

এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মিশন কর্মসূচী তৎপরতা সংগঠন ও পরীক্ষণের জন্য ৬জন এলাকা সমন্বয়কারী ও ১৮জন পরিদর্শক রয়েছেন। মিশনে ৩৯৩জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক স্থানীয়ভাবে নিয়োগ পায় এবং কার্যকরী স্বাক্ষরতা কেন্দ্রে খণ্ডকালীন বেতনে কাজ করতে দেখা যায়।[৮৮]

কার্যক্রম

গ্রাম ও শহর এলাকায় দুঃস্থ নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কাজ করে। এই সংস্থার সহায়তায় একাধিক শহর অঞ্চলের বেকার যুবক, বাণিজ্য স্থাপনা ও শিল্প কারখানার কর্মী এবং অন্যদিকে গ্রামের শিল্পী, তাঁতী, জেলে ও অন্যান্য নিম্নবৃত্তির মানুষ, ভূমিহীন ও স্বল্প জমির মালিক এবং প্রান্তিক বর্গের সুবিধাভোগী মানুষ । তাছাড়া গ্রাম ও শহরের কিশোরীও শিক্ষা বিষয়ে মিশনের সেবা পায়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন জরুরী ত্রাণ তৎপরতাও মিশনের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এমন এক কর্মপরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে যা কেবল মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কিংবা দান খয়রাত ও ত্রাণ তৎপরতার মধ্যেই শেষ হয়নি। বরং বর্তমানে এই সংস্থা সমাজের বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের মধ্যে আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমর্থিত কর্মধারা পরিচালনা করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পরিচয় দিতে গিয়ে Towards better tomorrow-তে বলা হয় :

The mission is no longer a nonfunctional philant tropic organization devoted to humanitarian services alone. Nether it is involved exclusively in distributing relief materials among the wretched of the earth in a dole out manner. In recent times, it has turned to be more of on integrated development organization working for a self- reliant and self-sustaining development of the poor, through various programs and projects in both social and economic sectors. In fact, its work priorities, apart from being referred to a specific concept of man cut across one of the most pical concerns in development, e.g. Organization of the poor, as a critical factor to quits and distributive justice in strategies,

৮৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

participation, human rights, integration of women in development, and ecology consciousness, and so on.[৮৯] সুতরাং সামগ্রিকভাবে একটি সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে বহুমাত্রিক কর্মধারায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন জাতীয় উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রান্তিক বর্গের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানো, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সংস্থার সকল কর্মসূচীর সাথে গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সংযোগ আছে। মানুষকে ধারণার কেন্দ্রে এনে তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য এই সংস্থা কাজ করে। মিশনের গণশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৫টি শাখায় বিভক্ত। এগুলো হল-

ক. সাক্ষরতা ও গণশিক্ষা ইনস্টিটিউট

সংস্থার এই শাখার মূখ্য উদ্দেশ্য হল "Promoting the Professional standard of literacy and adult education workers involved in various development programs and projects that are being implemented by NGOs as well as public sector agencies concerned in both rural and urban setting"[৯০] এই সংস্থা বয়স্কশিক্ষা কর্মীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। কর্মীদের কারিগরী দক্ষতার মানোন্নয়ন ও বিকাশ সাধন করে। সক্ষমতা ও বয়স্ক শিক্ষার কারিগরী বিষয়ে জড়িত সংস্থা ও সংগঠনের কর্মসূচী ও প্রকল্প পরিকল্পনা, নকশায়ন, বাস্তবায়ন, গবেষণা, মূল্যায়ন, ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে পরামর্শ সেবা প্রদান করে। এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মিশন তিনটি শাখা ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।[৯১]

১. কারিগরী সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা;

২. কারিগরী দক্ষতা প্রশিক্ষণ;

৩. উন্নয়ন যোগাযোগ সমর্থন।

খ. বয়স্কদের জন্য কার্যকরী সাক্ষরতা

মানুষের কার্যকরী সাক্ষরতা জীবন চাহিদাভিত্তিক হতে হবে। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরণের সুযোগ সুবিধা নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে লক্ষ্য রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কার্যকরী সাক্ষরতার ব্যবস্থা করেছে, যা তথ্য বই পড়তে পারা, সরল বাক্যে লিখতে পারা এবং দৈনন্দিন হিসাব নিকাশ নির্ভুলভাবে করতে পারা। মিশনের কার্যকরী সাক্ষরতা শিক্ষার্থীদের গার্হস্থ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, পরিবার কল্যাণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, সমাজব্যবস্থা ও মৌলিক মানবাধিকার বিষয়ে সচেতন করে তোলা। উন্নয়ন ও পরিবর্তনের জন্য জটিল সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। ১১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারী পুরুষ এর আওতাভুক্ত। গ্রামভিত্তিক সাক্ষরতা কেন্দ্রে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়ে ৩০জন শিক্ষার্থী থাকে। মিশন প্রতিষ্ঠিত আট শতাধিক গণকেন্দ্রের মাধ্যমে এবং ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী'র আওতায় ৪৭,৯৭৭ জন লোক মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষার পাশাপাশি জীবন দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্ত হয়েছেন।[৯২] তাছাড়া জামালপুর জেলার জামালপুর সদর ও দেওয়ানগঞ্জ থানার ৬টি ইউনিয়নের মোট ৬২৬২জন শিক্ষার্থী সামাজিক সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।[৯৩] বরগুনায় এডুকেট

---

৮৯. *Towords a better Tomorrow 1989*, Dhaka Ahsania Mission,. P. 1; *ANNUAL REPORT-2003-04*, DHAKA AHSANIA MISSON

৯০. *Towords a better Tomorrow Dhaka, 1989*, Dhaka Ahsania Mission,. P. 4

৯১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

৯২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০

৯৩. *মিশন বার্তা, ২০০৫*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

টু এমপাওয়ার প্রকল্পে ৫৬০০ জন এবং কম্যুনিটি বেসড কন্টিনিউইং এডুকেশন প্রকল্পে ৩৬০০ জন সদস্যকে অব্যাহত শিক্ষা, জীবনমুখী কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।[৯৪] নরসিংদী জেলার রায়পুরায় ৩টি কমিউনিটি বেইজড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ২০০ জন বেকার যুবক-যুবতী ৬টি প্যারা ট্রেড কোর্সে প্রশিক্ষণ পেয়েছে।[৯৫] ইউনিয়নকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু করে ইউনিয়ন পর্যায়েই গণকেন্দ্রগুলোর দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য গঠিত কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারের সংখ্যা ১৩ থেকে ১৫তে উন্নীত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে ১৭৬৭৭ জন সদস্য।[৯৬]

গ. বিনা বেতনের প্রাথমিক শিক্ষা

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে মিশন ৮বছর ধরে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখে। এ কার্যক্রম কর্মজীবী ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য পরিচালিত। এখানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬শ এর অধিক। ঝরে পড়ার হার ২৫ শতাংশ।[৯৭]

ঘ. মাঠ পর্যায়ে মানবসম্পদ ও কারিগরী দক্ষতা প্রশিক্ষণ

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রে ও মাঠপর্যায়ে মিশনের সাক্ষরতা দলের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এতে দু'ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রয়েছে। একদিকে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ এবং অন্যদিকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ। এতে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।[৯৮]

ঙ. মসজিদভিত্তিক প্রাক ও মধ্য প্রাথমিক শিক্ষা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা। মিশন বিশ্বাস করে যে, দেশের হাজার হাজার মক্তবসমূহকে কাজে লাগিয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ত্বরান্বিত করা যায়। এতে হাজার হাজার ইমামকে শিক্ষকের দায়িত্ব দেয়া যায়। এ লক্ষ্যে মিশন ইমামদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে। মসজিদভিত্তিক বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়। ১৯৮৮ সালের তথ্যে দেখা যায় মিশন দেশের ৫টি জেলার ১৯টি থানায় ৩০০টি মসজিদ ভিত্তিক সাক্ষরতা কেন্দ্র এবং পরিপূরক বিদ্যালয় পরিচালনা করে।[৯৯]

চ. সমবায় ভিত্তিক কর্মকাণ্ড

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাক্ষরতা কেন্দ্রভিত্তিক সহযোগি দলকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল করতে নিজ উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে তোলে। এতে মাঠকর্মীরা গ্রামে পরিবর্তন আনয়নকারীর ভূমিকায় সাক্ষরতা কেন্দ্র ভিত্তিক মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক সমবায়ী দল গঠন করে। দলের সদস্যরা সামাজিক বৃত্তিগত দিক দিয়ে সমশ্রেণী ধরণের হয়। সাধারণত ৩০জন সদস্য নিয়ে এরূপ দল গঠিত হয়। দলের সদস্য নিজেরা নিজেদের নেতা নির্বাচন করে যেখানে একজন সভাপতি একজন সচিব ও একজন কোষাধ্যক্ষ থাকেন। সংগঠিত দলের মুখ্য কাজ হল নিয়মিত সাক্ষরতা কেন্দ্রে আসা এবং নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় করে তহবিল গঠন করা। উক্ত তহবিল থেকে সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া হয়। দলের সদস্যরা সপ্তাহে একবার মিলিত হয়ে নিজেদের

---

৯৪. *প্রাগুক্ত*
৯৫. *প্রাগুক্ত*
৯৬. *প্রাগুক্ত*
৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৯৮. *প্রাগুক্ত*
৯৯ . *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ স্বার্থ বিষয়ক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। মিশন দলের সদস্যদেরকে বিভিন্ন আয় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। ঋণ প্রাপ্তিতে মহিলারা অগ্রাধিকার পায়।[১০০]

ছ. শিশুশ্রম নিরসন

মিশন আইএলও আইপেক-এর সহযোগিতায় ঢাকা শহরের ২০টি থানায় ৮৪টি ওয়ার্ডে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিক, শিশু শ্রমিকদের অভিভাবক এবং কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে ৮৪টি মাল্টি পারপাস সেন্টারের মাধ্যমে ৭২৩৩ জন শিশুর মৌলিক শিক্ষা প্রদান করেছে যাদের পর্যায়ক্রমে সরকারি বা বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তি করানো হয়েছে। ইতোমধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিল এমন ১৩ বছর বয়সি ১৮০ জন শিশু শ্রমিককে ৮০টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রকল্পে শিশু, অভিভাবক ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের স্টকহোল্ডারসহ মোট ৩৬৩৫০ জনকে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেছে।[১০১]

জ. প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৫ সালে মিশন ১০টি বিষয়ে ২৯১টি ব্যাচে মোট ৬৮৮৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির অধীনে অধিকার ও আইন, সুশাসন এবং বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ৫৭০০৪ জনকে। অপরদিকে ড্যানিডা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ পেয়েছে ২৫২৭৮ জন এবং দিশারী প্রকল্পে ১৪২০৯ জন। বিভাগীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করেছে মোট ৯টি।[১০২]

ঝ. শিশুর যত্ন ও বিকাশ, প্রাথমিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক মাধ্যমিক শিক্ষা

"শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ" এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নরসিংদী, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার তিনটি থানার ১১টি ইউনিয়নে সিএল এপি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে।[১০৩] শিশুর প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য ২১৫০ জন মাকে এই প্রকল্পের অধীনে আনা হয়েছে।[১০৪] ৮৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রে ৩ থেকে ৫ বছর বয়সি ৬৬৪জন শিশুর সামাজিক, আবেগিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।[১০৫]

১৫টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৫-৬ বছর বয়সী ৩০০ শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট ৩৮৯১জন শিক্ষার্থী প্রকল্পভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৫ সালের জুলাই থেকে ৩বছরের জন্য বিকাশ নামে নতুন লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলেছে।[১০৬]

---

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
১০১. *প্রাগুক্ত*
১০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
১০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
১০৪. *প্রাগুক্ত*
১০৫. *প্রাগুক্ত*
১০৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ইমপ্রুভমেন্ট অব কোয়ালিটি এডুকেশন" নামের অন্য একটি প্রকল্পে মোট ৩৬৯৭ জন শিশু ও কিশোরী এবং ১৫০০ জন বয়স্ক শিক্ষার্থী গুণগত মৌলিক শিক্ষা অর্জন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে।[১০৭] এছাড়া যশোর ও নরসিংদী জেলায় ৬০০জন কিশোরীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।[১০৮] এই প্রশিক্ষণের ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা পরিবার তথা সমাজ উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারবে।

আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (Urban Comunity Learning Centre) প্রকল্পের আওতায় ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুর থানায় ৬০০ বস্তিবাসী ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু ২য় শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা লাভের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার মূল ধারায় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামে যুক্ত হবার সুযোগ পাচ্ছে। আরবান কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার দরিদ্র জনগণের ক্ষমতায়নের নিমিত্তে কার্যক্রম পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রতিপাদ্য বিষয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং বস্তিবাসীদের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধন এবং একই সঙ্গে সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেয়া। এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জনগণ হল নিরক্ষর, স্বল্প স্বাক্ষর, স্বাক্ষর পুরুষ মহিলা ও স্কুলের ড্রপআউট ছেলেমেয়েরা এবং বস্তির জনগণ।[১০৯]

ঞ. ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম

২০০৪ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীকে আরও গতিময় ও বিস্তৃত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে ১১০টি নতুন দল গঠিত হয়েছে এবং এসব দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৫৮৯৭জন নতুন সদস্য। বর্তমানে মোট দলের সংখ্যা ৯৯৩ এবং সদস্য সংখ্যা ৩৫৬৪৯জন। এ বছর ১২৮৬১ জনকে উদ্যোক্তা ঋণ দেয়া হয়েছে মোট ৩৮৯২০০০ টাকা। অপরদিকে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য ৯১জনকে ২৭৭০০০টাকা, স্যানেটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য ১৬৪৪ জনকে ১১৪৫৩৬০ টাকা, গৃহনির্মাণের জন্য ৪৯জনকে ১০,৯৫,০০০ টাকা এবং ৩৫৩জন বন্যার্তকে সুদবিহীন বিশেষ ঋণ ২৪০৩০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। মোট ঋণ গ্রহীতা ছিলেন ১৫২৫৬জন এবং মোট টাকার পরিমাণ ছিল ৮৩৮৫৪১৬০ টাকা।[১১০]

ট. পানি ও স্যানিটেশন

পানি ও স্যানিটেশন ক্ষেত্রে আহ্ছানিয়া মিশন উপকূলীয় ৮ জেলায় ২০০০ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন দেশের সর্ববৃহৎ প্রকল্পের জন্য সময় লাগে ২০০৪ সাল পর্যন্ত। এই প্রকল্পের আওতায় ৭৫ লক্ষাধিক লোক উপকৃত হয়েছে।[১১১] ২২ হাজার গভীর নলকূপ এবং ৩,২৬,২৩৩টি ল্যাট্রিন বসানো হয়েছে। মানুষের অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক হারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মিশনের আর একটি উদ্যোগ বিকেন্দ্রীকৃত সার্বিক স্যানিটেশন বা দিশারী প্রকল্প বাস্তবায়ন। প্ল্যান-বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় ২০০৪ সালের মার্চ মাসে ৩টি জেলার ৩ থানায় পরীক্ষামূলক এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রকল্পটি সাফল্যের সাথে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে এতে দাতা সংস্থা ওয়ার্টার এইড যুক্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে ৫ জেলার ৭টি থানায় প্রায় ১৮ লক্ষ উপকার ভোগীর জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।[১১২] ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ৩১ জুলাই ২০০৫ সিরডাপ মিলনায়তনে স্যানিটেশন বিষয়ক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক ২০১০ সালের মধ্যে সার্বিক স্যানিটেশন অর্জনের কৌশলগত বিকল্পসমূহ সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা পেশ করেন মিশনের

---

১০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
১০৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
১০৯. *প্রাগুক্ত*
১১০. *প্রাগুক্ত*
১১১. *প্রাগুক্ত*
১১২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

উপনির্বাহী পরিচালক এম এহছানুর রহমান। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০১০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার গৃহীত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলাধীন সীমান্তবর্তী ইউনিয়ন গোতামারী ইতোমধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে যেটি থানায় দ্বিতীয় শতভাগ অর্জনকারী ইউনিয়ন। এই সাফল্যে গোতামারী ইউনিয়ন পরিষদের ও ইউনিয়ন ওয়াটসন বা স্যানিটেশন এর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে ও দিশারী প্রকল্পের (ঢাকা আহছানিয়া মিশন, প্ল্যান বাংলাদেশ ও ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম- ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর যৌথ উদ্যোগ) কারিগরি সহযোগিতায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে।[১১৩]

ঠ. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ

নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে সর্বমহলে গণসচেতনতা সৃষ্টির যাবতীয় ব্যবস্থা ২০০৫ সালেও অব্যাহত ছিল। যশোরের ভেকুটিয়ায় ১৯৯৯ থেকে আগস্ট ২০০৫ পর্যন্ত মোট ১৫৪জনকে আশ্রয় ও বিভিন্ন সেবা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ৭৪জন মেয়ে শিশু, ৩৫জন বালক ও কিশোর এবং ৪৫জন বয়স্ক মহিলা। এদের মধ্যে ১৩০ জনকে তাদের পরিবারের সাথে পুনঃএকত্রীকরণ এবং ৮জনকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[১১৪] আগস্ট ২০০৫ শ্যামলীতে স্থাপিত একটি ট্রানজিট হোম স্থাপন করে মধ্যপ্রাচ্য ফেরত উটের ১৮জন শিশু জকিকে এবং তাদের কথিত বাবা-মাকে আশ্রয় দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করেছে। পাচার ও নির্যাতনের শিকার শিশু কিশোরী ও নারীদের মনো-সামাজিক পুনর্বাসনে মানসম্মত সহায়তা প্রদানের কারিকুলাম ও টুলকিট তৈরি হচ্ছে।[১১৫] এ বিষয়ে যথাযোগ্য নীতিমালা ও সেবা প্রদানকারীদের বিধিবদ্ধ প্রশিক্ষণ না থাকায় পাচার ও নির্যাতনের শিকার শিশু ও নারীদের প্রকৃত পুনর্বাসন সম্ভব হচ্ছে না।

দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক ইকুইটি সাপোর্ট কর্মসূচীর সহযোগিতায় এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গের বেসরকারি সংস্থা ডন বসকো আসালায়স-এর অংশীদারীত্বে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পাচার ও নির্যাতনের শিকার শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতির গুণগত মান উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় পাচার ও নির্যাতনের শিকার কিশোরী ও নারীদের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রমে নিয়োজিত বাংলাদেশের ৯টি এবং পশ্চিম বঙ্গের ৫টি সংস্থার মোট ২৫জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।[১১৬]

ড. মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও চিকিৎসা এবং এইচ আইভি সচেতনতা

মাদকাসক্তি প্রতিরোধের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ২০০৬ সালেও অব্যাহত রেখেছে। গাজীপুরে প্রতিষ্ঠিত মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটি ইতোমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। এতে ৬মাস মেয়াদী চিকিৎসা নিচ্ছেন এমন রোগীর সংখ্যা ৩৬।[১১৭] সম্প্রতি পুরানো ঢাকায় সূঁচের মাধ্যমে নেশা দ্রব্য গ্রহণকারীদের জন্য একটি নিরাময় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এরূপ নেশাগ্রস্থদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি। ইতোমধ্যে চিকিৎসার মাধ্যমে ৩১জন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা হয়েছে এবং বর্তমানে মোট ৭০জন চিকিৎসাধীন আছে। ফ্যামিলি হেলথ্ ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পুরানো ঢাকায় ৩২/৩৪ জনসন রোডে একটি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ কেন্দ্র থেকে সুবিধা

---

১১৩. *প্রাগুক্ত*
১১৪. *প্রাগুক্ত*
১১৫. *প্রাগুক্ত*
১১৬. *প্রাগুক্ত*
১১৭. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত ও হতদরিদ্র মাদকাসক্তদের বিনামূল্যে সর্ববিধ চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া এবং তাদের পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।[১১৮]

ঢ. বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন

বাংলাদেশ প্রায় প্রতি বছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পতিত হয়। এ অবস্থায় মিশন জরুরী ত্রাণ সাহায্য ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে মিশনের কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পিত যা উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নিয়মিত পূর্ণাঙ্গ ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করে। এই কর্মসূচী দুটি মেয়াদে পরিচালিত হয়। স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যের আওতায় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সুবিধার মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্রদের পুনর্বাসিত ও স্বাবলম্বী করা হয়।[১১৯] ২০০৪ সালের বন্যায় মিশন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় এগিয়ে যায়। নরসিংদী সদর, রায়পুরা, সান্দী ও মোহনাগঞ্জ এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০০ পরিবারের মধ্যে বীজ ও সার বিতরণের এক পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এসব পরিবার পরবর্তীতে শাক-সবজি ও অন্যান্য ফসল আবাদ করে বন্যার প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়।[১২০] ২০০৫ সালে ইউএনডিপি-র আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় জামালপুর জেলার বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ২৭২টি আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এছাড়াও মিশন আইএলও, আইপেক এর সহায়তায় ঢাকা শহরের বস্তি এলাকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার পরিবারের মধ্যে চাল, ডাল, আলু, দুধ, খাবার স্যালাইন বিতরণ করেছে।[১২১]

ণ. পরিবেশ উন্নয়ন ও বৃক্ষরোপণ

গণকেন্দ্র ও কমিউনিটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ পর্যায়ে উন্নত চুলা ব্যবহার ও বৃক্ষরোপন জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কেবল প্রান্তিক বর্গের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেই তার ভূমিকা সীমাবদ্ধ রাখেনি। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। উচ্চশিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে।[১২২] তাছাড়া তেজগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ বিভাগে ২০৩৩ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। খানবাহাদুর আহছানউল্লা ট্রেনিং কলেজও দক্ষতার সাথে মেধাবি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করে যাচ্ছে। আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউস বা বই বাজার ২০০৫ সালে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।[১২৩] বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের জন্য চিত্তাকর্ষক করে গড়ে তোলা হয়েছে। মিরপুরে প্রতিষ্ঠিত ভকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট যার ওয়ার্কিং চিলড্রেন বস্তিবাসী শিশুর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেয়।[১২৪] এছাড়াও ঢাকার শ্যামলীতে স্থাপিত সৈয়দ সাদাত আলী আহছানিয়া মিশন ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং এবং ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং-এ প্রশিক্ষণ দেয়।[১২৫]

ত. ক্যান্সার হাসপাতাল

মিরপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতালের বিশেষত হল স্বল্প পুঁজির মানুষকে সেবাদান এবং সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ প্রদান। তাছাড়া উত্তরায় নির্মিতব্য ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যানসার ও জেনারেল হাসপাতালের জন্য সমাজের দানশীল ব্যক্তিরা যেভাবে আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসেছেন তা অত্যন্ত আশাপ্রদ।[১২৬]

---

১১৮. *প্রাগুক্ত*
১১৯. *প্রাগুক্ত*
১২০. *প্রাগুক্ত*
১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
১২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
১২৩. *প্রাগুক্ত*
১২৪. *প্রাগুক্ত*
১২৫. *প্রাগুক্ত*
১২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯; *মাসিক আলাপ, নভেম্বর ২০০৫*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন; *মিশন বার্তা চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. ৩০, ৩১

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকাণ্ড অধিকতর উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত ও পরিচালিত। দেশের জাতীয় সাংস্কৃতিক বাস্তবতা ও জাতীয় চাহিদার সাথেও এর কর্মধারা সঙ্গতিপূর্ণ। সংস্থাটির পরীবিক্ষণ মূল্যায়ণ তৎপরতা ও জনপ্রচারণা ব্যাপকরূপ পায়নি। তথাপি এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় পেশাগত জ্ঞান দক্ষতার ব্যাপক অন্তর্ভূক্তি ও গতিশীল প্রয়োগ আছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি নিছক এনজিও কৌশল- ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে প্রচলিত ধারার তৎপরতা ভিত্তিক নয়, বরং অন্যান্য জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ চাহিদা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ত্রাণ পুণর্বাসনে সুদূর প্রসারী ও তাৎপর্যবাহী উদ্ভাবনামূলক কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থবহ এনজিওর সম্মান ও স্বীকৃতির অধিকারী হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দ্বীন সেবা সংস্থা

আদ্-দ্বীন[১২৭] বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংস্থা। সমাজের অবহেলিত এতিম শিশুদের পুনর্বাসন কর্মসূচীর মাধ্যমে জন্ম নেয়া সংস্থাটি আজ টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে অবদান রাখছে। সংস্থার অন্যতম লালিত স্বপ্ন গরীব ও সীমিত আয়ের লোকদের কম খরচে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয় সাশ্রয় ও উৎপাদনশীলতায় গতি সঞ্চারে সহায়ক ভূমিকা রাখা।[১২৮] স্বাস্থ্য খাতে মানব সম্পদের অপ্রতুলতা বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আদ্-দ্বীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সক্ষম মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে দেশের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরেছে। পুষ্টি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় আগামীদিনের সুস্থ সবল নাগরিক তৈরিতে এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজ গঠনেও আদ্-দ্বীন ভূমিকা রাখতে পারছে। এছাড়া সমাজের সুবিধা বঞ্চিতদের ক্ষুদ্র ঋণ ও আয়বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নে সহায়তা করে সার্বিকভাবে দেশীয় উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখছে।[১২৯] সমাজের অবহেলিত মহিলা ও শিশুদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত চিকিৎসা প্রদানে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। কারণ হাসপাতালের সেবার মান ও সেবামূল্য দেশের উন্নয়ণ ধারায় একটি "সৃষ্টিশীল নমুনা" হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। অন্যদিকে সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি ভিত্তিক সমন্বিত স্বাস্থ্য কর্মসূচীর সফলতার বিশেষ দিক হল, এর সয়ম্ভরতা। দাতা সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে নেয়া কর্মসূচী বর্তমানে আদ্-দ্বীনের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে যা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কর্মসূচীতে বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ক্রমবিকাশ

আদ্-দ্বীন একটি অলাভজনক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলীয় জেলা শহর যশোরের প্রাণকেন্দ্রে বিশিষ্ট শিল্পপতি, সমাজ হিতৈষী সেখ আকিজ উদ্দিনের প্রেরণায় এবং বিশিষ্ট সমাজসেবক খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শরীফ হোসেনের উদ্যোগে স্থানীয় এতিমদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে আদ্-দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। আদ্-দ্বীন প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সেখ আকিজ উদ্দিন নিজেই বলেছেন- "সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অসহায় ও করুণ অবস্থা আমি খুব ছোটবেলায় কাছ থেকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। গ্রামীণ দুঃখী মানুষের এ দুরবস্থা নিরসনে কিছু করার জন্য আমার মন তখন থেকে ব্যস্ত হয়ে ফিরতো। স্বপ্ন দেখতাম তাদের জন্য কিছু করার। আদ্-দ্বীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমার সেই স্বপ্ন ও আকাঙ্খার কিছুটা হলেও বাস্তবায়ন হয়েছে"।[১৩০]

আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে আদ্-দ্বীনের সামগ্রিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক ১৯৮২ সালে যশোর ২০৮/৮২ নং এবং আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ১৯৮৯ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগ, ১৯৯০ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ১৯৯০ সালে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ, ১৯৯০ সালে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক যথাক্রমে ১১৯/৮৯, ৩৪৭, পপঅ/এম,আই,এস/০৫/৮৯/৫৬৫নং এ নিবন্ধনভুক্ত হয়েছে। ডাঃ শেক মহিউদ্দিন আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের দাতাদের একজন। এছাড়াও তিনি আদ্-দ্বীন

১২৭. আদ্-দ্বীন সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ১৫ রেল রোড, যশোর
১২৮. *বাৎসরিক প্রতিবেদন ২০০০*, আদ্-দ্বীন, পৃ. ৫
১২৯. *প্রাগুক্ত*
১৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েলফেয়ার সেন্টারের নির্বাহী কমিটির সচিব এবং আদ্-দ্বীনের সকল কার্যক্রমের নির্বাহী পরিচালক। প্রাথমিকভাবে ছোট একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আদ্-দ্বীনের কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হলেও ক্ষুদ্র পরিসরের সেই আদ্-দ্বীন দো-চালার টিনের ঘর থেকে বেরিয়ে আজ তার কাজের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। মহিলা ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল, দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, দক্ষ সেবিকা তৈরির লক্ষ্যে সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দরিদ্র ও পিতৃহীন শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য শিশু কিশোর নিকেতন, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী এবং ছোট ছোট শিশুদের মধ্যে আত্মিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষাদান কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৩১]

বর্তমানে আদ্-দ্বীনের কর্মপরিধি উন্নয়নের অন্যান্য শাখায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও রাজবাড়ীসহ ৮টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বর্তমানে আদ্-দ্বীন একটি জাতীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে। সরকারি প্রচেষ্টার পাশপাশি এতদ্অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা সংস্থার মূল কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে মূলত সমাজের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যেই।[১৩২]

কার্যক্রম

সমাজের অসহায়, দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা ও কৌশল সামনে রেখে আদ্-দ্বীন তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ক. যশোর শহরের একটি ভাড়া বাড়িতে ১০জন দরিদ্র অসহায় শিশুর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আদ্-দ্বীন শিশু কিশোর নিকেতনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে বর্তমানে প্রায় ছয় শতাধিক অসহায় এতিম শিশুর লালন-পালনসহ আধুনিক শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে এই নিকেতনের নিজস্ব জায়গা ও ভবন আছে।[১৩৩]

খ. দরিদ্র, অসহায় মুসলিম ছেলেমেয়েদের সহীহ্ কোরআন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে আদ্-দ্বীন ফোরকানিয়া প্রকল্প চালু করা হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত যশোর সদর ও শার্শা থানার ২৬৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২৮০০জন কিশোর কিশোরীকে সহীহ কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[১৩৪]

গ. সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব সেখ আকিজ উদ্দিন যশোর শহরের রেল রোডে একতলা বাড়িসহ এক একর জমি দান করেন এবং এ বাড়িতেই ১৯৮৫ সালে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের প্রথম শাখার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে মাত্র দু'জন কর্মীর মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের শুধু বহির্বিভাগে সেবা প্রদান করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার আধুনিক ব্যবস্থাসহ চিকিৎসার সবধরণের সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে এটি দক্ষিণবঙ্গের মহিলা ও শিশুদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হয়। সবার সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে ঢাকায় ও ১৯৯৯ সালে কুষ্টিয়ায় অনুরূপ দুটি হাসপাতাল চালু করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় আদ্-দ্বীন ফ্লিড হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করা হয়। এছাড়া ২০০৪ সালে যশোরের পুলেরহাটে ৪০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল এবং খুলনায় ও নড়াইলে হাসপাতাল স্থাপনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[১৩৫]

---

১৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯
১৩২. *প্রাগুক্ত*
১৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
১৩৪. *প্রাগুক্ত*
১৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. প্যারামেডিক ও টিবিএদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৯০ সাল থেকে মহিলা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার মৌলিক প্রশিক্ষণ, ধাত্রী প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা প্রশিক্ষণসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল ধরণের প্রশিক্ষণ এ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে যশোরের আদ্-দ্বীন হাসপাতাল সংলগ্ন পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবনে সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রের মাধমে ১৯৯৭ সালে আদ্-দ্বীন নার্সিং স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়।[১৩৬]

ঙ. যশোর সদর থানার বলরামপুর গ্রামে ১৯৮৯ সালে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপন করে গ্রামীণ এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। ১৯৯০ সালে যশোর সদর থানার দু'টি ইউনিয়ন ও ঝিগরগাছা থানার ৩টি ইউনিয়নে, ১৯৯১ সালে শার্শা, যশোর সদর, বাঘারপাড়া, ও কেশবপুর থানায় এই কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ২০০৪ সাল থেকে অভয়নগর, চৌগাছা, মাগুরা সদর, শ্রীপুর ও শালিখা থানায় শুধুমাত্র স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্যারামেডিকগণ মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দিয়ে থাকেন।[১৩৭]

চ. যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের একাংশে সংস্থার কর্ম এলাকার মারাত্মক পুষ্টিহীন শিশুদের জন্য ১৯৯১ সালে একটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এখানে একসাথে ১০জন মারাত্মক পুষ্টিহীন শিশুর বিনামূলে চিকিৎসা ও থাকা খাওয়ার সকল সুবিধা রয়েছে। ১৯৯৮ সালে ঢাকা আদ্-দ্বীন হাসপাতালে ২০ শয্যা বিশিষ্ট অনুরূপ একটি পুষ্টি ইউনিট খোলা হয়েছে। এছাড়া অপুষ্ট শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করা ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইউনিট অফিসের কার্যএলাকায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।[১৩৮]

ছ. স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে কর্মএলাকার অনগ্রসর মহিলাদের সংগঠিত করে বিভিন্ন ধরণের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বর্তমানে প্রায় ৬০ হাজার সদস্য এই কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করছে। ১৯৯১ সালে গ্রামীণ নারী উন্নয়ণ ও ঋণ কার্যক্রম শুরু হয়।[১৩৯]

জ. কর্মএলাকায় ডায়রিয়াসহ অন্যান্য পানিবাহিত রোগের হাত থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্যে ১৯৯১ সাল থেকে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে ৪টি গ্রামীণ স্যানিটেশন সেন্টার স্থাপন করে সেখান থেকে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণ করা হচ্ছে।[১৪০]

ঝ. প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে ১৯৯৩সালে ১টি অফসেট প্রিন্টিং প্রেস এবং ১৯৯৪ সালে ১টি ডেইরী ফার্ম স্থাপন করা হয়েছে।[১৪১]

ঞ. এলাকার দরিদ্র শিশু কিশোরদের শিক্ষার জন্য ব্র্যাকের সহযোগিতায় ১৯৯৫ সাল থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০০৩ সালে ১৬টি উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮০জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।[১৪২]

ট. দেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য ১৯৯৯ সালে যশোরে 'সখিনা গার্লস স্কুল' এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এখানে ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণীতে ১০৪জন ছাত্রী অধ্যয়নরত।[১৪৩]

---

১৩৬. *প্রাগুক্ত*
১৩৭. *প্রাগুক্ত*
১৩৮. *প্রাগুক্ত*
১৩৯. *প্রাগুক্ত*
১৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
১৪১. *প্রাগুক্ত*
১৪২. *প্রাগুক্ত*
১৪৩. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৩*, আদ্-দ্বীন, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

ঠ. ঘাতক ব্যাধি এইডস্-এর সংক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে আসার লক্ষ্যে আদ্-দ্বীন ২০০০ সাল থেকে প্রতিরোধ প্রকল্পের কাজ শুরু করে। এইডস্ এর প্রাথমিক চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সতর্কতা, সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বর্তমানে যশোর শহর, বেনাপোল, নওয়াপাড়া, সাতক্ষীরা, মাগুরা ও গোয়ালন্দ এলাকায় আদ্-দ্বীন এইডস্ প্রতিরোধকল্পে ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে।[১৪৪]

ড. জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ২০০৩ সাল থেকে ভ্রাম্যমান চক্ষুসেবা কার্যক্রম চালু করেছে। মোবাইল টিমের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মসূচীতে রয়াল কমনওলেথ সোসাইটি ফর দ্যা ব্লাইন্ড/সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনাল সহযোগিতা করছে। এছাড়া যশোরে ২০০৩ সালে একটি পৃথক এবং পরিপূর্ণ আদ্-দ্বীন চক্ষু হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০০৪ সালে নড়াইলে আরো একটি চক্ষু হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[১৪৫]

ঢ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে সীমিত কর্মসূচী নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল যে আদ্-দ্বীনের সময়ের দাবী পূরণার্থে দানশীলতার সেই ক্ষুদ্র ধারা আজ রূপ নিয়েছে বহুমুখী উন্নয়ণ কর্মসূচীতে। ১৯৮০ সালে যেখানে কর্মী ছিল মাত্র দুজন সেখানে ২০০৩ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৬৪তে উন্নীত হয়েছে।[১৪৬] জনগণের সহযোগিতা এবং আদ্-দ্বীনের কর্মীবাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অশিক্ষা, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা ও কুসংস্কারের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাবে আমাদের এই অনগ্রসর সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং তা দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য সেবা আদ্-দ্বীনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দারিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের কম খরচে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা দেয়া। প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা দান, বিশেষতঃ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা যাতে তারা উন্নততর স্বাস্থ্য অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে এবং সংস্থার কর্ম এলাকার জনগণের দোর গোড়ায় প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো।[১৪৭]

যশোর শহরে টিনের একটি দো-চালা বাড়িতে ১৯৮৫ সালে সংস্থার স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। যাত্রালগ্নে ২জন ডাক্তার মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর সেই টিনের বাড়িটি বর্তমানে মহিলা ও শিশুদের জন্য দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে যশোর জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র স্থাপন ও গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা হয়। শুরু থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য কার্যক্রম স্থানীয় দাতাদের বিশেষতঃ আকিজ পরিবারের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হয়েছে।

১৯৯০ সালে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত কর্ম এলাকায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের অংশবিশেষ দাতা সংস্থা যুক্তরাজ্যের ওডিএ (বর্তমানে ডিএফআইডি) এনজিও প্রকল্পের অর্থে এবং পরবর্তীতে বিপি এইচসি, সেভ দি চিলড্রেন ইউকে, সাইট সেভারস ইন্টারন্যাশনাল কেয়ার ও সংস্থার নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হচ্ছে।[১৪৮]

---

১৪৪. *প্রাগুক্ত*
১৪৫. *প্রাগুক্ত*
১৪৬. *প্রাগুক্ত*
১৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
১৪৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতাল ভিত্তিক মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রম

দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, অসহায় মানুষের স্বাস্থ্যের মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পৌঁছানোর মিশন নিয়েই আদ-দ্বীন হাসপাতালের যাত্রা শুরু। স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় হাসপাতালের মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের মানসম্মত সেবা দেয়া এবং দেশের সকল ধর্ম ও বর্ণের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদেরকে সংস্থার স্বাস্থ্য সেবার আওতায় এনে মৃত্যু ও অসুস্থতার হার কমাতে সাহায্য করা সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এ লক্ষ্যে ২০০৩ সাল পর্যন্ত যশোর, ঢাকা ও কুষ্টিয়ায় তিনটি শাখার মাধ্যমে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের কার্যক্রম চালু রয়েছে। এছাড়া নড়াইল ও যশোর পুলের হাটে আদ্-দ্বীন হাসপাতালের আরো দু'টি শাখার প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।[১৪৯]

আদ্-দ্বীন হাসপাতাল যশোর

যশোর শহরের রেল রোডে অবস্থিত টিনের দো-চালা বাড়িটি বর্তমানে মহিলা ও শিশুদের জন্য আদ্-দ্বীন হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে শুধুমাত্র বহির্বিভাগের মাধ্যমে এ হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে এখানে বহিঃ ও অন্ত উভয় বিভাগের কার্যক্রম চালু হয়। ১২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে মহিলাদের জন্য ৬০টি শয্যা এবং শিশুদের জন্য ৬০টি শয্যা আছে। শিশুদের ৩০টি শয্যার মধ্যে ১০টি শয্যার পুষ্টি ইউনিটের জন্য নির্ধারিত। এছাড়া এখানে সাধারণ ওয়ার্ড, প্রসব ওয়ার্ড, পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড, কেবিন, ২টি অপারেশন থিয়েটার এবং ফার্মেসীর ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য যশোর কারবালা রোডে একটি ভাড়া করা বাড়িতে বর্তমানে শিশুদের জন্য নির্ধারিত ৬০ শয্যা চালু হয়েছে যা আদ্-দ্বীন হাসপাতালের শিশু বিভাগ নামে পরিচিত।[১৫০]

সেবার ধরণ

ক. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আদ্-দ্বীন হাসপাতালের মাধ্যমে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় স্তরের সেবা প্রদান করে থাকে।

খ. প্রাথমিক স্তরের মধ্যে রয়েছে সাধারণ চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গর্ভনিরোধের জন্য পরামর্শ ও উপকরণ বন্টন, টিকাদান, গ্রোথ মনিটরিং, স্বাস্থ্যশিক্ষা এবং ঔষধ সরবরাহ।

গ. মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে রয়েছে গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা ও জরুরি প্রসূতি সেবা, সব ধরণের শিশুরোগ ও স্ত্রীরোগের চিকিৎসা এবং বিভিন্ন প্রকার অপারেশনসহ মারাত্মক অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসা সেবা।

ঘ. এছাড়া এখানে ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি, বায়োকেমিক্যাল ও সেরোলজিক্যাল পরীক্ষার সাথে রেডিওলজি, আল্ট্রাসনোগ্রাম এবং ইসিজি'র মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।[১৫১]

সাধারণ চিকিৎসা ইউনিট

মহিলা ও শিশুদের যেকোন সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য আদ্-দ্বীন হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে অভিজ্ঞ মহিলা ও শিশু চিকিৎসক রয়েছেন যারা প্রতিদিন গড়ে ৩৫০-৪০০জন মহিলা ও শিশুকে সাধারণ চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে।[১৫২]

---

১৪৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
১৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
১৫১. *প্রাগুক্ত*
১৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

অপারেশন ইউনিট

এখানে কম খরচে ছোট বড় সকল প্রকার অপারেশন (স্ত্রীরোগ, প্রসূতি, সাজরী, খাত্না, ডিএন্ডসি ইত্যাদি) করার ব্যবস্থা রয়েছে। ২টি অপারেশন থিয়েটার সব সময়ের জন্য খোলা থাকে।[১৫৩]

নিরাপদ প্রসব ইউনিট

গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ প্রসব এর জন্য আদ্-দ্বীন হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এখানে একটি নিরাপদ প্রসব ইউনিট আছে এটি সব সময়ের জন্য খোলা থাকে। এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জরুরী যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। প্রতিদিন গড়ে ৫-৮জন গর্ভবতী মহিলার এখানে নিরাপদ প্রসব হয়ে থাকে।[১৫৪]

পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র

আদ্-দ্বীন হাসপাতালে রয়েছে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে ভর্তিকৃত মারাত্মক অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের থাকা খাওয়াসহ বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয় এবং তাদের মায়েদের জন্যও বিনামূল্যে হাসপাতালে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।[১৫৫]

শাট্ল বাস সার্ভিস

যশোর জেলার প্রত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অসুস্থ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'রোগী পরিবহন' নামে একটি শাট্ল বাস সার্ভিস ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে চালু রয়েছে। প্রতিমাসে গড়ে ৪৭৫ জন রোগী এই পরিরহনে এসে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।[১৫৬]

হাসপাতালের বিশেষত্ব

যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতাল দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শুধুমাত্র মহিলা ও শিশুদের জন্য সর্ববৃহৎ হাসপাতাল। ইতোমধ্যে হাসপাতালের কার্যক্রম এ অঞ্চলের স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে মানসম্মত চিকিৎসার জন্য ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সড়ক ও রেলপথের সাথে সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে দূর দূরান্তের মানুষ খুব সহজেই হাসপাতালে আসা যাওয়া করতে পারেন। আদ্-দ্বীনের কর্ম এলাকা থেকেও প্রতিদিন অনেক রোগী এখানে আসে। হাসপাতালের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এখানে ৯০% এর বেশি মহিলা কর্মী রয়েছেন যারা চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে হাসপাতালটি পরিচালনা করেন। আদ্-দ্বীন হাসপাতালে স্বল্প ব্যয়ে মানসম্মত সেবার ব্যবস্থা থাকায় হাসপাতালটি সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।[১৫৭] সে কারণে হাসপাতালের গ্রহণযোগ্যতা এবং রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০০-৩৫০ জন রোগীকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। এছাড়া প্রতিদিন গড়ে ৮০-৮৫জনকে গর্ভকালীন সেবা ও ৮জনকে প্রসবোত্তর সেবা এবং ৭০জনকে টিকা দেয়া হয়। আর এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯০ সালে ইউনিসেফ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু বান্ধব হাসপাতাল হিসেবে ঘোষণা করে।[১৫৮]

আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, ঢাকা

দুঃস্থ নারী ও শিশুদের সেবাদানের মাধ্যমে বহির্বিভাগে ১৯৯৭ সালে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, ঢাকা শাখার কার্যক্রম শুরু হয়। মহিলা ও শিশুদের জন্য এটি আদ্-দ্বীন হাসপাতালের দ্বিতীয় শাখা। হাসপাতালটির অবস্থান ২, বড় মগবাজার। যুক্তরাজ্যের "Save the Children"-এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে

---

১৫৩. *প্রাগুক্ত*
১৫৪. *প্রাগুক্ত*
১৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
১৫৬. *প্রাগুক্ত*
১৫৭. *প্রাগুক্ত*
১৫৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হাসপাতালটি পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৮ সালে এখানে অন্তঃবিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। এ সালেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রি হাসপাতালটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ ঢাকা শহরের স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য এটি একটি বৃহৎ আধুনিক হাসপাতাল। ২০০৩ সালে হাসপাতালের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটে। ২৯২ শয্যা বিশিষ্ট এ হাসপাতালের ১১৬ শয্যা শিশুদের ও ১৭৬ শয্যা মহিলাদের জন্য। এখানেও সাধারণ কেবিন ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনের ব্যবস্থা রয়েছে। হাসপাতাল এবং হাসপাতালের পাশ্ববর্তী এলাকায় ডাক্তার ও নার্সদের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এ হাসপাতালে বহির্বিভাগ মহিলাদের জন্য রয়েছে গর্ভকালীন সেবা ইউনিট, প্রসূতি সেবা ইউনিট, পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট, স্ত্রীরোগ ইউনিট এবং সার্জারি ও মেডিসিনের সাধারণ চিকিৎসা ইউনিট এবং শিশু বিভাগে রয়েছে শিশু রোগ চিকিৎসা ইউনিট, গ্রোথ মনিটরিং ইউনিট, ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার। এছাড়া বহির্বিভাগে দন্ত ও চক্ষু বিভাগ রয়েছে।[১৫৯]

অন্তঃবিভাগে মহিলাদের জন্য নিরাপদ প্রসব ইউনিট, পোস্ট অপরেটিভ ইউনিট, ভর্তিকৃত সাধারণ রোগীদের ইউনিট এবং শিশুদের জন্য পুষ্টি ইউনিট, ডায়রিয়া ইউনিট, সাধারণ রোগী ইউনিট এবং নবজাতক সেবা ইউনিট রয়েছে। রোগ পরীক্ষা নিরীক্ষা বিভাগে রয়েছে প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি, এন্ডস্কপি, কলপোস্কোপি এবং সিটিজি। এছাড়াও রয়েছে ২টি ফার্মেসি, ১টি ফ্রুটস কর্ণার এবং 'মায়ের ছোঁয়া' নামে একটি আধুনিক মানের ক্যাফেটরিয়া। এ হাসপাতালেও সবার সাধ্যের মধ্যে মানসম্মত সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এখানে ৩৫২ জন কর্মীর মাধ্যমে মহিলা ও শিশুদের জন্য সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবার কাজ পরিচালিত হচ্ছে।[১৬০]

যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ন্যায় এ হাসপাতালটিও মহিলা ও শিশুদের জন্য একই ধরণের সেবা দিয়ে আসছে। বিশেষ করে নিরাপদ প্রসব, ছোট বড় অপারেশন, সাধারণ চিকিৎসা, গর্ভকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা, বিনামূল্যে অপুষ্ট শিশুদের চিকিৎসা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, স্বাস্থ্যশিক্ষা, বুকের দুধের উপর কাউন্সেলিং, প্রায় সব ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৪০০-৫০০ জন রোগীকে বহির্বিভাগের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে হাসপাতালটি ঢাকাসহ আশেপাশের জেলাগুলোর স্বল্প আয়ের মানুষের মধ্যে বেশ পরিচিত লাভ করেছে।[১৬১]

আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, কুষ্টিয়া

১ নভেম্বর ১৯৯৯ আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, কুষ্টিয়া নিজস্ব জায়গায় যাত্রা শুরু করে। কুষ্টিয়া শহরের থানা পাড়ার ১৯/১ চাঁদ মোহাম্মদ রোডে এই হাসপাতালটি অবস্থিত। এটি আদ্-দ্বীনের তৃতীয় শাখা। ২০০০ সাল থেকে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগে এবং ২০০১ সাল থেকে অন্তঃবির্ভাগের কার্যক্রম চালু হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত এখানে মহিলা ও শিশুদের জন্য ২০টি শয্যা ছিল। ২০০৪ সালে ৬৫টি মহিলা শয্যা এবং ৩৫টি শয্যা শিশু, মোট ১০০ শয্যাবিশিষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলা ও শিশু হাসপাতালে রূপান্তরিত করার কাজ শেষ হয়েছে। এখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিন ২৩টি এবং ৪টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। এছাড়া এখানে ৪তলা বিশিষ্ট নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। এই ট্রেনিং সেন্টারে ১২০ জন ছাত্রী নার্স অধ্যয়নের ব্যবস্থা।[১৬২]

বর্তমানে এ হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ চালু আছে। এবং মহিলা ও শিশুদের জন্য সাধারণ চিকিৎসা, গর্ভকালীন সেবা, প্রসূতিসেবা, ছোট-বড় অপারেশন, প্যাথলজি ও আলট্রাসনোগ্রাম এর ব্যবস্থা রয়েছে।

---

১৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪
১৬০. *প্রাগুক্ত*
১৬১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
১৬২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দ্বীন ফিল্ড হাসপাতাল, শার্শা, যশোর

গ্রামীণ এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের নভেম্বর মাসে যশোর শার্শা উপজেলায় আদ্-দ্বীন ফিল্ড, হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়। এখানে শুধুমাত্র বহির্বিভাগে মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা রয়েছে এবং ২০০৪ সালে আন্তর্বিভাগ চালু হয়। এখানে সাধারণ চিকিৎসা গর্ভকালীন সেবা, গ্রোথ মনিটরিং, ইপিআই সেশন, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা এবং জটিল রোগীদের যথাযথ স্থানে রেফারের ব্যবস্থা থাকবে।[১৬৩]

পুষ্টি পুনর্বাসন কার্যক্রম

আদ্-দ্বীন স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় পুষ্টি পুনর্বাসন কর্মসূচী একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। মা ও শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করাই এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য। মারাত্মক অপুষ্ট শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য ঢাকা হাসপাতালে ২০ শয্যার একটি পুষ্টি ইউনিট এবং যশোর হাসপাতালে ১০ শয্যার একটি পুষ্টি পুনর্বাসন ইউনিট রয়েছে। এছাড়া যশোর, নড়াইল ও মাগুরা জেলায় আদ্-দ্বীনের মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে পুষ্টি পুনর্বাসনের কাজ অব্যাহত আছে।[১৬৪]

বাংলাদেশের শিশুদের শতকরা প্রায় ৪৬ জনই আমিষ শক্তির অভাব জনিত রোগের শিকার। শুধুমাত্র অপুষ্টিজনিত কারণে এদেশে প্রতি বছর ৫ বছরের কম বয়সী আড়াই লাখ শিশু মারা যায়। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে পুষ্টির স্বীকৃত মান অনুযায়ী এদেশের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে মাত্র ৬ শতাংশ পর্যাপ্ত পুষ্টি গ্রহণ করছে। বাকী ৯৪ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। গ্রাম অঞ্চলে এই অবস্থা আরো ভয়াবহ। এই অবস্থার অবসানকল্পে ১৯৯১ সালে যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের শিশু বিভাগে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও সংস্থান কেন্দ্র। সংস্থার কর্ম এলাকার মারাত্মক পুষ্টিহীন শিশুদের এখানে পুনর্বাসন করা হয়।

বর্তমানে সেখানে একসাথে ১০জন পুষ্টিহীন শিশু ও তাদের মায়েদের বিনামূল্যে থাকা খাওয়া ও সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। এই কেন্দ্রে ১৯৯১ সালে ৫৪ জন, ১৯৯২ সালে ১৫২ জন, ১৯৯৩ সালে ১২৫ জন, ১৯৯৪ সালে ৯৭ জন, ১৯৯৫ সালে ১০৫ জন, ১৯৯৬ সালে ৯০ জন, ১৯৯৭ সালে ৮১ জন, ১৯৯৮ সালে ১০৭ জন, ১৯৯৯ সালে ১৩০ জন, ২০০০ সালে ১১৫ জন, ২০০৩ সালে ৪১ জন অপুষ্ট শিশুকে ভর্তি করা হয়।[১৬৫]

১৯৯৮ সালে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, ঢাকাতে ২০ শয্যা বিশিষ্ট আরো একটি পুষ্টি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে যেখানে চমৎকার শিশুবান্ধব এবং পারিবারিক পরিবেশ রয়েছে। এখানেও অপুষ্ট শিশুদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা দেয়া হয়। অধিকাংশ অপুষ্ট শিশুদের ১৫ থেকে ২০ দিন ইউনিটে থাকতে হয়। তবে মারাত্মক অপুষ্ট শিশুদের কখনো দেড়মাস থেকে দু'মাসও এখানে রেখে সরাসরি স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়। ভর্তিকৃত শিশুদের অপুষ্টি দূর করে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য বয়স ভেদে খাদ্য সময় নির্দেশিকা অনুযায়ী ২ঘণ্টা পর পর পুষ্টিকর খাদ্য দেয় হয়।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য বয়সানুযায়ী দোলনার ব্যবস্থা আছে। শিশু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেই কেবল ইউনিট থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। শুধু ছাড়পত্র দিলেই ইউনিটের কাজ শেষ হয় না। ফলোআপেরও ব্যবস্থা আছে। ফলোআপের সময়ও শিশুর অপুষ্টিজনিত যেকোন সমস্যার চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। ঢাকা হাসপাতালের এই পুষ্টি ইউনিটের মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে ৩৫৪ জন শিশু, ১৯৯৯ সালে ৩০৫ জন শিশু, ২০০০ সালে ৩১৩জন শিশু ২০০৩ সালে ২২৯ জন অপুষ্ট শিশু চিকিৎসা সেবা পেয়েছে।[১৬৬]

---

১৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১
১৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২
১৬৫. *প্রাগুক্ত*
১৬৬.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

এইচ আইভি প্রতিরোধে কার্যক্রম

মরণব্যাধি এইডস এর সংক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য আদ্-দ্বীন ২০০১ সাল থেকে এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু করে। কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় এসটিআই রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সতর্কতা, সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বর্তমানে যশোর মাগুরা, সাতক্ষীরা ও রাজবাড়ি জেলায় এইড্স প্রতিরোধ কার্যক্রমের ব্যাপক কাজ চলছে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য হল যশোর শহর, বেনাপোল, নওয়াপাড়া, সাতক্ষীরা মাগুরা ও দৌলদিয়া অঞ্চলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদ যৌন আচরণে অভ্যাসগত পরিবর্তনের মাধ্যমে যৌন রোগ/এইচআইভি/এইড্স সংক্রমণের হার কমিয়ে আনা। বর্তমানে ৪জন ডাক্তার ৪জন মেডিকেল এ্যাসিস্টেন্ট, ২জন নার্স এবং ৯৬ জন মাঠকর্মীর মাধ্যমে কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে।[১৬৭]

এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল-

ক. স্থায়ী, অস্থায়ী এবং ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের মাধ্যমে এসটিআই রোগের মানসম্মত সেবা প্রদান।

খ. টার্গেট কমিউনিটিতে নিরাপদ যৌন আচরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ. এইচআইভি প্রতিরোধের উপর প্রশিক্ষণ ও এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে আচরণগত পরিবর্তন আনয়ণ করা।

চক্ষুসেবা কার্যক্রম

জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে চক্ষু চিকিৎসাকে সহজতর করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালের জুলাই মাস থেকে আদ্-দ্বীন যশোর, নড়াইল, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ অঞ্চলে ভ্রাম্যমান ক্লিনিক ও স্থায়ী ক্লিনিকের মাধ্যমে চক্ষুসেবা কার্যক্রম চালু করেছে। এই কার্যক্রমটি আদ্-দ্বীন চক্ষুসেবা প্রকল্প হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।[১৬৮]

প্রকল্পটিতে আরসি এসবি সাইট সেভারস্ ইন্টারন্যাশনাল সহযোগিতা করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ভ্রাম্যমান অপারেশন থিয়েটার এবং বেজ হাসপাতালের মাধ্যমে মানসম্মত চক্ষুসেবা দেয়া। এ প্রকল্পের বর্তমান লক্ষ্য হল ৩ বছরের মধ্যে ৬০০০ ছানি অপারেশন করা।

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জেলার প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভ্রাম্যমান অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন করা হয়। অপারেশনের নির্দিষ্ট দিনের আগেই সংশ্লিষ্ট কর্ম এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোগী দেখে মেডিকেল অফিসার ছানি রোগী সনাক্ত করেন। সনাক্তকরণের পরই এসব রোগীদের ভ্রাম্যমাণ অপারেশন থিয়েটারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়।[১৬৯] প্রকল্পের নির্দিষ্ট কাজগুলো হল-

ক. যশোর ঝিনাইদহ ও নড়াইলের ১৭টি থানায় ৩ মাসে রোটেশন অনুযায়ী ভ্রাম্যমান চক্ষু ক্যাম্প অনুষ্ঠিত করা।

খ. প্রাথমিক চক্ষুসেবা এবং ছানি রোগী সনাক্তকরণের উপর সরকারি এবং এনজিও কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ. প্রতি সপ্তাহে বেজ হাসপাতালে আই ও এল এবং চোখের অন্যান্য অপারেশনের ব্যবস্থা করা। এবং ভ্রাম্যমাণ চক্ষু রিফ্রাকশন ইউনিটের মাধ্যমে চোখের রিফ্রাকশন সেবা দেয়া।[১৭০]

---

১৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪
১৬৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬
১৬৯. *প্রাগুক্ত*
১৭০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত স্বাস্থ্য ও ঋণ কর্মসূচী

সমন্বিত স্বাস্থ্য ও ঋণ কর্মসূচী আদ্-দ্বীনের অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। কমিউনিটিতে স্বাস্থ্য ও ঋণ কার্যক্রম একইসাথে সফলভাবে পরিচালনা আদ্-দ্বীনের অন্যতম অর্জন যা বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে মডেল হিসেবে দেখছেন উন্নয়ন বিশেষজ্ঞগণ। সমন্বিত স্বাস্থ্য ও ঋণ কর্মসূচী নিম্নোক্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

১. কমিউনিটিভিত্তিক মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ।

২. গ্রামীণ নারী উন্নয়ন ও ঋণ কার্যক্রম।

৩. পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম।[১৭১]

কর্মসূচীর লক্ষ্য

ক. কর্ম এলাকার জনগণের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় সকল স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দিয়ে মা ও শিশুর অসুস্থতা ও মৃত্যুর হার কমানো।

খ. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষমতায়ণে সহায়তা করা অর্থাৎ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং তাদেরকে সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী করে সৃষ্টিশীল জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলা।[১৭২]

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য

ক. সমন্বিত স্বাস্থ্য ও ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদেরকে প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

খ. কর্মএলাকার দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও ঋণ যোগান দিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো যাতে তারা নিজেরাই তাদের আর্থিক অবস্থার ক্রমাগত উন্নয়ন করতে পারেন।

গ. অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত ও একতাবদ্ধ করে তাদেরকে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিকভাবে শক্তিশালী ও ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধ করা।

ঘ. বর্তমানে সমন্বিত কর্মসূচী যশোর, মাগুরা, নড়াইলের ১২টি থানায় ১০৭টি ইউনিয়নের ৭৭১ টি গ্রামে বিস্তৃত আছে। প্রায় ৫০০ জন কর্মী এ কর্মসূচীর সাথে জড়িত। এর মধ্যে পুরুষ ২০% এবং মহিলা ৮০% জন।[১৭৩]

কমিউনিটি ভিত্তিক মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম

যশোর জেলার সদর থানার কচুয়া ও নরেন্দ্রপুর ইউনিয়নে ১৯৯০ সালে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রম প্রথম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা থানায় ১৯৯৯ সালে কেশবপুর, বাঘার পাড়া, শার্শা এবং যশোর সদর থানার বাকি অংশে কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০৪ সালে যশোর জেলার চৌগাছা ও অভয়নগর উপজেলায়, মাগুরা জেলার মাগুরা সদর, শালিখা ও শ্রীপুর উপজেলা এবং নড়াইল সদর থানায় সংস্থার নিজস্ব অর্থে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিপি, এইচসি ১৯৯১ সালে যশোর সদরের ২টি ইউনিয়নে এবং ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত যশোর সদর, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছা থাকায়, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত শার্শা, বাঘারপাড়া ও কেশবপুর থানায় কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা দিয়ে আসছে।[১৭৪]

---

১৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯
১৭২. *প্রাগুক্ত*
১৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০
১৭৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

যশোর সদর মনিরামপুর এবং ঝিকরগাছা থানায় এ কার্যক্রম সংস্থার নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের টার্গেট গ্রুপ হল কমিউনিটির সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মহিলা ও শিশু। এবং উদ্দেশ্য হল পরিবারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে-

ক. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

খ. জনগণকে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

গ. স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌছে দেয়া।

ঘ. রেফারেন্স পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি সেবাদান কেন্দ্রে উন্নত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা এবং

ঙ. সমন্বিত উন্নয়ন সেবা প্রদান ও স্থায়ীত্বশীল একটি স্বাস্থ্য অবকাঠামো তৈরিতে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা।[১৭৫]

সেবা প্রদান পদ্ধতি

আদ্-দ্বীন পরিচালিত মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা সেবা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে–

ক. কর্ম এলাকাতে প্রতি মাসে গড়ে ৩৬৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ২৩জন প্যারামেডিক স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে গর্ভকালীন সেবা, প্রসূতি সেবা, গ্রোথ মনিটরিং, কম অসুস্থ মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা দেন এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণসমূহ বিতরণ করেন।

খ. সংস্থার ২৬টি ইউনিটের মধ্যে ২৩টি ইউনিট অফিসে ক্লিনিক রয়েছে। এখানেও একই সেবা দেয়া হয়। আশংকাজনক রোগীদের এসকল ক্লিনিক থেকে হাসপাতালে রেফার করা হয়।

গ. আদ্-দ্বীনের স্বাস্থ্যকর্মীরা রাড়ি বাড়ি পরিদর্শন ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ, পরামর্শ, স্বাস্থ্য শিক্ষা দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ, খাবার স্যালাইন এবং ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল সরবরাহ করেন। স্বাস্থ্য শিক্ষায় গর্ভকালীন সেবা, নিরাপদ প্রসব, প্রসূতি সেবা, নবজাতকের যত্ন, বুকের দুধ, ইপিআই, ডায়রিয়া, পুষ্টি, নিরাপদ পানি ব্যবহার, স্যানিটেশন, পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

ঘ. সংস্থার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় ধাত্রীরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করেন এবং স্যাটেলাইট ক্লিনিকে মা ও শিশুদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বর্তমানে সংস্থায় ৩৯০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী আছে যারা দক্ষতার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

ঙ. প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মীরা স্কুলগামী কিশোরী এবং যেসব কিশোরী স্কুলে যায় না তাদের নিয়ে পৃথকভাবে দল ভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা দেন।

চ. ইপিআই কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মচারীরা আদ্-দ্বীনের স্যাটেলাইট ক্লিনিকে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এবং টিকা সরবরাহ করেন।[১৭৬]

সংস্থার রূপদিয়া, ঝিকরগাছা, কুয়াদা, নেহালপুর ইউনিটগুলো পুরাতন ইউনিট এবং কেশবপুর, বাঘারপাড়া, যশোর সদর, শার্শা, বাগআঁচরা ইউনিটগুলো নতুন ইউনিট নামে পরিচিত। ২০০০ সালে পুরাতন ইউনিটের কার্যক্রম সংস্থার নিজস্ব অর্থে এবং নতুন ইউনিটের কার্যক্রম বিপিএইচসি এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে। ২০০০ সালে ৫৩২১৯টি দম্পত্তি এই কর্মসূচীর সরাসরি সুবিধা ভোগ

---

১৭৫. *প্রাগুক্ত*

১৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। ২০০৩ সালে যশোর জেলার শার্শা, ঝিকরগাছা, সদর, মনিরামপুর, কেশবপুর এবং বাঘারপাড়া থানায় সরকারের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত ২৭টি ইউনিয়নের ১৭৭টি গ্রামের ৪৫২৫৯টি পরিবার ২২৩৬১২ জন সংখ্যার মধ্যে ৪৮২১২ সক্ষম দম্পত্তি এ কার্যক্রমের সরাসরি সুবিধা ভোগ করেছে। এছাড়া যশোর, মাগুরা এবং নড়াইল জেলার ১২টি উপজেলার ১০৭টি ইউনিয়নের ৫৭১টি গ্রামের মানুষ আদ্-দ্বীন ক্ষুদ্র ঋণ সমিতির মাধ্যমে এ কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করেছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমভিত্তিক দু'টি প্রকল্প ২০০৩ সালে চালু ছিল।[১৭৭]

কমিউনিটি বেসড ইএসপি ডেলিভারি প্রজেক্ট

এ প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। এর কর্মএলাকা ছিল শার্শা, বাঘারপাড়া এবং কেশবপুর থানা। মোট ৭২জন কর্মী এ প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। বিপিএইচসি এ প্রকল্পের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবতী সেবা, নিরাপদ প্রসব সেবা, প্রসূতি সেবা, ইপিআই, মহিলা ও শিশুদের সাধারণ চিকিৎসা পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেয়া হয়। মারাত্মক রোগীদের সঠিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হয়।[১৭৮]

ইমপ্রুভিং কমিউনিটি বেসড ইএসসি প্রজেক্ট

এ প্রকল্পের কার্যক্রম ২০০২ সালের জুন থেকে শুরু হয়ে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়েছে। এ প্রকল্পের কর্ম এলাকা ছিল যশোর জেলার শার্শা থানা। মোট ২৭জন কর্মী এ প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। বিপিএইচসি এ প্রকল্পের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল নবজাতকের মৃত্যু ও অসুস্থতা কমানো। এ উদ্দেশ্যে গর্ভবতী মহিলাকে ৪বার গর্ভকালীন সেবা এবং ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রসূতি মাকে প্যারামেডিক দ্বারা সেবা নিশ্চিত করা। হাসপাতালে নবজাতককে রেফার করা এবং হাসপাতালের স্টাফদের নবজাতকের সেবার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া। বিসিসি কার্যক্রম ও স্থানীয় স্বাস্থ্য কমিটির মিটিং করা। ২০০৪ সালে ১৩৪টি শিশুর জন্ম হয় এবং তার মধ্যে ৪টি নবজাতকের মৃত্যু হয়। ১৩৫টি প্রসবকৃত মায়ের মধ্যে ১২৪জন ৪বার গর্ভকালীন সেবা ১১১টি প্রসূতি সেবা এবং ১১১টি নবজাতক সেবা পেয়েছে। এছাড়া অসুস্থ ১৪টি নবজাতককে রেফার করা হয়েছে।[১৭৯]

আদ্-দ্বীন স্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচীর একটি বিশেষ দিক হল সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও হতদরিদ্রদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যে আদ্-দ্বীন তার কর্ম এলাকার মোট জনসংখ্যাকে ৪টি অর্থনৈতিক শ্রেণীতে ভাগ করে পিআরএ পদ্ধতি অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগনের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান কৌশল গ্রহণ করেছে। এতে সমাজের সুবিধা ভোগী ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবার গুণগত মান ও সংখ্যাগত সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

আদ্-দ্বীনের কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা মডেল

আদ্-দ্বীনের কমিউনিটিভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের অনেকাংশ শুরু হয়েছিল দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় যা বর্তমানে সংস্থার নিজস্ব অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও সেবার ধরণ এবং গুণগতমানের কোন ঘাটতি হয়নি। এই কৌশলের মাধ্যমে আদ্-দ্বীন পরীক্ষামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত ৪টি ইউনিটে স্বাস্থ্য সেবার সাথে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন করে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পুনর্বাসন কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মএলাকার ৭০ ভাগ পরিবারকে দলভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় এনে দলীয়ভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ঋণ প্রদান করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা এবং স্বল্পমূল্যে অথচ বিনা লোকসানে পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা সম্ভব

---

১৭৭. *প্রাগুক্ত*
১৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪
১৭৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[১৮০] আর সমাজের বাকি ৩০ ভাগ সুবিধাভোগী শ্রেণীকে উপযুক্ত মূল্যে আদ্-দ্বীন নিম্নলিখিত ভূমিকা রেখে চলেছে-

ক. পারিবারিক অর্থনীতি সচল রাখতে পেরেছে।

খ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে।

গ. স্বাস্থ্যখাতে পরিবারের ব্যয় সাশ্রয় করতে পেরেছে।

ঘ. স্বাস্থ্যমান বজায় থাকাতে পারিবারিক উৎপাদনশীলতা বেড়েছে।

ঙ. উপযুক্ত ও মানসম্মত সেবা প্রদান করায় সেবার যথাযথ মূল্যমান নির্ধারণ ও সেবামূল্য আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

চ. জনগণের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণের মাধ্যমে সংস্থার আয়বৃদ্ধি মূলক প্রকল্প সম্প্রসারিত হয়েছে

ছ. এবং প্রায় সকল সেবার ক্ষেত্রে সেবার পরিধি বেড়েছে।[১৮১]

এসব কৌশলের মাধ্যমে সংস্থার আয় এবং তার সাথে সংস্থার অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক প্রকল্পের আয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে সমন্বিত 'স্বাস্থ্যসেবা' প্রকল্পের ব্যয় সংকুলান সম্ভব হচ্ছে। আদ্-দ্বীনের নিজস্ব অর্থে পরিচালিত এই প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং স্বয়ম্ভর প্রকল্প যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং প্রকল্পটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবার মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

গ্রামীণ নারী উন্নয়ন এবং ঋণ কার্যক্রম

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা সৃষ্টি এবং তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় আদ্-দ্বীনের নারী উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম। ১৯৯০ সালে যশোর জেলার রূপদিয়া ও ঝিকরগাছা ইউনিটের অধীনে এ কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। উল্লেখ্য, স্বয়ম্ভরতা অর্জন ও কর্মসূচীর দীর্ঘস্থায়ীত্বের বিষয় সামনে রেখে কমিউনিটিভিত্তিক মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড সংযোজন করা হয়। এ লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে সমিতি গঠন করা হয়। প্রত্যেক সমিতিতে ২০-২৫ টাকা করে সঞ্চয় জমা করে এবং নির্ধারিত হারে সেবামূল্যের বিনিময়ে প্রত্যেক সদস্যকে প্রথম পর্যায়ে গড়ে ৫০০০/- টাকা এবং সকল উপকার ভোগীদের সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়। প্রকল্পভিত্তিক এই ঋণ কার্যক্রমে প্রকল্পের আয় থেকে ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। মাঠকর্মীদের মাধ্যমে এ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। সর্বোচ্চ ৫জন মাঠকর্মীকে ১জন সুপারভাইজার সহায়তা করেন যারা একজন ইউনিট ম্যানেজারের সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিট ম্যানেজার জবাবদিহি করেন এরিয়া ম্যানেজারের নিকট এবং এরিয়া ম্যানেজার সহ-সমন্বয়কারী, উপসমন্বয়কারী এবং সমন্বয়কারীর নিকট জবাবদিহি করেন।[১৮২]

শুরু থেকে ১৯৯৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই কর্মসূচীতে প্রদত্ত সকল ঋণ সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করা হয়। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে এই কার্যক্রমের জন্য সরকারের সহযোগিতায় পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউণ্ডেশন সহায়তা প্রদান করছে। আদ্-দ্বীনের ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে পাঁচ ধরনের ঋণ ব্যবস্থা চালু আছে।[১৮৩] নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলো :

---

১৮০. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০০*, আদ্-দ্বীন, পৃ. ২৯

১৮১. *প্রাগুক্ত*

১৮২. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৩*, আদ্-দ্বীন, পৃ. ৪৬

১৮৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ক. গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ

নিম্ন আয়ের গ্রামীণ মহিলাদের মাঝে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। প্রথম পর্যায়ে ৫০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এ ঋণের সেবার হার ১২.৫%।

খ. আরবান ক্ষুদ্র ঋণ

শহরের নিম্ন আয়ের মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা। প্রথম পর্যায়ে ৬০০০ টাকা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ২০,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এখানেও সেবামূল্যের হার ১২.৫%।

গ. মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ

কর্মএলাকার সকল উপকারভোগী যাদের বিনিয়োগ ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যারা অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম তাদেরকে এ ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়তা করা। প্রথম পর্যায়ে ৩০,০০০টাকা থেকে ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এ ঋণের সেবামূল্যের হার ১০%।

ঘ. আর্থ-সমাজিক পুনর্বাসন ঋণ

বন্যা কবলিত এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ ঋণ বিতরণ করা হয়। টিউবওয়ল, সেনেটারি ল্যাট্রিন, বাড়ি মেরামত এবং বীজ ক্রয়ের জন্য সমিতির প্রতি সদস্যকে প্রথম পর্যায়ে ৩০০০ টাকা ঋণ দেয়া হয়। এঋণের সেবামূল্য মাত্র ৪.৫%।

ঙ. হতদরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা প্রকল্প

কর্মএলাকার হত দরিদ্রদের মাঝে ঋণ প্রদান করা হয়। আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ততার জন্য প্রকল্প অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া হতদরিদ্রদের সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সাবলম্বী করার মাধ্যমে প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানোও এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রথম পর্যায়ে ৫০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেয় হয়।

চ. সাপ্তাহিক সমিতি সভা

সমিতি বা গ্রুপ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের প্রাণ। আর সমিতির সাপ্তাহিক সভা ও কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানেই সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর সাপ্তাহিক সমিতি সভায় সদস্যরা সঞ্চয় ঋণ কার্যক্রমের বাইরে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণসমূহ পেয়ে থাকেন। স্বাস্থ্য শিক্ষায় সংস্থার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মাঠকর্মী গর্ভকালীন সেবা, প্রসূতি সেবা, নবজাতকের যত্ন, মায়ের দুধ, নিরাপদ প্রসব, ইপি আই, ডায়রিয়া, পুষ্টি, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন। সমিতির সদস্যদের বাড়ির উঠান সংলগ্ন জায়গায় পুষ্টিকর শাক-সবজি এবং মৌসুমী শষ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয় এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়।

ছ. প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ

ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে যেসব প্রকল্পে ঋণ দেয়া হয় তা হল ভ্যান-রিক্সা, ধানছাটাই, মাংসের ব্যবসা, হস্তশিল্প, সবজি চাষ, গাভী পালন, ছাগল পালন, কাঠের ব্যবসা মুদি দোকান, সাইকেল গ্যারেজ, স্টক ব্যবসা, নার্সারী, হাঁস-মুরগি পালন, দর্জি, মাছ চাষ ইত্যাদি।

জ. সঞ্চয় কার্যক্রম

গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে সঞ্চয় কার্যক্রম নিজস্ব পুঁজি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক সভায় সদস্যরা ১০ টাকা করে সঞ্চয় জমা করে এবং সাপ্তাহিকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও ১০ বছরে জমাকৃত মোট সঞ্চয়ের উপর যথাক্রমে ১০%, ১২%, ১৫%, ১৭%, ২০%, ২৩%, ২৫% ও ৩০% লভ্যাংশ পেয়েছে।[১৮৪]

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম আদ্-দ্বীনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। কমিউনিটিভিত্তিক মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং নারী উন্নয়ন ও ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এ কার্যক্রমও আদ্-দ্বীনের কর্ম এলাকায় ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। কাজের শুরুতে মাত্র ৮% পরিবার পাকা পায়খানা ব্যবহার করত। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০% শতাংশ হয়েছে। বর্তমানে কর্ম এলাকার প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে টিউবওয়েল আছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য আদ্-দ্বীনকে এনজিও ফোরাম, ইউনিসেফ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ সহযোগিতা করে থাকে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ সহযোগিতা করে থাকে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের সাহায্যে কর্মএলাকার টিউবওয়েলগুলোতে আর্সেনিকের পরিমাণ পরীক্ষা করা হয়েছে।[১৮৫]

গ্রামীণ স্যানিটেশন সেন্টার

কেশবপুর, মনিরামপুর এবং শার্শা থানায় আদ্-দ্বীনের চারটি গ্রামীণ স্যানিটেশন সেন্টার আছে। এখানে নিয়মিত স্যানিটেশন সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। এ সকল সেন্টার থেকে দরিদ্র গ্রামবাসী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য সহজে এবং খুব কম মূল্যে সকল উপকরণ নিতে পারছে। তাছাড়া সংস্থার মাঠকর্মীরা সমিতির সাপ্তাহিক সভায় সদস্যদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের জন্য নিয়মিত উদ্বুদ্ধ করেন। ২০০৪ সালে সংস্থার কর্মএলাকায় ৮২-৯৮% বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা কমিউনিটিতে ইতোমধ্যে বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৬ সালে যশোর জেলায় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রমের জন্য আদ্-দ্বীন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।[১৮৬]

এতিম পুনর্বাসন কর্মসূচী

এতিম পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আদর্শ এতিমখানা হিসেবে আদ্-দ্বীন শিশু-কিশোর নিকেতন ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১০জন এতিম শিশু নিয়ে খোলাডাঙ্গা, যশোরের একটি টিনসেডের ভাড়া করা বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর ১৯৮৫ সালে সংস্থার চেয়ারম্যান শেখ আকিজ উদ্দিনের কারবালাস্থ যশোরের নিজ বাড়িতে শিশু এতিমদের লালন-পালনের কাজ চলতে থাকে। ১৯৯৫ সালে যশোরের পূর্ববারান্দিপাড়ায় দোতলা বিশিষ্ট সংস্থার নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তর করা হয়। আবারও স্থানান্তর করা হয়েছে শিশু কিশোর নিকেতনকে। বর্তমানে যশোরের ঝিকরগাছা থানার নাভারণে যশোর বেনাপোল সড়কের পাশে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব জমিতে তিনতলা বিশিষ্ট ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। এখানে শিশু-কিশোর নিকেতনের ছাত্রদের স্থায়ী কমপ্লেক্স হবে।[১৮৭]

আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। ২০০০ সালে ৪০ জন ছাত্রের মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ২ জন, ২য় শ্রেণীতে ৩ জন, তয় শ্রেণীতে ২ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ৯ জন, ৫ম শ্রেণীতে ৩ জন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ৪ জন, ৭ম শ্রেণীতে ৪ জন, ৮ম শ্রেণীতে ৩ জন, ৯ম শ্রেণীতে ৭ জন, ১০ম শ্রেণীতে ৩ জন ছাত্র, ৯ম শ্রেণীতে ৩ জন, এবং ১০ শ্রেণীতে ৫ জন। এর মধ্যে ২০০৩ সালে ৫ জন নতুন ছাত্র ভর্তি হয়েছে এবং ৪জন এসএসসি পাশ করেছে।[১৮৮]

---

১৮৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭, ৪৮
১৮৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১
১৮৬. *প্রাগুক্ত*
১৮৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২
১৮৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী

সমাজের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বাড়ানো আদ্-দ্বীনের অন্যতম লক্ষ্য। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণের শিক্ষা প্রদান আদ্-দ্বীনের অন্যতম লক্ষ্য। উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে আদ্-দ্বীন এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে কর্মসূচী শুরু হয়। বর্তমানে যশোর জেলার সদর, মনিরামপুর, ঝিকরগাছা ও শার্শা থানায় ১৫টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে কর্মসূচীটি পরিচালিত হচ্ছে।[১৮৯] এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল–

ক. দরিদ্র এবং ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

খ. সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

গ. ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা।[১৯০]

তিন বছর মেয়াদী শিক্ষাবর্ষে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ১০৫০ জন ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে। এর মধ্যে ২৯০জন ছাত্র এবং ৭৬০ জন ছাত্রী। ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত মনিরামপুর ও যশোর সদরের ২০টি স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত স্কুলগুলোর মাধ্যমে ৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ৩য় শ্রেণী শেষ করে পরবর্তীতে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আদ্-দ্বীন তাদেরকে নিয়মিত খোঁজ খবর ও উৎসাহ প্রদান করে থাকে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে লেখাপড়ার পাশাপাশি নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি শোনানো হয়। দেশের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে।[১৯১]

ফোরকানিয়া প্রকল্প

আদ্-দ্বীনের কর্মএলাকায় মুসলিম কিশোর-কিশোরীদের সহীহ্ কোরআন শিক্ষা, তার চর্চা ও অনুসরণ এবং সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৬ সালে আদ্-দ্বীন ফোরকানিয়া প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরু থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত যশোর সদর থানায় প্রতি বছর ১০টি করে মোট ১৬০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বিস্তৃত ছিল এবং ২০০২ সালে শার্শা থানায় ১০টি এবং ২০০৩ সালে ৯৪টি কেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রকল্প পরিচালিত হয়। কেন্দ্রগুলো মসজিদভিত্তিক এবং প্রতি কেন্দ্র ৯মাস স্থায়ী হয়। ২০০৩ সাল পর্যন্ত ১২৮০ জন কিশোর-কিশোরীকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহীহ্ কোরআন শিক্ষার পাশাপাশি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিষয়েও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এবং ২৪০ জন ইমামকে সহজ পদ্ধতিতে সহীহ্ কোরআন শিক্ষাদান বিষয়ে এবং ২১জন ইমামকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চক্ষু রোগের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সংস্থার নিজস্ব খরচে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।[১৯২]

সখিনা বালিকা বিদ্যালয়

দেশের নারী শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রাখা আদ্-দ্বীনের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই ১৯৯৮ সালের ৯ অক্টোবর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় সখিনা বালিকা বিদ্যালয়। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন আদ্-দ্বীন চেয়ারম্যান শেখ আকিজ উদ্দিনের স্ত্রী সমাজ সেবিকা সখিনা বেগম। ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর থেকে স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০০ সালের ৩১ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল উদ্বোধন ও ফলক উন্মোচন করেন পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থপনা পরিচালক ডঃ সালেহ উদ্দিন আহমেদ।[১৯৩]

যশোর শহরের পূর্ব বারান্দী পাড়ায় ভৈরব নদী ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় পত্র পল্লবে ঘেরা সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে তিন একর জমির উপর বিদ্যালয়ের অবস্থান। স্কুলের প্রতি শ্রেণীতে ৩০জন করে ছাত্রী

---

১৮৯. *প্রাগুক্ত*
১৯০. *প্রাগুক্ত*
১৯১. *প্রাগুক্ত*
১৯২. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫*
১৯৩. *প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬*

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যয়নের সুযোগ পায়। সখিনা স্কুল যশোরের একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতোমধ্যে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ, নিজস্ব নিরাপদ যানবাহন ব্যবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা, খেলাধূলার জন্য উন্মুক্ত মাঠ ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা রয়েছে।[১৯৪]

প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী

চলমান সেবামূলক কর্মসূচী টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আদ্-দ্বীন ১৯৯৩ সালে একটি অপসেট প্রিন্টিং প্রেস এবং ১৯৯৪ সালে একটি ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। আদ্-দ্বীন অফসেট প্রিন্টিং প্রেসটি এতদঅঞ্চলের একটি সুপরিচিত আধুনিক প্রেস। এখানে ১টি বড়, ১টি মাঝারি ও ১টি ছোট অফসেট প্রিন্টিং মেশিন আছে। এছাড়া ডাই কাটিং মেশিন, প্লেট এক্সপোজিং মেশিন, পেপার কাটিং মেশিন, লেমিনেটিং মেশিনসহ বাইন্ডিং সেকশন এবং কম্পিউটার কম্পোজ সেকশন রয়েছে। এখানে প্রিন্টিং এর সকল প্রকার কাজ করা হয়।[১৯৫]

আদ্-দ্বীন ডেইরী ফার্ম

শহরবাসীর বাসায় বাসায় খাঁটি দুধ সরবরাহের জন্য আদ্-দ্বীন ডেইরীই একমাত্র বড় প্রতিষ্ঠান। এখানে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারতাজকরণের আধুনিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৪০০ এর অধিক পরিবারকে ২৫০ থেকে ৩০০ কেজি দুধ সরবরাহ করা হয়। ১জন ডেইরী ইনচার্জ, ১জন মিল্ক অর্গনাইজার, ৪জন সেলসম্যান, ২জন কাউম্যান এবং ২জন মিল্ককালেক্টর ফার্মটি পরিচালনা করেন।[১৯৬]

জরুরী ত্রাণ তৎপরতা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে সমাজের আর্ত-পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্য করা সংস্থার অন্যতম কাজ। ১৯৯৮ সালের বন্যায় ঢাকা শহরে আদ্-দ্বীন মেডিকেল টিম চিকিৎসাসেবা ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০০ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নজিরবিহীন বন্যাতেও আদ্-দ্বীন প্রশংসার দাবীদার। ২০০০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সীমান্তের ওপার থেকে আকস্মিকভাবে বন্যার পানি এসে ভাসিয়ে দেয় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল। বিশেষ করে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা ও যশোর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা হয় প্লাবিত। প্রবল বন্যায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন, অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছে। এ পরিস্থিতিতে মানবিক তাড়নায় এগিয়ে আসে আদ্-দ্বীন সংস্থার স্বাভাবিক সকল কার্যক্রম স্থগিত রেখে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে প্রায় ২ মাস জরুরী ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। নিজস্ব ২৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে যশোর ও সাতক্ষীরার বানভাসী ২২০৪৯ জন নারী পুরুষকে প্রতিদিন তিন বেলা খাবার, ৪০টি ফিডিং সেন্টারের মাধ্যমে ৫ মাস থেকে ৫ বছরের ৩৪৪৭জন শিশুকে প্রতিদিন ৬বার খাবার, ৩০৮ জন গর্ভবতী ও ৩২৮জন স্তন্যদানকারী মাকে প্রতিদিন বাড়তি খাবার হিসেবে কলা ও ডিম দেয়া হয়। বন্যার্তদের চিকিৎসার জন্যও প্রতিটি কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক মেডিকেল টিম থাকে। ৪টি ভ্রাম্যমান মেডিকেল টিম বিভিন্ন কেন্দ্রে ঘুরে ২০০১৭ জনকে সরাসরি চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ দেয়। সরকারের সাথে যৌথভাবে আদ্-দ্বীন যশোর শহরে একটি ফিল্ড হাসপাতালও পরিচালনা করে এছাড়া ৯০৪২ জনের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেছে। বন্যা পরবর্তীতে বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে। এছাড়া ২০০৩ সালের জুন মাসে ঝিকরগাছা থানার বাকড়া ইউনিয়নের বন্যা দুর্গতদের চিকিৎসা

---

১৯৪. *প্রাগুক্ত*
১৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
১৯৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সেবা দেয়ার জন্য এবং ২০০৪ সালের জুলাই মাসে শার্শা থানার ৩টি ইউনিয়নের ডায়রিয়া আক্রান্ত দুর্গত অসহায় মানুষের জন্য আদ্-দ্বীন মেডিকেল টিম কাজ করে এবং বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন।[১৯৭]

আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি সর্ববৃহৎ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৮৫ সালের ১৫ মে প্যারামেডিক প্রশিক্ষকের মাধ্যমে এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। মূলত সংস্থার নিজস্ব কর্মী এবং এ অঞ্চলের এনজিও কর্মীদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতাল সংলগ্ন পাঁচতলা বিশিষ্ট ভবনে কেন্দ্রটির বর্তমান অবস্থান যেখানে রয়েছে প্রশিক্ষণ উপযোগী মনোরম কক্ষ এবং অনুকূল ও সুন্দর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। ১৯৯৫ সালের ৮ মে ইংল্যান্ডের মহামান্য রাজকুমারী এ্যান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।[১৯৮]

সুযোগ-সুবিধা

আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক সাথে ১০০-১২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রশিক্ষণের জন্য একটি বড় হলরুম ও একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রুম আছে। প্রশিক্ষণ রুমে মাইক্রোফোন, সাউন্ড বক্স, সাদা বোর্ড, অডিও, ডিপ বোর্ড, পোস্টার ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগসহ কাজ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া অডিও ভিজ্যুয়াল প্রশিক্ষণ উপকরণসহ প্রশিক্ষণ উপযোগী যাবতীয় উপকরণসমূহ আছে। প্রশিক্ষণে সবসময় অত্যাধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মাল্টিমিডিয়া ভিডিও ক্যাসেট, স্লাইড এবং ওএইচপি প্রদর্শনের ব্যবস্থাসহ সঠিক তথ্য সম্বলিত হ্যান্ডনোট সরবরাহ করা হয়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে হাসপাতাল এবং মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম।[১৯৯]

আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের থাকার জন্য ১০০টি বেডের ব্যবস্থা রয়েছে। সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রয়েছে নিজস্ব জেনারেটর ব্যবস্থা। ডাইনিং কক্ষে ৯০ জন প্রশিক্ষনার্থীর একই সাথে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগের জন্য টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া এ কেন্দ্রে আদ্-দ্বীন হাসপাতাল এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্টাফদের থাকারও ব্যবস্থা আছে।[২০০]

প্রশিক্ষণের বিষয়

আদ্-দ্বীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মা-শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, ক্লিনিক্যাল কার্যক্রম, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, জেন্ডার ইস্যু, অত্যাবশ্যকীয় সেবা, প্যাকেজ বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান এবং আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণকেন্দ্র সংলগ্ন হাসপাতালে হাতে কলমে কাজ শেখানো হয়। হাসপাতালের ভিতরে একটি গ্রামীণ আতুড়ঘরে টিবিএ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ে সংস্থার সমন্বিত স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী রয়েছে।[২০১]

গবেষণা ও প্রকাশনা

সংস্থার সকল কার্যক্রম বিশেষ করে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও ঋণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের গবেষণা সেল রয়েছে। গবেষণা সেল সংস্থাকে নিয়মিত সৃষ্টিশীল কর্মসূচী গ্রহণে, সংস্থা পরিচালনায় নীতি মালা ও দিক নির্দেশনামূলক মতামত এবং সকল কার্যক্রমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে।[২০২]

---

১৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
১৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০
১৯৯. *প্রাগুক্ত*
২০০. *প্রাগুক্ত*
২০১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১
২০২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

আদ্-দ্বীন নার্সিং স্কুল

নার্সিং পেশাকে উৎসাহিত এবং কার্যকরী করার জন্য স্বল্প পরিসরে ১৯৯৭ সালে ৬ আগস্ট যশোর আদ্-দ্বীন হাসপাতালের পাশেই গড়ে ওঠে "আদ্-দ্বীন সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামে আদ্-দ্বীন নার্সিং স্কুল। এই স্কুলের উদ্দেশ্য হল-

১. হাসপাতালের কাজের উপযোগী করে দক্ষ, সেবাদানে আন্তরিক ও রোগীর প্রতি সহানুভূতিশীল নার্স তৈরি করা।

২. হাসপাতালের রোগীদের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ নার্স নিয়োগ করা।

বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক ১৯৯৯ সালে আদ্-দ্বীন নার্সিং স্কুল ১৮ মাস মেয়াদের জুনিয়র মিডওয়াইফারী কোর্সের কার্যক্রম পরিচালনা করে। শুরু থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত জুনিয়র মিউওয়াই এ মোট ৬ ব্যাসে ১৫১ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছে এবং পাশ করেছে মোট ১০৭ জন।[২০৩]

দেশের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মহিলা ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সার্বিক উন্নয়নে আদ্-দ্বীন তার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

---

২০৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এইড

মানব সম্পদ উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নতুন মাত্রার সূচনা করা এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করার জন্য অন্যান্য এনজিওর পাশাপাশি নিরলস কর্মসূচী পরিচালনা মুসলিম এইড[২০৪]-এর কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার, কম্পিউটার শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য কার্যক্রমের বিস্তৃতি, ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় ব্যাপকভিত্তিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণ মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ আমাদের জাতি গঠনে সাংগঠনিক ও নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সমাজের এতিম,বেকার যুবক, দরিদ্র, অসহায় মহিলা ও কর্মজীবী শিশুরা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে মুসলিম এইড দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে যাচ্ছে।[২০৫] মুসলিম এইড বাংলাদেশ মনে করে মানব কল্যাণমূলক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, একাগ্রতা ও উৎসাহ বা উদ্দীপনা সমাজ কর্মীদের জন্য বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। মুসলিম এইড বাংলাদেশ সবসময় তার কাজের গুনগতমান বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর যা মুসলিম এইড কোয়াটার বাংলাদেশের উন্নয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে থাকে। যার ফলে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

পরিচিতি

ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত ও সমাজসেবামূলক কাজের উন্নয়নই মুসলিম এইড বাংলাদেশের একমাত্র উদ্দেশ্য। মুসলিম এইড বাংলাদেশ লন্ডন ভিত্তিক সেবা ও উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগণের জন্য সেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম এইড বাংলাদেশ। মুসলিম এইড বাংলাদেশের সকল কার্যক্রম জনগণ ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি আদায়ের লক্ষ্যে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর সকল মূলনীতি দাতাদের ইচ্ছা ও লন্ডনভিত্তিক প্রাধান কার্যালয় থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, বিশুদ্ধপানি, পয়ঃনিষ্কাশন, দুর্যোগকালীন সাহায্য ও পুনর্বাসন, ধর্ম ও নৈতিক কার্যক্রম, পরিবেশ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়নসহ নানা ধরনের কার্যক্রম সারাদেশব্যাপী বাস্তবায়ন করছে মুসলিম এইড বাংলাদেশ। মুসলিম এইড বাংলাদেশ দেশের প্রায় অর্ধেক জেলায় তাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় বড় অংকের উপকার ভোগীদের নিয়ে কাজ করছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের ভাগ্যবিড়ম্বিত মুসলমানদের জীবনযাত্রারমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুসলিম এইড বাংলাদেশ একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান।[২০৬]

মুসলিম এইড বাংলাদেশ লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সেবা ও উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯১ সালে ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলমানদের সেবামূলক কাজের উন্নয়ন এবং ত্রাণ সাহায্যের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুসলিম এইড প্রতিষ্ঠিত হয় যুক্তরাষ্ট্রে। পরবর্তীতে মুসলিম এইড এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপসহ বিশ্বের ৫৪টি দেশে তার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসের ধ্বংসাত্বক ঘূর্ণিঝড়ের অভিজ্ঞতার আলোকে মুসলিম এইড বাংলাদেশ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০০৪ সালে সংস্থাটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের আশ্রয়ের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তিনটি

---

২০৪. মুসলিম এইড (ইউকে) বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : এম. বি. হাইজ, ৭/৭, ব্লক-সি লালমাটিয়া, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ

২০৫. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৪*, মুসলিম এইড, মুখবন্ধ অংশ

২০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের মূল্যায়ন অনুধাবন করে মুসলিম এইড বাংলাদেশ মুসলিম এইড যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের মূলনীতি ও কৌশলে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এই পরিবর্তিত নীতি দরিদ্র জনগণের স্থায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম প্রতিস্থাপন করার জন্য। ইসলাম সামগ্রিক উন্নয়ন সমর্থন করে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ মানবসেবা, সামাজিক কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে।[২০৭]

মুসলিম এইড বাংলাদেশ-এর কার্যক্রম

মুসলিম এইড বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সেবা ও উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯১ সালে বাংলাদেশর উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশ কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ প্রতি বছর নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ বেশ কিছু উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রম ও প্রকল্পসমূহ হল :[২০৮]

১.শিক্ষা কার্যক্রম

মুসলিম এইড বাংলাদেশ শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে নিম্নরূপ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে।

ক. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প।

খ. এতিম প্রতিপালন প্রকল্প।

গ. এতিমদের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প।

ঘ. দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।

ঙ সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প।

ছ. একাডেমিক ভবন নির্মাণ।

জ. বিজ্ঞানাগার সহায়তা।

২. স্বাস্থ্য কার্যক্রম

ক. আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম।

খ. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম।

গ. জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম।

ঘ. নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম।

ঙ. বিশেষ কার্যক্রম।

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প

মুসলিম এইড বাংলাদেশ সমাজের দরিদ্র, অসহায়, ঝরে-পড়া ও স্কুল বিমুখ শিশুদের শিক্ষার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই প্রকল্পের আওতায় নীলফামারি জেলার ২টি থানা এবং ঢাকা জেলার ১টি থানায় এই কার্যক্রম চালু করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের মেয়াদ ৩০ মাস। এই প্রকল্পের আওতায় ঝরে পড়া ও স্কুল বিমুখ ৮-১২বছরের ছেলে মেয়েদের বাংলা, ইংরেজি, সমাজবিজ্ঞান, ইসলামী শিক্ষা ও দৈনন্দিন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৬দিন নিয়মিত ক্লাস, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষক ও সুপার ভাইজারদের প্রশিক্ষণ, সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি

---

২০৭. *প্রাগুক্ত*
২০৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ও অভিভাবক মিটিং এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও ছাত্র-ছাত্রীদের, ইউনিফর্মসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের ব্যাপারে মুসলিম এইড বাংলাদেশ সহায়তা করে থাকে।[২০৯]

২. এতিম প্রতিপালন প্রকল্প

মুসলিম এইড বাংলাদেশ সমাজের এতিম অসহায় শিশুদের জন্য দেশের ৭ টি জেলায় নিয়মিতভাবে কাপড়, ঔষধ, সামগ্রী সরবরাহ করে থাকে। এছাড়াও এতিম ছেলে মেয়েদের জন্য কারিগরী শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় ৬ মাস মেয়েদী আবাসিক কারিগরী শিক্ষা প্রদান করে থাকে। কম্পিউটার, ইলেকট্রিক ওয়ারিং, টেইলারিং ও ইঞ্জিন মেকানিক বিষয়ে মুসলিম এইড বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এই প্রকল্পের আওতায় কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী পাশ বেকার এতিমদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের কর্ম এলাকা হচ্ছে কুষ্টিয়া ও নীলফামারি জেলা।[২১০]

৩. দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

এই প্রকল্পের আওতায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ ২০০৩ সালে ঢাকায় স্থাপন করেছে মুসলিম এইড ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি। এই প্রকল্পের আওতায় ৬ মাস মেয়াদী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কম্পিউটার, ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, রেফ্রিজারেটর ও এয়ারকন্ডিশন, রেডিও ও টিভি মেকানিক্স এবং টেইলারিং বিষয়ে এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পটি ঢাকাকেন্দ্রিক। এই প্রকল্পের আওতায় ট্রেডভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা-কম্পিউটার বিষয়ে ২৮৪ জন ড্রাইভিং বিষয়ে ২১৫ জন, রেফ্রিজারেটর এন্ড এয়ারকন্ডিশন মেকানিক্স বিষয়ে ১৪২ জন, টেইলারিং বিষয়ে ৬৮ জন, রেডিও এন্ড টিভি মেকানিক্স বিষয়ে ৬৫ জন, ইলেক্ট্রিক্যাল বিষয়ে ১২৪ জন। মোট ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী ৭৯৮ জন। এদের মধ্যে পাশ করছে ৩৪১ জন। বর্তমানে প্রশিক্ষণরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২২৫ জন।[২১১]

৪. বৃত্তি প্রকল্প

ইকো-ইউ এস এ- এর আর্থিক সহায়তায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ ২০০৪ সালে দেশের ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে। সমাজের দরিদ্র, অসচ্ছল অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়।[২১২]

৫. সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প

মোহাম্মদ তারেক জে. যাবাদনী-এর সহায়তায় আইডিপি-৭-এর আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে কম্পিউটার সহায়তা প্রকল্প, বিজ্ঞনাগার সহায়তা প্রকল্প, একাডেমিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প। দেশের ৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪৯০টি কম্পিউটার ও ৫৫টি প্রিন্টার বিতরণ করেছে মুসলিমএইড বাংলাদেশ। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের ২৩টি জেলার ৩৫টি থানায় অবস্থিত। মুসলিম এইড বাংলাদেশ শিক্ষা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিজ্ঞান গবেষণাগারের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেছে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূগোল ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহৃত সরঞ্জামের সমন্বয়ে এ সকল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সহায়তা প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য মুসলিম এইড বাংলাদেশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিল্ডিং নির্মাণে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি সার্বিক তদারকিতে অংশগ্রহণ করে থাকে।

---

২০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
২১০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
২১১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
২১২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম এইড বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ১৭টি জেলার ২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণে সহায়তা প্রদান করেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১০টি স্কুল ৬টি কলেজ ও ১১টি মাদ্রাসা।[২১৩]

৬. স্বাস্থ্য কার্যক্রম

স্বাস্থ্য কর্মসূচীর আওতায় মুসলিম এইড কমিউনিটি ক্লিনিক (এম.এ.সি.সি) নামে ২টি কমিউনিটি ক্লিনিক আছে যা সদর থানা, পাবনা, কুলাউড়া ও মৌলভীবাজারে অবস্থিত। ২০০৪ সালে সংস্থা আরো ১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে সিলেট জেলার কালিগঞ্জে। দেশের দুঃস্থ অসহায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মুসলিম এইড বাংলাদেশ তার হেলথ প্রোগাম বা স্বাস্থ্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে ইনডোরে ও আউটডোরে উভয় ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মুসলিম এইড বাংলাদেশ শুধুমাত্র আউডোর সেবা প্রদানের জন্য ১টি মাদার এন্ড চাইল্ড হেলথ সেন্টার স্থাপন করেছে যা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। ৩টি এম.এ.সি.সি এবং ১টি এম.সি.এইচ.সি-এর মাধ্যমে বেশকিছু ইনডোর ও আউডোর স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অপারেশন থিয়েটার, ডায়াগনস্টিক ল্যাব, ইসিজি, ইউ এস জি, এক্স-রে স্বল্পমূল্যের পেশেন্ট কেবিন, স্বল্পমুল্যের পেশেন্ট ওর্য়াড, এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রিন্যাটাল চেক-আপ, মাদার চেকআপ, নরম্যাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান ডেলিভারী, সুন্নাতে খাতনা, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, পোলিও, ভ্যাক্সিনেশন, ভিটামিন-এ সাপ্লিমেন্টেশন, লিফলেট বিতরণ, স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ প্রভৃতি বিতরণ সেবা প্রদান করা হয়।[২১৪]

৭. আয়বর্ধক কার্যক্রম

মুসলিম এইড বাংলাদেশ ১৩টি শাখা অফিসের মাধ্যমে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণের আওতাধীন বিনিয়োগের খাতসমূহ হচ্ছে- কৃষিকাজ, ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন-মুদি দোকান, বেডিং হাউজ ইত্যাদি, গরু ও ছাগল পালন, তাঁত, ভ্যান বা রিক্সা, নার্সারী, ইঞ্জিন মেকানিক, পোল্ট্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পাশাপাশি পরিবেশ উন্নয়ন, নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নমূলক বেশ কিছু কাজ মুসলিম এইড বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করে থাকে। ক্ষুদ্রঋণের অধীনে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ ২০০৪ সালে ১৬৪৪৩টি বৃক্ষরোপণ,৭৯১টি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, ৫২টি টিউবওয়েল স্থাপন, ১২টি যৌতুক বিহীন বিবাহ, ৭৩টি ধুমপাননমুক্ত পরিবার গঠন এবং ৬৮২ জনকে আল-কুরআন শিক্ষা প্রদান করেছে।[২১৫]

৮. নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ কার্যক্রম

১৯৯১ সাল থেকে মুসলিম এইড বাংলাদেশ নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০০৪ সালে দেশের ১৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ গ্রামের দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করতে সহযোগিতা করে থাকে।[২১৬] এই প্রকল্পের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমগুলো হচ্ছে :

১. এলাকা চিহ্নিতকরণ।

২. উপকারভোগী বাছাইকরণ ও দলগঠন।

৩. গ্রুপ ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং।

৪. প্রোমোশনাল সামগ্রী উন্নয়ন, প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন।

---

২১৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
২১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
২১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
২১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

৫. টিউবওয়েল ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহ।

৬. কমিউনিটির জনসাধারণের অংশগ্রহনের মাধ্যমে টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন।

৭. জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

৮. নিয়মিত মনিটরিং ও সুপারভিশন।

৯. প্রশিক্ষণ।

১০. আর্সেনিক পরীক্ষা।

১১. বিকল টিউবওয়েল মেরামত।

এ কাজে মুসলিম এইড বাংলাদেশকে সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হচ্ছে এইড অষ্ট্রেলিয়া, মি. মারুফ অষ্ট্রেলিয়া, মুসলিম এইড ইউকে এর সহযোগিতায় প্রকল্প এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার সম্প্রসারণ করতে মুসলিম এইড বাংলাদেশ বিভিন্ন কর্মসূচী সম্পাদন করছে। এছাড়া নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ফলে গ্রামের দরিদ্র , অসহায় জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা অর্জন করেছে। এ সকল সচেতনামূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, প্রশ্ন ও উত্তর, পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, ও হ্যান্ডবুক বিতরণ, বিল বোর্ড স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে।[২১৭]

৯. জরুরি ত্রাণ পূনর্বাসন কার্যক্রম

২০০৪ সালে বাংলাদেশ মোকাবেলা করেছে স্মরণকালের ভয়াবহতম বন্যা ও ভারী বর্ষণজনিত ক্ষয়-ক্ষতি। দেশের ৬৪টি জেলা ৪১৭টি থানা বন্যায় শিকার হয়। মুসলিম এইড বাংলাদেশ তার সকল শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত করে দেশের বন্যাদুর্গত ৩৪টি জেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।[২১৮]

১০. অংশীদারিত্বমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম

মুসলিম এইড বাংলাদেশ দেশের ১৪টি জেলায় ১৫টি উন্নয়ন ও সেবাসংস্থাকে ফান্ড প্রদানসহ সেগুলোর সামর্থ্যবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ প্রকল্পের আওতায় অংশীদারি এনজিও গুলো হচ্ছে-আমিন ফাউন্ডেশন, বগুড়া ফাউন্ডেশন, কমিটমেন্ট ফর অ্যাডভান্সড লার্নিং সোসাইটি, দারুল আমান মাদ্রাসা এন্ড এতিমখানা, দারুল আইতাম, দারুল আমান ট্রাস্ট, ঘ্যাগোটিয়া অরফানেজ, শাহজালাল জামেয়া মাদ্রাসা, হিউম্যান কোঅপারেশন সেন্টার ইন বাংলাদেশ, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র,মেডিসিন ব্যাংক, শাহজালাল শিক্ষা উন্নয়ন ট্রাস্ট, শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশ, তামান্না ফাউন্ডেশন, ডিপ্রাইভড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এবং বিনিয়োগের খাতসমূহ হচ্ছে-সেলাই মেশিনের উপর কারিগরী শিক্ষা, মুরগী পালন, দর্জি প্রশিক্ষণ, ইসলামী শিক্ষা, গরু মোটাতাজাকরণ, প্রাকশৈশব শিক্ষা, রোগ নিরাময়ে স্বাস্থ্য সেবা, এতিমদের জন্য খাবার, পোশাক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, এতিম প্রতিপালন, চোখ-দাঁত-রক্ত সংগ্রহ অভিযান, ভবন নির্মাণ, অবহেলিত শিশুদের জন্য শিক্ষা।[২১৯]

১১. বিশেষ কার্যক্রম

মুসলিম এইড বাংলাদেশ কোরবানী, রমজান, যাকাত, আকিকা, ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে মুসলমানদের সহায়তা প্রদান করে থাকে। বিধবা, এতিম, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা, অসহায় শিশু ও

---

২১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২
২১৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩
২১৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষ, বয়স্ক পুরুষ ও নারী, দরিদ্র পরিবার , পথ শিশু প্রভৃতির ভেতর থেকে উপকারভোগী বাছাই করা হয়। ২০০৪ সালে মুসলিম এইড অস্ট্রেলিয়া, ইউকে-ইউ এস এস ইত্যাদির সহায়তায় মুসলিম এইড বাংলাদেশ উৎসবভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করেছে। রমজান উপলক্ষে কোরআন শিক্ষা ও মাসব্যাপী অসহায় মানুষের জন্য খাবার সরবরাহ যাকাত ও ঈদের কাপড় বিতরণ মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।[২২০]

১২. প্রশিক্ষণ

মুসলিম এইড বাংলাদেশ মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষে বেশ কিছু কোর্স পরিচালনা করে থাকে। সেগুলো হচ্ছে :

১. অফিস ম্যানেজমেন্ট উইথ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন। বি আই এম পরিচালিত কোর্স।

২.প্রজেক্ট অ্যাপ্রেইজাল এন্ড ইভ্যালুয়েশন। বি আই এম পরিচালিত কোর্স ।

৩. পারসোনাল ম্যানেজমেন্ট ফর ম্যানেজারস পরিচালিত বি আই এম কোর্স।

৪. ফটোগ্রাফী ডেপেলপমেন্ট। পাঠশালা ফটোগ্রাফী পরিচালিত কোর্স।

৫. ইংলিশ ল্যাগুয়েজ ডেভেলমেন্ট। এম.এ.বি পরিচালিত কোর্স।

৬. অর্গানাইজেশনাল ডেভেপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট। মুসলিম এইড ইউকে-এর পক্ষে পরিচালিত কোর্স।[২২১]

সাফল্য

সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষের সেবাদানের ক্ষেত্রে মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর কর্ম এলাকা ও উপকারভোগী লোকের সংখ্যা দিন দিন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শিক্ষাসহায়ক সেবাসমূহ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। কারিগরী শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রী ও বেকার যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহারে কমিউনিটি পর্যায়ে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছ উল্লেখযোগ্য হারে। ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রমও রেকর্ড ছাড়িয়েছে। সরকারি-বেসরকারি এবং দেশি-বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলিম এইড বাংলাদেশ এর সেবাধর্মী ও উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রকাশনা ও প্রচারণা দিন দিন বেড়ে চলেছে।[২২২]

মুসলিম এইড বাংলাদেশ শিক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসহ জরুরি ত্রাণ ও পূনর্বাসন কার্যক্রম এবং সেবাধর্মী বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য যদিও দেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা নিয়োজিত আছে, তথাপি মুসলিম এইড বাংলাদেশের কার্যক্রম অন্যদের থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। সকল পর্যায়ের জনশক্তির নৈতিক মান উন্নয়নের জন্য এ সংগঠন সব সময় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। সততা ও একাগ্রতার মাধ্যমে সম্পাদিত সার্বিক যেসব কার্যক্রম দেশের সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে :

নির্দিষ্ট খাতভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী পকিল্পনা প্রণয়ন।

---

২২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫
২২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
২২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসারে আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

স্বাস্থ্য-সেবা সম্প্রসারণে মোবাইল ক্লিনিক ও সেন্ট্রাল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।[২২৩]

মুসলিম এইড বাংলাদেশ দেশের লক্ষ লক্ষ অসহায় সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেবার জন্য এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১; *HELTH PROGRAMME 2005*, Muslim Aid Bangladesh, P. 4

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সে সব ইসলামী সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন[২২৪] তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন দেশের সব মসজিদকে মসজিদে নববীর আদর্শে হেদায়েত জারির প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই লক্ষ ও উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭৩ সাল থেকে কাজ করে আসছে। স্বাধীনতা উত্তর এক দ্বান্দ্বিক পরিবেশে যখন নবীন সমাজের কিছু অংশ এবং ইসলাম বিদ্বেষী কতিপয় বুদ্ধিজীবী ইসলামী আকিদা বিশ্বাস চিন্তা-চেতনা, ইসলামী তাহজীব-তামাদ্দুন ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল ঝড় তোলে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির আমদানী করে ওলামা-মাশায়েখ, ইসলামী আদর্শের অনুসারী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত মর্দ্দে মুজাহিদ এবং ইসলামী মনোভাপন্ন মানুষ প্রকাশ্যে পথে ঘাটে অপমানিত হতে থাকেন। অপসংস্কৃতি, অনৈতিকতা, বিবেকবিবর্জিত কর্মকাণ্ড ও অনৈসলামিক কাজের বিরুদ্ধে কথা বলাও অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে থাকে। মসজিদসমূহ ও মসজিদের ইমামগণের পক্ষে সঠিক ভূমিকা রাখাও সম্ভব ছিলনা ঠিক এমনই এক পরিবেশে ইসলামের তাহজীব ও তামাদ্দুনকে রক্ষা করতে, মসজিদ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কল্পে এবং দেশের সকল মসজিদকে মসজিদে নববীর আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মরহুম মাওলানা আলাউদ্দিন আল্ আজহারী দেশের শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বের পরামর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন গঠন করেন। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন তিনটি কর্মসূচীকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে।[২২৫] কর্মসূচী তিনটি হচ্ছে :

১. তাবলীগ দাওয়াত;
২. তা'লীগ ও তারবিয়াত;
৩. সমাজ সেবা ও সংস্কার ।[২২৬]

ইসলামী মূল্যবোধের বিকাশ, মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, মসজিদগুলোকে হেদায়েত জারির কেন্দ্ররূপে গঠন করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ, ইমামদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, মসজিদ সমূহে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন ও মুসল্লীদের ও মসজিদকেন্দ্রিক সংশ্লিষ্ট সকলকে ইসলামী অনুশাসন ও ইসলামী বিধানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মসজিদ মিশন বিভিন্নমুখী কর্মসূচী দিয়ে থাকে।

ইমাম প্রশিক্ষণ, হজ্ব প্রশিক্ষণ, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, মসজিদ কেন্দ্রিক দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস প্রোগাম, সংগঠিত মসজিদ সমূহে নিয়মিত মাসলা মাসায়েল ও সহীহ কুরআন তাফসীরের ব্যবস্থা, আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, আদর্শ হেফজখানা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, গণশিক্ষাসহ বিভিন্ন মুখী প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য স্যানিটেশন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা-চিকিৎসা সাহায্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী, শীত বস্ত্র বিতরণসহ নানামুখী সমাজসেবা ও সমাজসংস্কারমূলক কাজে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কার্যকরী পদক্ষেপ পালন করে আসছে। দেশের সকল জেলাসহ মোট ৭৭ টি সাংগঠনিক কার্যক্রম চালু আছে।[২২৭]

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশের সকল মসজিদকে মসজিদে নববীর আদর্শে গড়ে তুলে মসজিদ কেন্দ্রিক আদর্শ ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে নিম্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে-

---

২২৪. বাংলাদেশ মসজিদ মিশন-এর প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : কেন্দ্রীয় মসজিদ, কাঁটাবন, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
২২৫. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৫*, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, পৃ. ২
২২৬. *প্রাগুক্ত*
২২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

১. তাবলীগ ও দাওয়াত

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং শান্তি, নিরাপত্তা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সুস্থতা সর্বোপরি মানব জীবনের সকলদিকে পরিপূর্ণতার চরম বিকাশ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরনের মাধ্যমেই সম্ভব। ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গরূপটি সহজ সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় এবং কর্মের মাধ্যমে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা মসজিদ মিশনের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের শাশত ও পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার আহ্বান জানানো। মসজিদ মিশনের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে সমাজের সমগ্র মানুষের অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া। দাওয়াতের মাধ্যমে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো জনসাধারণের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয় :

ক. জুমু'আর খুতবা ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আগে বা পরে তাফসির ওয়াজ মাহফিল, আলোচনা সভা ইত্যাদি;

খ. ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দাওয়াত;

গ. পরিচিতি, লিফলেট, বই, পুস্তকাবলি ও পোস্টারিং ইত্যাদি;

ঘ. দাওয়াতী সপ্তাহ, দাওয়াতী অভিযান, সূধী সমাবেশ ইত্যাদি;

ঙ. পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দাওয়াত;

চ. ইমাম সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ইত্যাদি।[২২৮]

২. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

ইমাম প্রশিক্ষণ, হজ্ব প্রশিক্ষণ, মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, মসজিদকেন্দ্রিক আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, আদর্শ হেফজখানা, সবার জন্য শিক্ষা প্রকল্প, মসজিদ কেন্দ্রিক বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ইসলামী পাঠাগার স্থাপন সহীহ কুরআন তালীম, হেফজ ও কিরআত প্রতিযোগিতা, তাফসীর প্রতিযোগিতার আয়োজনসহ নানামূখী প্রশিক্ষণ প্রোগাম-বাস্তবায়িত হয়।[২২৯]

৩. সমাজ সেবা ও সমাজসংস্কার

মসজিদকেন্দ্রিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, এতিমদের সাহায্য, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। শীত বস্ত্র ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ, গরিবদের মাঝে কোরবানীর সময় অর্থ ও কাপড় বিতরণ, ইফতারী প্রোগাম বাস্তবায়ন অভাবী লোকদের দাফন-কাফনে সাহায্য, মেধাবী অথচ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, পরিবেশ সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও বৃক্ষরোপণ করা, সবার জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষে ইমাম সাহেবদের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচীর মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। কুসংস্কার ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা,শিরক বিদ-আত দূর করার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন করা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, মদ্যপান, জুয়া ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহনে জনগণকে তাদের হক ও পারস্পরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। জুমআর খুতবাতে যুগোপযোগী এবং দলিল ভিত্তিক খুতবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন সর্বসাধারণের নৈতিক শিক্ষা, দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, অসহায় অভাবী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বৃত্তি প্রদান সর্বোপরি সমাজের অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিষয়ে সঠিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।[২৩০] এদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচী নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

---

২২৮. *প্রাগুক্ত*
২২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫
২৩০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

আল-আমান

বাংলাদেশ সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে রেজিস্ট্রেশনকৃত একটি ইসলামী সেবাসংস্থা হচ্ছে আল-আমান। বাংলাদেশে পরিচালিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের মধ্যে আল-আমান[২৩১]-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। নিচে এই সংস্থার কর্মসূচী সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

কর্মসূচী

১. ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প;

২. গৃহায়ণ প্রকল্প;

৩. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প;

৪. আর্সেনিকমুক্ত পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্প।

আল-আমান একটি ইসলামী সেবা সংস্থা। দেশের সাধারণ সেবা সংস্থাসমূহের মত এই সংস্থাও বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও নিজেদের অর্থের বরাদ্দের মাধ্যমে সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে। সংস্থাটি ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং সেই আলোকে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চেষ্টা করে। তাদের কর্মসূচীগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ প্রকল্প

সংস্থাটির কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান হল গরিব মানুষের সাহায্য প্রদানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় চার/পাঁচ হাজার টাকা ঋণ হিসেবে দেওয়া। এর দ্বারা আর্ত-পীড়িত মানুষ তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে পারে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ সংস্থাটি কর্মতৎপরতা চালায়। ভূমিহীন, অসহায়, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা ও নিম্নআয়ের কর্মজীবী মানুষের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করে থাকে।

ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থাটি দরিদ্রশ্রেণীর মানুষকে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান করে থাকে। তাদের কর্মতৎপরতায় এলাকার হত দরিদ্র মানুষ ঋণ নিয়ে ভ্যান, রিক্সা, ধান ছাটাই, মাংসের ব্যবসা, হস্ত শিল্প, সবজি চাষ, গাভী পালন, ছাগল পালন, কাঠের ব্যবসা, মুদি দোকান, সাইকেল গ্যারেজ, নার্সারী, হাঁস-মুরগী পালন, দর্জি, মাছ চাষ ইত্যাদি বহুমুখী ও লাভজনক কাজ-কর্ম করে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সচেষ্ট।

গৃহায়ণ প্রকল্প

দরিদ্র জনগোষ্ঠির গৃহায়ণ সমস্যা লাঘবের জন্য প্রত্যেকবার বাজেটে একটি বড় অংশ গৃহায়ণ তহবিল গঠনের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই তহবিল থেকে এনজিও এবং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গৃহহীন দরিদ্র ও নিম্নবিত্তদের গৃহায়ণের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করা হয়। আল-আমান ইসলামী সেবাসংস্থাটি এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট থেকে লোন নিয়ে গরিব অসহায়দের ঘরবাড়ী তৈরি করার জন্য গৃহায়ণ প্রকল্প চালুর মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দেয়। তাদের এই প্রকল্পে কিছুটা হলেও মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

---

২৩১. আল-আমান সেবা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স (৪র্থতলা), ঢাকা, রেজিঃ নং ৯৮০

Dhaka University Institutional Repository

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

সমাজের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির শিক্ষার হার বাড়ানো সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প এলাকায় প্রতিদিন সকালবেলা সকল শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেয়। আর এ প্রকল্পে সংস্থাটি নিজের ফান্ড থেকে অর্থ বরাদ্দ করে দরিদ্র মানুষের বইয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। সংস্থার এ প্রকল্প দরিদ্র মানুষের সার্বিক স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আর্সেনিক মুক্ত পানি ও স্যানিটেশন প্রকল্প

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রম আল-আমানের অন্যতম কর্মসূচী। বর্তমানে কর্ম এলাকায় প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতে টিউবওয়েল আছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য দুর্গত এলাকায় পানি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার সমাধান দিয়ে থাকে। আর এ প্রকল্পে আল-আমানকে সাহায্যে করে থাকে ইউনিসেফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, এনজিও ব্যুরো। অর্থাৎ এ সংস্থাটি থেকে তারা তাদের কর্মের জন্য ফান্ড পেয়ে থাকে। এই কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আল-আমানের দুর্গত এলাকায় বেশ প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপনের জন্য আল-অমান থেকে খুব কম মূল্যে সকল উপকরণ নিতে পারে। ফলে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

আলোচ্য চারটি প্রকল্পে আল-আমান বর্তমান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প এলাকায় মানুষ এই সংস্থার নিকট থেকে সেবা নিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (মক্কা)

মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (মক্কা)[২৩২] বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠির সার্বিক কল্যাণ ও মুক্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থাটি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট স্টক কোম্পানী থেকে এবং ২০০২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে নিবন্ধনকৃত। অধিকারবঞ্চিত অসহায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে সুশিক্ষা, আত্মকর্মসংস্থান, নারী জাতির আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা দুর্যোগ মুহূর্তে সাহায্য-সহানুভূতি প্রদানসহ মাদাকাসক্তি ও যুব চরিত্র বিধ্বংসী সকল অপতৎপরতা প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশ গঠনে ভূমিকা রাখা মসজিদ কাউন্সিল-এর কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।[২৩৩]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মসজিদে নববীর অনুসরণে বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা। এই সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মসজিদ কাউন্সিল যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেগুলো হচ্ছে।[২৩৪]

১. এলমে দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়া প্রকল্প;

২. ইমাম প্রশিক্ষণ;

৩. মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা;

৪. আইডিয়াল ভিলেজ প্রজেক্ট;

৫. চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগাম;

৬. ভিলেজ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট;

৭. ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস;

৮. সহিহ্ কুরআন শিক্ষা প্রকল্প;

৯. সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

১০. স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্প;

১১. সুদমুক্ত আয়বর্ধক কর্মসূচী;

১২. আই ক্যাম্প প্রকল্প;

১৩. মাদক বিরোধী প্রচরণা ও এইডস সংক্রান্ত সচেতনতা ইত্যাদি।

১. এলমে দ্বীন শিক্ষা ও দাওয়াত প্রকল্প

আখরাতে মুক্তি, পার্থিব কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে মসজিদ কাউন্সিল সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইসলামের সু-মহান আদর্শকে অত্যন্ত সহজ, সরল ও সাবলীল পন্থায় সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়াকে মসজিদ কাউন্সিল ঈমানী দায়িত্ব মনে করে থাকে।

---

২৩২. মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি অ্যাডভান্সমেন্ট (মক্কা)-এর প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : বাড়ী নং-৪,রোড নং-৩, সেক্টর-৪, উত্তরা ঢাকা-১২৩০

২৩৩. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৫*, মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট, পৃ. ২

২৩৪. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

এজন্য দাওয়াতী সভা, দারসূল কুরআন ও হাদীস, ওয়াজ মাহফীল ও ইফতার মাহফীলের আয়োজনসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক বই, মাসিক পত্রিকা, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রচার করছে।[২৩৫]

২. ইমাম প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশে প্রায় ৩ লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে। এসব মসজিদে কমপক্ষে ৬ লক্ষাধিক ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা একটা বিরাট জনশক্তি। এ জনশক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জন-সম্পদে পরিনত করার লক্ষে মসজিদ কাউন্সিল ইমাম প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর্মসূচী চালু করেছে। ইমামগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা উল্লেখসহ দক্ষতার সাথে জুমআর খুতবা প্রদান, মসজিদভিত্তিক মক্তব পরিচালনা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, আর্সেনিকের ভয়বহতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবহার ও এইড্স থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করে থাকে।[২৩৬]

৩. মসজিদভিত্তিক শিক্ষা

মসজিদ কাউন্সিল গ্রামের দুঃখী অসহায় সুযোগবঞ্চিত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্যে মসজিদভিত্তিক আদর্শ মক্তব চালু করেছে। এসব মক্তবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে সহীহ্ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষা, বাংলা, ইংরেজী, গণিত, পরিবেশ পরিচিতিসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। ৩৩ জন শিক্ষার্থীর-সমন্বয়ে গঠিত প্রতিটি মক্তবে আড়াই ঘন্টা পাঠদান কর্মসূচী পরিচালিত হয়। মক্তবসমূহ মসজিদ কাউন্সিলের নিজস্ব কারিকুলাম দ্বারা ১ম শ্রেণী থেকে ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়ে থাকে। নির্ধারিত কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। এদের শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলায় ১১০ টি মসজিদে এ ধরনের মক্তবে ৩৬০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যায়নরত আছে। এছাড়াও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও বয়স্কদের কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র চালু রয়েছে। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রতিমাসে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় হচ্ছে।[২৩৭]

৪. চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগাম

বাংলাদেশের অসহায় নারী দু'মুঠো খাবার বা সামান্য অর্থের বিনিময়ে বেচে দিয়েছে তার কলিজার টুকরো আদরের সন্তানকে। অনেক মা আবার হাসপাতালে, রেলস্টেশনে, ফুটপাতে বা ডাস্টবিনে ফেলে চলে যাচ্ছে তার গর্ভজাত সন্তানকে। অনেকে আবার সামাজিক অনাচারের শিকার হয়ে লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পেতে লোকচক্ষুর অন্তরালে ত্যাগ করে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে। আল্লাহ্ ছাড়া এদের হেফাজতের আর কেউ নেই। এসব এতিম, প্রতিবন্ধী ও পরিত্যক্ত শিশুদের প্রতিপালন ও পূনর্বাসন জন্যে মসজিদ কাউন্সিল চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগাম চালু করেছে। ১লা জানুয়ারী ২০০৪ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ২৬ ছেলে ও ১৫ জন, মেয়েসহ মোট ৪১ জন শিশু এখানে প্রতিপালিত হচ্ছে। এদের উত্তম বাসস্থান, উন্নতমানের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও সেবা প্রদানকারীদের বেতন ভাতাসহ মাসে প্রায় ৯০,০০০/- টাকা ব্যয় হয়।[২৩৮]

৫. ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

মসজিদ কাউন্সিল ঢাকা মহানগরীতে ফ্রি ও স্বল্প ভাড়ায় সারা দেশে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা করে থাকে। গরিব অসহায় ও বেওয়ারিশ লাশ দাফন কাফনের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়া অসহায়, দুঃস্থ গরিব রোগী পরিবহণের জন্য মক্কার এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস রয়েছে। এই এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস প্রয়োজনে স্বচ্ছল রোগীদের পরিবহণের জন্য স্বল্প মূল্যে ভাড়া দিয়ে থাকে।[২৩৯]

---

২৩৫. *প্রাগুক্ত*
২৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
২৩৮. *প্রাগুক্ত*
২৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

৬. আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচী

আয় থেকে দায় শোধের ভিত্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষে মসজিদ কাউন্সিল আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইমামগণ বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে। ছোট ছোট সমিতি গঠন, সাপ্তাহিক মিটিং, সাপ্তাহিক সঞ্চয়, প্রয়োজনের সময় নির্ধারিত খাতে সুদমুক্ত বিনিয়োগ প্রদান এ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলায় এ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে প্রায় ১০৫০০০০০ টাকা সহযোগিতা প্রদান করেছে মসজিদ কাউন্সিল।[২৪০]

৭. মাদকতা বিরোধী প্রচারণা ও এইড্স রোগ সম্পর্কে সচেতনতা

মাদকাসক্তি ও ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মসজিদ কাউন্সিলের রয়েছে বিশেষ কর্মসূচী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মাদকাশক্তি ও ধূমপান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার ওপরে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে প্রচার ও প্রসারে মসজিদ কাউন্সিল সব সময় নিয়োজিত। এছাড়া এইডস্ একটি মারাত্মক ব্যাধি। এর পরিণতি কী, এই রোগ কেন হয়, কিভাবে এই রোগ ছড়ায় এবং কিভাবে এই রোগ থেকে বাঁচা যায় সে সম্পর্কে সচেতনতা অর্জনের লক্ষ্যে মসজিদ কাউন্সিল বিশেষ প্রচারণার ব্যবস্থা করে থাকে। ইমামদের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে এই রোগের ভয়াবহতা ও এর প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য দিয়ে থাকেন।[২৪১]

৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা

অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠির মাঝে মসজিদ কাউন্সিল সহীহ্ কুরআন শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের মসজিদসমূহে বিনামূল্যে অশিক্ষিত মানুষ যারা সহীহ্ কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না তাদের জন্য সহীহ্ কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে।[২৪২]

৯. সেলাই শিক্ষা কেন্দ্র

এদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করে জীবন যাপন করে থাকে। বিশেষত নারী সমাজের অবস্থা আরো শোচণীয়। অধিকাংশ নারীই অর্থনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল। ফলে তাদের নানা লাঞ্ছনা, গঞ্জনার শিকার হতে হয়। ফলে স্বামী পরিত্যক্তা নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। মসজিদ কাউন্সিল এসব অসহায় নারীদের জীবিকার জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।[২৪৩]

১০. স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্প

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মসজিদ কাউন্সিল নিরলস কাজ করে চলছে। এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র, অসহায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান করে থাকে।[২৪৪]

১১. আই ক্যাম্প প্রকল্প

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে। বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতেই তাদের জীবন ওষ্ঠাগত। ফলে সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি তেমন দৃষ্টি নেই। এসব অভাবী মানুষের বেশিরভাগ চোখের নানা জটিল রোগে ভুগে থাকে। ফলে অল্পবয়সে তাদের অন্যের বোঝা হয়ে জীবন যাপন করতে হয়। মসজিদ কাউন্সিল এই সব অসহায় মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে চক্ষুচিকিৎসা সেবা প্রদান করে দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।[২৪৫]

---

২৪০. *প্রাগুক্ত*
২৪১. *প্রাগুক্ত*
২৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
২৪৩. *প্রাগুক্ত*
২৪৪. *প্রাগুক্ত*
২৪৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের এমন কোন স্থান নেই যেখানে আযানের ধ্বনি শোনা যায়না। মসজিদের ইমাম, মোয়াজ্জিন, মোতাওয়াল্লী, কমিটির লোকজন এবং মুসল্লিরা পরিকল্পিত উদ্যোগ নিয়ে অনায়াসে প্রতি জুম্মায় মহল্লার অসহায় কোন মানুষকে পূনর্বাসিত করতে পারেন। এভাবে প্রায় তিন লাখ মানুষ আল্লাহ্‌র সন্ধান লাভ করতে পারেন। প্রতিটি মসজিদে কোরআন শিক্ষা, মাসয়ালা মাছায়েল শিক্ষাসহ তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, গণিত, ইংরেজীসহ সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে পারে অধিকার বঞ্চিত বনি আদম। কেবলমাত্র ফতোয়া দিয়ে সেবার মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন গঠনমূলক উদ্যোগ। প্রয়োজন ইতিবাচক কর্মসূচী। মসজিদ কাউন্সিল কর্তৃক পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্যবিমোচন কর্মসূচী এ সমস্যার দ্রুত সমাধান করবে। প্রতিটি মসজিদের ইমাম এবং মুসল্লিরা সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট মহল্লার সংস্কার এবং সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। যাকাত, ওশর, ছাদকা, এমনকি মুষ্টি চাউলও এসব কাজে আয়ের উৎস হতে পারে। প্রতিটি মসজিদ কেবলমাত্র তার এলাকার দায়িত্ব নিলেই সারা বাংলাদেশ সমৃদ্ধি লাভ করবে। এ কাজে প্রয়োজন সকলের পরামর্শ ও কার্যকর সহযোগিতা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন

দরিদ্র, অসহায়, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইসলামী এনজিও তাদের নিরলস কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এসব এনজিওর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন।[২৪৬] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী শরীয়াহ্ভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ১৯৮৩ সালে[২৪৭] ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সমাজের দুঃস্থ মানবতার সেবা পরিচালনার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[২৪৮]

১. আর্ত মানবতার সেবা;

২. শিক্ষা সম্প্রসারণ, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা;

৩. আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

৪. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণ;

৫. শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন;

৬. ইসলামী মতাদর্শের প্রচার, প্রসার ও গবেষণামূলক কর্মকান্ডে উৎসাহ দান করা;

৭. বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি;

৮. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা বিবেচনা করে তাদের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন চেয়ারম্যান একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও একজন সদস্য সচিবসহ ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে। এই পরিচালনা কমিটি ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক ৩ বছরের জন্য গঠিত হয়।[২৪৯] এছাড়া ফাউন্ডেশন নির্বাহী কমিটি ও বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের দৈনিন্দিন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

আয়ের উৎস

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তার বেশির ভাগ আসে নিম্নে বর্ণিত উৎস থেকে।[২৫০]

---

২৪৬. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ১৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

২৪৭. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৫*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, পৃ. ১৪

২৪৮. *প্রাগুক্ত*

২৪৯. *প্রাগুক্ত*

২৫০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের যাকাত;

২. দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান;

৩. শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংকের এমন আয়সমূহ। এসব আয় ব্যাংকের মুনাফার অন্তর্ভুক্ত না করে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনে প্রদান করে;

৪. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব প্রকল্প থেকে আয় ইত্যাদি।

বিভিন্ন অনুদান, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহমুক্ত নয় ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের এমন আয় এবং প্রকল্প আয়ের হিসাবসমূহ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ব্যয় করা হয়।

কার্যক্রম

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুঃস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্থ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং সমাজের বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব প্রকল্প ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উপস্থাপন করা হল[২৫১]

আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে কর্মক্ষম জনশক্তি রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানাবিধ অবাঞ্ছিত পথ অনুসরণ করে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। অতএব প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের ভিক্ষার হাতকে কর্মীর হাতে পরিণত করা সম্ভব। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা, দুগ্ধবতী গাভী পালন, হাঁস-মুরগী পালন, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী গঠন, সেলাই প্রশিক্ষণ, রিক্সা প্রকল্প, আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[২৫২]

শিক্ষা কার্যক্রম

জাতির উন্নতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষার অবস্থান হলেও শিক্ষার মান তুলনামূলকভাবে নিচে। প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাব, উপায়-উপকরণের স্বল্পতা, সর্বোপরি প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অধিকাংশ ছেলে মেয়েই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অশিক্ষার এই অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন তার সীমিত শক্তি সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের এককালীন সহায়তা প্রদান করে থাকে।[২৫৩]

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম

মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ তার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে দরিদ্র, অসহায় মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা দানের লক্ষ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে সহায়তা, দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসার জন্য এককালীন সহায়তা, নলকুপ স্থাপন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করে।[২৫৪]

---

২৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬
২৫২. *প্রাগুক্ত*
২৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
২৫৪. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মানবিক সাহায্য দান কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দুঃস্থ, অসহায় মানুষকে তাৎক্ষনিকভাবে সম্ভাব্য সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে মানবিক সাহায্য দান কর্মসূচী পরিচালনা করে। খাদ্য ও বাসস্থানের ন্যায় একান্ত অপরিহার্য মৌলিক চাহিদাগুলো যারা পূরণ করতে সক্ষম নয় এই কর্মসূচীর আওতায় তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা হয়। এতিমখানা নির্মাণ ও পরিচালনায় সহায়তা দান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কার্যক্রমের আওতায় কন্যাদায়গ্রস্তদের এককালীন সহায়তাদান, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধে সহায়তা দান, দুর্দশাগ্রস্ত মুসাফিরদেরকে সহায়তা দান ইত্যাদি কাজ পরিচালনা করে।[২৫৫]

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যে কোন জরুরি অবস্থায় ত্রাণকার্য পরিচালনা করা ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা ও নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ফাউন্ডেশন তার সামর্থ্য অনুযায়ী দুর্যোগ এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।[২৫৬]

দাওয়াহ্ কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন হতে দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় সুধী ও বুদ্ধিজীবী মহলসহ সমাজের বিভিন্নস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে গবেষণাধর্মী ইসলামী সাহিত্য ও পত্র-পত্রিকা বিতরণ করা হয়। জাতি পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থায় অনুদান প্রদান, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারে ইসলামী সাহিত্যগ্রন্থ প্রদান এবং অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিতে দাওয়াহ কর্মসূচী এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।[২৫৭]

খাতনা ক্যাম্প

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্যতম সুন্নাত হল খাতনা করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ সুন্নাতের সূত্রপাত হওয়ার পর অদ্যাবধি উম্মতে মোহাম্মদীর উপরও এটি অন্যতম অপরিহার্য সুন্নাত হিসেবে বহাল রয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও খাতনা যে স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও প্রয়োজন তা প্রমানিত হয়েছে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কোন অংশে কম নয়। তথাপিও আমাদের দেশের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী মূলত দারিদ্র্যের কারণে এই সুন্নাতটি পালনে ব্যর্থকাম হয়। আবার অনেকেই এ ব্যাপারে এখনো পুরোপুরি সচেতন নয়। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন এ দেশের আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ফাউন্ডেশন তার নিজস্ব অর্থায়নে চলতি বছরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালসমূহের সহায়তায় দেশের গরিব, অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্থ জনগণের সন্তানদের খাতনা করানোর এক মহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

২০০৪ সালে শুরু হয়ে ইতোমধ্যে সারাদেশে ২৯টি খাতনা ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের ২১৭৫জন শিশুর খাতনা সম্পন্ন করা হয়েছে। গরিব এসব শিশুর বিনামূল্যে খতনা করানোর পাশাপাশি শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে লুঙ্গি ও গেঞ্জি প্রদান করা হয়। ফাউন্ডেশন এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ভবিষ্যতে সকলের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে।[২৫৮]

---

২৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮
২৫৬. *প্রাগুক্ত*
২৫৭. *প্রাগুক্ত*
২৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ গ্রামে বাস করে। তাদের বেশির ভাগই দারিদ্র্যের শিকার। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণেও তারা ব্যর্থ হয়। সারা বছরই তারা চোখের রোগসহ নানা জটিল রোগে ভোগে। এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে, দেশের রোগাক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০% বিভিন্ন ধরণের চোখের রোগে ভুগে থাকে। মানব জীবনে চোখ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। অথচ প্রতিবছর অন্ধত্ব ও নানাবিধ চোখের অসুখে দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধার অভাবে এ ধরনের মানুষের দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, বর্তমানে দেশের প্রায় ৬ লক্ষ লোক অন্ধত্বজনিত সমস্যায় আক্রান্ত যাদের অপারেশনের মাধ্যমে প্রায় অধিকাংশেরই চোখের জ্যোতি ফিরে পাওয়া সম্ভব। এছাড়া প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক নানাবিধ চোখের সমস্যায় আক্রান্ত হয়। সামগ্রিকভাবে প্রতিবছর বিভিন্ন চক্ষু রোগে আক্রান্ত প্রায় ২ লক্ষ লোকের অপারেশনের প্রয়োজন হয়। চোখের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত এ বিপুলসংখ্যক দরিদ্র জনগণের সু-চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তাদের সুস্থ করে তুলে কর্মক্ষম করার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের পাশাপাশি সমাজের বিপুল বোঝাকে সম্পদে পরিণত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন গ্রহণ করেছে কম খরচে চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন স্থানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র ২০ টাকা এন্ট্রি ফি এবং ১৫০০ টাকায় লেন্স এর সাহায্যে চোখের ছানি অপারেশন করার ফলে ব্যাপকভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে।[২৫৯]

উল্লেখিত নিয়মিত কার্যক্রম ছাড়াও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে যে দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। সেগুলো নিচে দেয়া হল[২৬০] :

১. ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, মতিঝিল ও কাকরাইল (ঢাকা), রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল;

২. ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল, সাতক্ষীরা, মানিকগঞ্জ, রংপুর, ঝিনাইদহ, দিনাজপুর, ফরিদপুর, নওগাঁ ও মাদারীপুর;

৩. ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী;

৪. ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, রাজশাহী;

৫. ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, পল্টন ও ফার্মগেট (ঢাকা), চট্টগ্রাম, সিলেট ও বগুড়া;

৬. ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ১৪৭ গ্রীনরোড, ঢাকা;

৭. মনোরম ইসলামী ব্যাংক ক্রাফটস এন্ড ফ্যাশন, ২৩ পরিবাগ, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা;

৮. দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা;

৯. ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস সেন্টার, নোয়াখালী, ফেনী, চাঁদপুর, মানিকগঞ্জ ও সেন্টমার্টিন।

এভাবে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

এছাড়া সমাজের ধনী ব্যক্তিদের প্রদত্ত যাকাতের অর্থ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নিম্নলিখিত খাতে ব্যবহার করে থাকে–[২৬১]

১. গরিব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দরিদ্র অসহায় মানুষের সহযোগিতা করে থাকে।

---

২৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
২৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১
২৬১. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

২. গরিব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান করা এবং গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করে প্রদান গরিব মহিলাদের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

৩. সমাজের দরিদ্র অসহায় মানুষের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নগদ অর্থ প্রদান করে থাকে।

৪. দুঃস্থ, অসহায় গৃহহীন মানুষের বাসগৃহ নির্মাণে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন নগদ অর্থ প্রদান করে থাকে।

৫. পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণসহ মানবিক প্রয়োজন পূরণে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৬. এতিমখানা ও লিল্লাহ্ বোর্ডিং-এর ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণ-পোষণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৭. ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৮. দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার নির্বাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

৯. গরিব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

১০. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করে।

১১. দুঃস্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করে।

দেশে পরিচালিত অন্যান্য ইসলামী এনজিওর ন্যায় ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ও আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিঃসন্দেহে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এই কার্যক্রম প্রশংসার দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস)-কুয়েত

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস)[২৬২] কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস, ১৯৯৬ সালে কুয়েত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ইসলামিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সকল মানুষের সেবায় নিয়োজিত একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।[২৬৩] এই প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ-এর মধ্যে ভেদাভেদ নেই। বাংলাদেশে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমের দ্বারা মুসলমানদের পাশাপাশি খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দুসহ সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ সেবা ভোগ করছে এবং জনসাধারণ উপকৃত হচ্ছে। রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কর্তৃক বাংলাদেশে পরিচালিত কার্যক্রম নিম্নে বর্ণিত হল–

এতিমখানা প্রকল্প

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি এ পর্যন্ত ঢাকার উত্তরায় ১৫০ জন এতিম মেয়ে, গাজীপুরের ভাউরাইদে (পোড়া বাড়ি) ৪০০ জন এতিম ছেলে ও ময়মনসিংহে ১৫০ জন এতিম ছেলের পুনর্বাসনে মোট তিনটি এতিমখানা পরিচালনা করে আসছে। এসব এতিমখানায় ৬ থেকে ১২ বছরের এতিম শিশুদের ভর্তি করা হয়েছে। তাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, লেখাপড়া, খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এসব শিশুর প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুমোদিত বোর্ডের বই পাঠ্য হিসেবে পড়ানো হয়ে থাকে। এর সাথে ইংরেজি ও আরবি ভাষার ২টি বই পাঠ্য হিসেবে যুক্ত রয়েছে। ১৬ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ায় এ পর্যন্ত এদের থেকে ৮০ জন এতিম ও তাদের মায়েদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি করে সেলাই মেশিন উপহার দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[২৬৪]

মেডিক্যাল প্রোগ্রাম

এই প্রকল্পের অধীনে আরআইএইচএস ঢাকার বনানীতে স্বল্পমূল্যের ভিত্তিতে একটি অত্যাধুনিক কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার পরিচালনা করছে। এতে গত বছরে ৩৬ হাজার ডায়ালাইসিস সম্পন্ন হয়েছে। গত ৫ বছরে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ৪টি, বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল ২টি, ঢাকা মেডিক্যাল ২টি ও সলিমুল্লাহ মেডিক্যালে ২টিসহ মোট ১০টি অতি মূল্যবান ও অত্যাধুনিক ইনক্যান্ট ইনকিউবেটর ডোনেশন করা হয়েছে। এসব মেশিনের মাত্র ২টিতে প্রথম ১ বছরে ১ হাজার শিশুকে রাখা হয়েছে। এছাড়া ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি ঢাকাকে কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ অপারেশন থিয়েটারের সম্পূর্ণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রদান করেছে আরআইএইচএস। এসব ডোনেশনে প্রায় দেড় কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এছাড়া রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি পরিচালিত মোবাইল মেডিক্যাল টিম গত পাঁচ বছরে ৩৫ হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে। বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত ১৫টি মেডিক্যাল ক্যাম্পের মাধ্যমে ৭ হাজার ৫শত রোগীকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে।[২৬৫]

---

২৬২. রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আরআইএইচএস)-কুয়েত-এর বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : বাংলাদেশ অফিস, উত্তরা, ঢাকা।

২৬৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০৫/১০/২০০৫

২৬৪. *প্রাগুক্ত*

২৬৫. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ নির্মাণ প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীন গত ৯ বছরে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি বাংলাদেশের প্রায় ৪৫টি জেলায় এ পর্যন্ত ৭ শতাধিক ছোট বড় পাকা বিল্ডিং এর মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং বর্তমানে প্রায় ২শত ১৫টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। যেসব জেলায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে সেই জেলাগুলো হল- ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, খুলনা, হবিগঞ্জ, চাঁদপুর, বরগুনা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, কুষ্টিয়া, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, পিরোজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা, কক্সবাজার, নরসংদী, বগুড়া, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঠাকুরগাঁও, গাইবান্ধা, রাজশাহী, রংপুর, পঞ্চগড়, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, যশোর, জয়পুরহাট, ময়মনসিংহ, বি-বাড়িয়া, জামালপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নাটোর, দেবীগঞ্জ এসব মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করে দেয়ার পর স্থানীয় লোকজনই তা রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করছে।[২৬৬]

অজুখানা নির্মাণ

রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-এ পর্যন্ত উল্লেখিত জেলাসমূহের মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় পানির ট্যাংক ও পানির পাম্প সম্বলিত ৮-১০-১২ সীটের ১১শ অজুখানা নির্মাণ করেছে। এছাড়া বর্তমানে ১০০ অজুখানা নির্মাণাধীন রয়েছে।[২৬৭]

টিউবওয়েল প্রকল্প

উল্লেখিত জেলাসমূহের আর্সেনিকমুক্ত এলাকায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের বিশুদ্ধ পানীয়জলের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আরআইএইচএস এ পর্যন্ত ৫ হাজার ৫শত টিউবওয়েল বসিয়েছে। বর্তমানে ১ হাজার টিউবওয়েল নির্মাণাধীন রয়েছে।[২৬৮]

প্রকাশনা প্রকল্প

শুধুমাত্র এতিম শিশুদের নামাজ, রোজা, আমল আখলাক শেখার জন্য কয়েকটি মাসলা-মাসায়েলের বই ও পবিত্র কুরআন শরীফ ছাপানোর একটি প্রকল্প রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি পরিচালনা করে থাকে।

রিলিফ প্রোগ্রাম

শীতের প্রাদুর্ভাব, বন্যা, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি দুর্গতদের জন্য চিড়া, মুড়ি, ডাল, স্যালাইন, কম্বল, সিআইসিটি অসহায় ও দুঃস্থদের মাঝে বিতরণ করেছে।

কোরবানী প্রোগ্রাম

কোরবানী ঈদের সময় ধনীদের পাশাপাশি গরিব, অসহায়, দুঃস্থ বিধবারা যাতে ঈদের মাংস খেতে পারে তার জন্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ বিরাট অংকের টাকার কোরবানীর ব্যবস্থা করে থাকে।

ইফতার প্রোগ্রাম

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এ পর্যন্ত রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ রমজান মাসে উল্লেখিত জেলাসমূহে গরির, অসহায়, দুঃস্থ, বিধবা রোজাদারদের জন্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি ৫৯ লাখ টাকার ইফতার কর্মসূচীর আয়োজন করেছে।

---

২৬৬. *প্রাগুক্ত*
২৬৭. *প্রাগুক্ত*
২৬৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ভোকেশনাল ট্রেনিং

শুধুমাত্র এতিমখানায় লালিত এতিমদের জন্য আরআইএইচএস সেলাই ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে।

কর্মসংস্থান প্রকল্প

এই প্রকল্পের অধীনে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা ১১শ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। যারা প্রকল্পে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছেন[২৬৯]।

উল্লেখিত সকল প্রকল্প ব্যয় পরিচালনার জন্য রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত ৭৭ কোটি ৯৩ লাখ টাকা ছাড় করিয়ে এনেছে। এ টাকায় যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে তা বাংলাদেশের মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটির কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

---

২৬৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

রাবেতা আলম আল ইসলামী

রাবেতা আলম আল ইসলামী[২৭০] ১৯৬২ সালে মক্কা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মক্কা ভিত্তিক রাবেতা আলম আল ইসলামী আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই সংস্থা ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন দেশে দুর্গত মানবতার সেবা করে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক দুর্যোগকালে এটা জরুরী সাহায্য প্রদান করে। বাংলাদেশে এই সংস্থা প্রথম কার্যক্রম শুরু করে ১৯৭৮ সালে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত বর্মী মুসলমানদের সেবার জন্য ১৯৮৭ ও ১৯৯১ সালে রাবেতা আলম আল ইসলমী যে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করেছে তা প্রশংসার দাবীদার।[২৭১] যখন খ্রিস্টান মিশনারীদের পৌনঃপুনিক আক্রমণের ফলে আটকেপড়া পাকিস্তানীদের ধর্ম রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল তখন রাবেতা তাদেরকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে খ্রিস্টান মিশনারী ও খ্রিস্টান এনজিওদের হাত থেকে রক্ষা করে। কক্সবাজার ও মিরপুরে রাবেতা আলম আল ইসলামী-র হাসপাতাল রয়েছে। বেকার যুবকদের ট্রেনিং দেবার জন্য একটি ট্রেনিং কেন্দ্র রয়েছে। বেকার যুবকদের মধ্যে সময় সময় রিক্সা বিতরণ করা ছাড়া উৎপাদনকারী কোন প্রকল্প এর হাতে নেই।

রাবেতা দারিদ্র্যবিমোচন ও আয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে তেমন অবদান না রাখলেও খ্রিস্টান ও সেকুলার এনজিওর বিরুদ্ধে সর্বদা প্রচারে লিপ্ত। রাবেতার সুনাম রক্ষাকারী যথোপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। রাবেতার প্রশাসনিক অবকাঠামো সুবিন্যস্ত করা এবং সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা খুব তীব্রভাবে বিভিন্ন মহলে অনুভূত হচ্ছে।[২৭২]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাবেতা আলম আল ইসলামী নিম্নলিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১. বিশ্ব মুসলামানদের মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি করা;
২. বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দ্বন্দ্ব ও কলহ নিরসন করা;
৩. অবক্ষয় রোধ করা;
৪. বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দারিদ্র্যবিমোচনের চেষ্টা করা;
৫. ইসলামী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা;
৬. ইসলামী রাজনীতিকে পুনর্বিকশিত করা;
৭. প্রাচীন ও নব্য জাহিলিয়াতের সকল দাবীর মুলোৎপাটন করা;
৮. মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায়সমূহ বিদূরিত করা;
৯. বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারে খোদায়ি দায়িত্ব পালন করা;
১০. ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা ইসলামী বিশ্ব লীগের পথ সুগম করা।[২৭৩]

তদানীন্তন যুবরাজ ফয়সালের উদ্যোগে সৌদি সরকারের পৃষ্টপোষকতায় পরিচালিত রাবেতা আলম আল ইসলামী একটি স্বায়ত্বশাসিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা। এই সংগঠন বিশ্বব্যাপী নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

---

২৭০. রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ৫/৫ গজনবী রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২৭১. মুহাম্মদ নুরুযযামান, *বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে* (ঢাকা : দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ৭৬
২৭২. *প্রাগুক্ত*
২৭৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠা;

২. মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা;

৪. মসজিদ প্রতিষ্ঠা;

৫. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা;

৬. বিভিন্ন ভাষায় মাসিক পত্রিকা প্রকাশ।[২৭৪]

বর্তমান বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তি গড়ে চলেছে উন্নত থেকে উন্নতর করে। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ অদ্যাবধি অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব ও হতাশার মত হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তৈরি হচ্ছে কর্মহীন, বেকার শিক্ষিত যুবক। সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তি, নৈতিকতার পুনরুজ্জীবন এবং মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে বর্তমানে প্রয়োজন ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে পরিকল্পিতভাবে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ আর আত্ম-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ। কর্মহীন, বেকার শিক্ষিত যুবকদের সমস্যাকে মনে রেখেই রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ পরিচালনা করে বিভিন্ন কর্মসূচী।[২৭৫]

রাবেতার কার্যক্রম বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে সীমিত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে রাবেতার সামান্য কিছু প্রকল্প দেখতে পাওয়া যেমন-

১. ফুয়াদ আল খতীব হাসপাতাল;

২. রাবেতা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র;

৩. রাবেতা এতিমখানা ও কলেজ।

১. ফুয়াদ আল খতীব হাসপাতাল

রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ আর্ত-মানবতার সেবার লক্ষ্যে সংগঠন পরিচালিত ফুয়াদ আল খতীব হাসপাতাল থেকে নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে।[২৭৬]

১. আউটডোর, ইনডোর, জরুরি বিভাগ, ফার্মেসী, এক্সরে ও প্যাথলজি বিভাগসহ হাসপাতাল ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখা;

২. প্রতি রবিবার সকল ধরনের টিকা দানের ব্যবস্থা;

৩. গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ সেবা;

৪. স্বল্প খরচে জেনারেল বেড, সিঙ্গেল কেবিন, ডাবল কেবিন, ও এসি কেবিন ব্যবস্থা;

৫. সাশ্রয়ী মূল্যে ল্যাপকল অপারেশন;

৬. মাত্র ৩০ টাকা ফি-তে এম.বি.বি.এস ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা।

৭. এক বছরের কম বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে হেপাটাইটিস-বি ভ্যাকসিন দেয়া;

৮. কম্পিউটারাইজড মেশিনে সব ধরনের প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা;

---

২৭৪. *প্রাগুক্ত*

২৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭

২৭৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

৯. সব ধরনের এক্স-রে ইসিজি, ইকো কার্ডিওগ্রাফী, আলট্রাসানোগ্রাফী করা;

১০. মহিলা রোগীদের জন্য মহিলা সনোলজিস্ট। এছাড়াও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা পরামর্শ, জেনারেল সার্জারি, ল্যাপরোস্কপিক সার্জারি, অর্থপেডিক সার্জারি, ইউরো সার্জারি, নিউরোও স্পাইনাল সার্জারি, ইন্টারনাল মেডিসিন, গাইনী ও অবসটেট্রিকস, শিশু চিকিৎসা, চক্ষু বিভাগ, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌন রোগ, বক্ষব্যাধি ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হয়।

২. রাবেতা কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রকল্প কেন্দ্র

কর্মহীন, বেকার শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ পরিচালিত রাবিতা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তার যাত্রা শুরু করে। যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবকেরা দেশে ও বিদেশে কাজ করে অবদান রাখছে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে। কর্মহীন, শিক্ষিত, বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত নিয়মিত কোর্সগুলো পরিচালনা করে থাকে এর মধ্যে ইলেট্রিক্যাল ট্রেডের ক্ষেত্রে পরিচালিত কর্মসূচীগুলো হল–

ইলেকট্রিক্যাল ট্রেড

১. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সাংকেতিক চিহ্ন ও মালামালের পরিচিতি প্রশিক্ষণ দেয়া;

২. বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডস-এর চিত্রসহ বেটেন ওয়্যারিং, সার্কেস কন্ডুইট ওয়্যারিং, কনসিল্ড ওয়্যারিং শেখানো;

৩. ওভারহেড লাইন হতে বাড়ির সার্ভিস লাইন টানা ও সংযোগ, মিটার বোর্ড ফিটিং;

৪. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড ও প্যানেল বোর্ড স্থাপন, সংযোগ ও মেরামতকরা;

৫. বাড়ি, অফিস, ফ্যাক্টরি ওয়্যারিং-এর আর্থিং করা;

৬. সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ বৈদ্যুতিক মটরের রিওয়াইন্ডিং করা;

৭. মটরের সাথে আধুনিক সুইচ বা স্টার্টার সংযোগ করা;

৮. প্রশিক্ষণ শেষে রাবিতা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের বাইরের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রত্যেককে বাস্তব কাজ শিক্ষার সুযোগ প্রদান;

৯. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ব্লু-প্রিন্ট তৈরিসহ ইস্টিমেট শেখানো।[২৭৭]

ওয়েল্ডিং ট্রেড

রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ বেকার যুবকদের কর্মদক্ষতা তৈরি করে বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষে ওয়েল্ডিং ট্রেড ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে–

১. ওয়েল্ডিং ট্রেডের মেশিন ও যন্ত্রপাতি পরিচিতি এবং ব্যবহার জানা;

২. বিভিন্ন প্রকার ওয়েল্ডিং পদ্ধতি ও ব্যবহার জানা;

৩. বিভিন্ন প্রকার জয়েন্ট তৈরি;

৪. বিভিন্ন প্রকার ধাতুতে ওয়েল্ডিং করা ও ইলেকট্রেডের ব্যবহার জানা;

৫. জাহাজ ওয়েল্ডিং করা : ১-জি,৩-জি, ভারটিক্যাল ও ওভারহেড পদ্ধতিতে ওয়েল্ডিং;

---

২৭৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন-২০০৫*, রাবেতা কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৬. পাইপে ওয়েল্ডিং ঃ এক্স-রে ৫-জি, ৬-জি ওয়েল্ডিং;

৭. গ্যাস কাটিং, অটোমেটিক গ্যাস কাটিং;

৮. স্পট ওয়েল্ডিং এবং মিগ ওয়েল্ডিং শেখানো;

৯. আধুনিক ওয়েল্ডিং পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান।[২৭৮]

রেডিও এন্ড টিভি

বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে–

১. রেডিওর বিভিন্ন স্টেজ সনাক্তকরণসহ মেরামত করা ছাড়াও নতুন রেডিও সেট তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া;

২. টু-ইন-ওয়ানের মেকানিক্যালসহ বিভিন্ন স্টেজ সনাক্ত করে ত্রুটিমুক্তকরণ;

৩. রঙিন ও সাদা কালো টিভির বিভিন্ন স্টেজ সনাক্ত করে যে কোন ধরনের ত্রুটিমুক্ত করণ;

৪. ভিসিপির বিভিন্ন স্টেজ সনাক্তকরণসহ ত্রুটির জন্য কোন্ কোন্ পার্টস দায়ী এবং ঐ স্টেজ এর কোন কোন পার্টস নষ্ট থাকতে পারে তার তালিকাসহ প্রশিক্ষণ দেয়া। এছাড়াও সিলেবাসের বাইরে প্রশিক্ষণ দেয়া;

৫. চার্জার লাইট, কলিং বেল, মিউজিক্যাল সার্কিট মেরামত ও তৈরিকরণ, লাইটিং সার্কিট, ইলেকট্রনিক্স কোয়ার্টজ ব্লক, এ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদিসহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স তৈরি ও মেরামত শেখানো;

৬. বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি ও মেরামত শেখানো;

৭. সার্কিট তৈরির কাজ ও নিয়ামাবলী শেখানো;

৮. এ্যামপ্লিফায়ার ডেক, সিডি ভিসিডি, এসটিভি তার মেরামত শেখানো হয়।[২৭৯]

অটো মেকানিক

বেকার সমস্যা বাংলাদেশের একটি বিরাট সমস্যা। এই সমস্যা সমধানের লক্ষ্যে রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেই লক্ষ্যে সংগঠনটি অটোমেকানিক বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

১. ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ চেনা ও কাজ সম্বন্ধে জানা;

২. অটো ওয়ার্কশপের বিভিন্ন টুলস চেনা;

৩. ইঞ্জিন খুলে বিভিন্ন অংশ সনাক্ত করে পুনরায় সংযোজন;

৪. ইঞ্জিনের সিস্টেমসমূহ যেমন ফুয়েল লুব্রিকেটিং, কুলিং, ইগানেশন, ট্রান্সমিশন, ব্রেক, সিস্টেম ই, এফ আই সিস্টেম সম্বন্ধে ভালভাবে জানা;

৫. গাড়ি সার্ভিসিং করা;

৬. একটি ইঞ্জিনকে ওভারহলিং করে স্টার্ট দেয়া;

৭. কোর্স শেষে কৃতকার্য ছাত্রকে প্রতিষ্ঠিত গ্যারেজে তিন মাসের এটাসমেন্ট এর ব্যবস্থা।[২৮০]

---

২৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

২৭৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ড্রাইভিং ট্রেড

গাড়ি চালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে দরিদ্রতা দূর করা এবং বেকার তরুণদের কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নতুন প্রাইভেট কার ও পিক আপ দিয়ে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ। এই কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য হল–

১. ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন;

২. গাড়ি চালনার পূর্ণ নিশ্চয়তা;

৩. লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সমস্ত থিওরি ও প্রাকটিস-এর নিশ্চয়তা;

৪. সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

৫. জিগজাগ, র‍্যাম, রোড-এ প্র্যাকটিস।[২৮১]

রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশন

বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ বেকার যুবকদের রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশন মেরামত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে সংগঠন নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে।

১. রেফ্রিজারেশন কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস্‌সমূহের ব্যবহার ও সংরক্ষণ;

২. ব্রেজিং কৌশল ও বিভিন্ন প্রকার ব্রেজিং জোড় তৈরিকরণ;

৩. ইলেকট্রিক্যাল এপ্ল্যায়েন্স: ফ্যান টিউব লাইট, সাধারণ লাইট, বিভিন্ন সার্কিট, বৈদ্যুতিক মটর সংযোগ ও সংরক্ষণ কৌশল;

৪. আবাসিক হিমায়ন ইউনিটসমূহ: রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, উইন্ডো টাইপ এসি, স্পিলিট টাইপ এসি সংরক্ষণ ও স্থাপন এবং কার এসি গ্যাস চার্জ।[২৮২]

৩. রাবেতা এতিমখানা ও কলেজ

রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশের অসহায় এতিম শিশুদের প্রতিপালনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এসব এতিম অসহায় শিশুদের লালন-পালন, তাদের স্বাস্থ্য-সেবা ও শিক্ষা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ রাবেতা এতিমখানা ও কলেজ পরিচালনা করে থাকে। রাবেতা পরিচালিত কলেজ থেকে অসহায় শিক্ষার্থীদের ইসলামী বিধান মোতাবেক জীবনাচরণ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে।[২৮৩]

রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ-এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সংগঠনটি সম্পূর্ণ হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ২০% তাত্ত্বিক এবং ৪০% ব্যবহারিক। রাবেতা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান করে থাকে।[২৮৪] তাছাড়া দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সহায়তা করে থাকে। রাবেতা আলম আল ইসলামী বাংলাদেশ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস অনুসরণ করে

---

২৮০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩
২৮১. *প্রাগুক্ত*
২৮২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
২৮৩. সাক্ষাতকার, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ অফিস, রাবেতা আলম আল ইসলামী, ঢাকা
২৮৪. *প্রতিবেদন-২০০৫*, রাবেতা কারিগরী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। আধুনিক চাহিদা মোতাবেক সংগঠন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। প্রশিক্ষণার্থীদের মনোরম পরিবেশে স্বল্প খরচে, আবাসিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। রাবেতা আলম আল ইসলামী পরিচালিত কর্মসূচী বাংলাদেশে স্বল্প পরিসরে হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংগঠন পরিচালিত কর্মসূচী নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি

জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি[২৮৫] দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। পশ্চাদপদ জনসাধারণের ন্যায্য অধিকার আদায়ে চালিয়ে যাচ্ছে নিরলস প্রচেষ্টা। জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির মূল লক্ষ্য। প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরি পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের পেশা কৃষি। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। বিশাল জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় উন্নয়নে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি গ্রামবাংলার প্রান্তিক চাষীদের সাথে অবিরাম কাজ করে চলেছে। নব উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি ও উন্নত চাষাবাদের কলাকৌশল চাষীদের কাছে পৌঁছে তাদের দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমিতি অবহেলিত ও বঞ্চিত কৃষকদের প্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়েছে।[২৮৬]

চাষী সমাজের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অদক্ষতা, অনগ্রসরতা, দরিদ্র প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে গ্রাম্য টাউট, অর্থলোভী মহাজন শ্রেণী ও এনজিও নামধারী একশ্রেণীর প্রতারক চক্র প্রতারণার জালে বন্দী করে ও সুদী মহাজনী ব্যবসার ফাঁদে আটকিয়ে অধিকার বঞ্চিত সহজ-সরল চাষী সমাজের হালের বলদ, মাঠের ফসল, ঘরের চাল প্রভৃতিসহ সর্বস্ব লুটে নিচ্ছে। কৃষিও কৃষকের স্বার্থরক্ষার শ্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের জন্ম হলেও তাদের কর্মসূচীতে কৃষি ও কৃষকদের প্রকৃত কল্যাণের দিকনির্দেশনা না থাকায় এসব আন্দোলন সংগঠন ও চাষী সমাজের সমস্যা অনুধাবনে ও সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পরিকল্পনা যতই কল্যাণকর হোক, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে সে পরিকল্পনা সাফল্যের মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়। তাই দেশ ও জাতির উন্নয়নের স্বার্থে সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি সুদৃঢ় ঐক্যের সেতুবন্ধন থাকা একান্ত প্রয়োজন।[২৮৭]

এসব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে ১৯৭৭ সালের ১৪ জুন ঢাকায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত চাষী প্রতিনিধিদের এক সাধারণ সভায় স্বাধীনতা পূর্বকালে কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন "পূর্ব পাকিস্তানী চাষীকল্যাণ সমিতির সভাপতি মাওলানা এ. কে. এম. ইউসুফকে চেয়ারম্যান করে" "বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি" নামে এ সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত করা হয়। বহির্বিশ্বে এর পরিচিতি সহজতর করার লক্ষ্যে এর ইংরেজী নামকরণ করা হয় Bangladesh peasants welfare Society(BPWS) এবং আরবীতে বলা হয় জামিয়াতুল ফাল্লাহিন আল- খায়রিয়া বাংলাদেশ।[২৮৮]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভূমিমালিক এবং ভূমিহীন চাষীদের মৌলিক প্রয়োজন যথা-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দরিদ্র দূরীকরণ, বেকারত্ব নিরসন নিরক্ষতার অবসান ও স্বাস্থ্য পুষ্টির ঘাটতি পূরণ ইত্যাদির জন্য চাষী সহায়ক

---

২৮৫. বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা : ৪৩৫-এ/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড়, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

২৮৬. *ত্রি-বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০-২০০২*, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, পৃ. ৫

২৮৭. *প্রাগুক্ত*

২৮৮. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিতকরণ, তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো, নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, যৌথ ও লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ সহযোগিতাদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ জনশক্তিরূপে গড়ে তুলে আত্ম-কর্ম সংস্থানে উদ্বুদ্ধ করাই হল বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[২৮৯]

কার্যক্রম

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি প্রথম ৩ দফা কর্মসূচী নিয়ে তার যাত্রা আরম্ভ করে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ময়দানের দাবী পূরণ করতে গতিশীল এ সংস্থাটি বিভিন্ন সময়ে তার কর্মসূচী বর্ধিত করণের মাধ্যমে বর্তমানে ৬ দফা কর্মসূচীতে উন্নীত করেছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে ৬ দফা কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়নের কৌশল উপস্থাপন করা হল।[২৯০]

১ম দফা

উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। চাষী সমাজ দেশ ও জাতির মূল নিয়ামক। তাদের ঐক্যবদ্ধতা ব্যতীত দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন অসম্ভব। তাই বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির ১ম দফা কর্মসচী হল- "সমমনা চাষীদেরকে সদস্যভুক্ত করে সমিতি গঠনের মাধ্যমে সকল স্তরের চাষী সমাজকে সংগঠিত করা।"[২৯১] সংক্ষেপে এ দফাকে বলা হয় সংগঠন। এ দফার প্রধান কাজগুলো হচ্ছে-

১. সমমনা চাষীদের সদস্যভুক্ত;

২. সদস্যভুক্ত চাষীদের নিয়ে গ্রাম সমিতি গঠন করা;

৩. উদ্বুদ্ধকরণ প্রোগাম করা;

৪. বিভিন্ন সমিতি করা;

৫. বৈঠক করা ইত্যাদি।[২৯২]

২য় দফা

পরিবর্তন বা উন্নয়নের জন্যে আন্দোলন একটি অপরিহার্য উপাদান। কোন কালেই আন্দোলন বা সংগ্রাম ব্যতীত কোন সার্বজনীন কর্মসূচী বাস্তবায়ন বা কোন দাবী বা অধিকার আদায় সম্ভব হয়নি। সাধিত হয়নি সার্বিক উন্নয়ন। তাই এ সমিতির দ্বিতীয় দফা কর্মসূচী হল-সংগঠিত চাষীসমাজকে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে নিয়ে অধিকার আদায়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। সংক্ষেপে এ দফার নাম হল "অধিকার আদায়ের আন্দোলন।" এ দফার প্রধান কাজগুলো হচ্ছে-

১. সংগঠিত চাষী সমাজকে তাদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে গড়ে তোলা;

২. অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো;

৩. মিছিল, মিটিং, সভা সমাবেশ করা;

৪. লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ইত্যাদি বিলি করা;

৫. নিম্নবর্ণিত ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে স্মারকলিপি পেশা দিবস পালনসহ অন্যান্য কাজ করা। ১০ দফা দাবীগুলো হচ্ছে–

---

২৮৯. *প্রাগুক্ত*
২৯০. *প্রাগুক্ত*
২৯১. *প্রাগুক্ত*
২৯২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ক. সুদমুক্ত কৃষিঋণ চালু করা;

খ. কৃষিখাতে বাজেট ও ভর্তুকি বৃদ্ধি;

গ. ভূমিহীন ও বাস্তুহারাদের পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা করা;

ঘ. পাটসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্যমুল্য নিশ্চিত করা;

ঙ. ফারাক্কা ও বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা;

চ. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

ছ. সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন ও যৌতুকের জুলুম বন্ধ করা;

জ. দেশের সর্বত্র গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা;

ঝ. প্রশাসন থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি উচ্ছেদ করা;

ঞ. এনজিওদের ক্ষুদ্রঋণ সুদমুক্ত করা।[২৯৩]

৩য় দফা

কোন কাজে সফলতার পূর্বশর্ত কাজে দক্ষতা অর্জন। দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। তাই এ সমিতির ৩য় দফা কর্মসূচী হল "সংগঠিত চাষীদের মেধা, যোগ্যতা ও পেশা অনুযায়ী গ্রুপ গঠন করে নৈতিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে দ্রুত অগ্রসরমান বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন জনশক্তিরূপে গড়ে তোলা।"[২৯৪] এ দফার সংক্ষিপ্ত নাম "প্রশিক্ষণ"। এ দফার প্রধান কাজগুলো হচ্ছে—

১. সংগঠিত চাষীদের মেধা, যোগ্যতা ও পেশা অনুযায়ী গ্রুপ গঠন করা;

২. প্রতিটি গ্রুপকে নৈতিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

৩. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল শিক্ষাদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ শিবির করা;

৪. ওয়ার্কশপ করা;

৫. সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি করা।[২৯৫]

৪র্থ দফা

যেহেতু সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু, সঞ্চয় সমৃদ্ধি আনয়ন করে, তাই দরিদ্র চাষী সমাজকে যাতে দুর্দিন মোকাবিলায় ও সমৃদ্ধি আনয়নে পরমুখাপেক্ষি হতে না হয় সে লক্ষ্যে এ সমিতির চতুর্থদফা কর্মসূচী হল—"সমিতির অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যদের মাঝে সাপ্তাহিক, মাসিক অথবা এককালীন সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে স্বনির্ভর পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধ করা।" এ দফার সংক্ষিপ্ত নাম "পুঁজি গঠন"।[২৯৬]

৫ম দফা

দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও পশ্চাৎপদ কৃষি প্রযুক্তির অভিশাপ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি তার পঞ্চম দফা কর্মসূচী প্রনয়ণ করেছে। ৫ম দফা কর্মসূচী হচ্ছে—"নৈতিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সদস্যদের সঞ্চিত অর্থ ও প্রয়োজনীয় অনুদান গ্রহণ করে লাভজনক যৌথ কৃষি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা। সংক্ষেপে এই দফাকে বলা হয় "যৌথ কৃষি প্রকল্প গ্রহণ"।[২৯৭]

---

২৯৩. *প্রাগুক্ত*
২৯৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬
২৯৫. *প্রাগুক্ত*
২৯৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭
২৯৭. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ দফা

সামাজিক প্রয়োজনে দুঃস্থ, পঙ্গু, এতিম, বিধবা, দরিদ্র ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের সহযোগিতা করাসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি নানামুখী সেবা কার্যক্রম যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশের চাষী কল্যাণ সমিতির ৬ষ্ঠ দফা কর্মসূচীর হল–"সমস্যাগ্রস্থ চাষীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে সমিতির সামর্থ্য অনুযায়ী সেবা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।" ৬ষ্ঠ দফার সংক্ষিপ্ত নাম হল "সেবা প্রদান"। এ দফার প্রধান কাজ হল-

১. সমাজের দুঃস্থ মানুষের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা;

২. সমস্যা সমাধানের জন্যে অংশগ্রহণমূলক বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা।[২৯৮]

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির সাংগঠনিক কাঠামো দুই স্তরে বিভক্ত যথা–

১. কেন্দ্রীয় সংগঠন;

২. অধঃস্তন সংগঠন।

১. কেন্দ্রীয় সংগঠনের কাঠামো হচ্ছে–

ক. জাতীয়তা পরিষদ;

খ. কার্যনিবাহী পরিষদ;

গ. উপদেষ্টা পরিষদ

২. অধঃস্তন সংগঠনের কাঠামো হচ্ছে–

ক. জেলা শাখা;

খ. থানা শাখা;

গ. ইউনিয়ন শাখা;

ঘ. ওয়ার্ড শাখা;

ঙ. গ্রাম শাখা[২৯৯]

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির জাতীয় পরিষদ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৭২ জন। সংস্থা পরিচালনার মূল দায়িত্বে নিয়োজিত জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা মোট ১১ জন। সংস্থার যাবতীয় কাজ অধিকতর সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সদস্যদের মধ্য থেকে ৭ জন বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ। এ ছাড়া জেলা শাখা থেকে গ্রাম শাখা পর্যন্ত অধঃস্তন সকল স্তরে গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচিত ৯ জন বিশিষ্ট কমিটি সমিতির কাজ পরিচালনা করে থাকে।[৩০০]

---

২৯৮. *প্রাগুক্ত*
২৯৯. *প্রাগুক্ত*
৩০০. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্ট্রেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রাণালয়ের সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি নিবন্ধনভুক্ত হয় এবং ২০০২ সালের ২০ জানুয়ারী সারা দেশব্যাপী এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের অনুমোদন লাভ করে। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং ঢ-০২৪৭৪। এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া চাষী কল্যাণ ট্রাস্ট জয়েনস্টক কোম্পানী হতে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত। রেজিস্ট্রেশন নং-এম ১৩৪৮ (৩২) ৯০।[৩০১]

সদস্য পদ

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ওয়ার্ল্ড এ্যাসেম্বলি অব মুসলিম ইয়ুথ (ওয়ামী) এবং এসোসিয়েশন অব মুসলিম এজেন্সি ইন বাংলাদেশ (আমওয়া)-এর সদস্য।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশের শতকরা ৮০% মানুষ কৃষিজীবী। এসব কৃষকদের অধিকাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। অজ্ঞতা, অনগ্রসরতা, কুসংস্কার প্রভৃতি এদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। দেশের উন্নয়নের জন্য কৃষকদের উন্নয়ন অপরিহার্য। তাই বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি কৃষকদেরকে সংগঠিত করা, তাদেরকে সচেতন করে গড়ে তোলা, তাদেরকে উন্নত ও আধুনিক কৃষিপদ্ধতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সর্ম্পকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও কুসংস্কারমুক্ত করা প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পর হতেই কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হল।[৩০২]

১. সাংগঠনিক কার্যক্রম

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি সাংগঠনিক কার্যক্রমের আওতায় সমমনা চাষীদের সদস্য করে থাকে। সদস্যভুক্ত চাষীদের নিয়ে সমিতি গঠন করে এসব সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য বিভিন্নস্তরে পরিচালক সমিতি গঠন করা ও গ্রাম সমিতিগুলোর বৈঠক করাই সাংগঠনিক কার্যক্রমের উল্লেখ্যযোগ্য দিক। এছাড়াও সদস্য সংগ্রহ পক্ষ পালন, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন, কেন্দ্র ও জেলার পক্ষ থেকে অধঃস্তন সমিতিগুলোতে ব্যাপক সফর, সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহে যোগাযোগ প্রভৃতিও সাংগঠনিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির কেন্দ্র হতে তৃণমূল পর্যন্ত মোট সমিতি রয়েছে ১১৪৮টি। উল্লেখ্য যে অধিকার বঞ্চিত অনগ্রসর প্রান্তিক কৃষক-কৃষাণীদের নিয়ে গঠিত তৃণমূল সমিতিকে গ্রাম সমিতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্বমোট ৯৭২৮টি গ্রাম সমিতির মধ্যে পুরুষ সমিতি ৮৯৬১টি এবং মহিলা সমিতি ৭৬৭টি।[৩০৩]

২. অধিকার আদায়ের আন্দোলন কার্যক্রম

ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে অদ্যাবধি এদেশের চাষীসমাজ পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়ে আসছে। বঞ্চিত হচ্ছে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকেও। উন্নত বীজ, নির্ভেজাল সার, সুলভে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সুদমুক্ত কৃষিঋণ, পরিবেশবান্ধব কীটনাশক, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্যে সহজলভ্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রভৃতি এদেশের চাষী সমাজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ চাষী সমাজকে নিয়ে গঠনমূলক কর্মসূচী পরিচালিত হয়।[৩০৪]

---

৩০১. *প্রাগুক্ত*
৩০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
৩০৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯
৩০৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

৩. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি প্রশিক্ষণ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি করে, মানসিক শক্তি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে সর্বদা কর্মতৎপর থাকতে প্রেরণা যোগায়। সমিতি তৃণমূল পর্যায়ে কৃষকদের জন্য সরকারি কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে নৈতিক ও পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির, প্রশিক্ষণ বৈঠক ও ওয়ার্কশপ প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রোগামসমূহ বাছাইকৃত চাষীদেরকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। এছাড়াও সমিতির বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সু-ব্যবস্থা রয়েছে।[৩০৫]

৪. আত্ম-কর্মসংস্থান কার্যক্রম

বাংলাদেশে প্রায় ২০ হাজারের বেশি সুদী এনজিও রয়েছে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচনের মাধ্যমে তথাকথিত শ্লোগান নিয়ে দারিদ্র্যের স্থায়িত্বকরণ, সুদের ব্যাপক বিস্তার, এদেশের দীর্ঘকালের ঐতিহ্য পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা প্রভৃতি নানাবিধ ঈমান ও সমাজবিরোধী কার্যক্রম সুকৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি সুদী এনজিওদের ষড়যন্ত্র হতে মুক্ত থেকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে হৃদয়বান সচ্ছল, ধনবানদের ও বিভিন্ন দাতা সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় চাষী কল্যাণের কেন্দ্র ও অধঃস্তন সংগঠন, সংগঠনভুক্ত সদস্যদের মধ্যে বায় মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে সহযোগিতা দিয়ে থাকে। যেমন- হাঁস-মুরগী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, গাভী পালন, শাক-সব্জি ও কৃষিপণ্য উৎপাদন, মাছ চাষ, মৌমাছি চাষ, নার্সারী, সেলাই মেশিন, রিক্সা, ভ্যান, মুদিদোকান, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প ও গৃহ-নির্মাণ ইত্যাদি।[৩০৬]

৫. সমাজসেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি বহুবিধ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তার মধ্যে রয়েছে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমাজসেবামূলক কাজ যৌতুক বিহীন সম্মিলিত বিবাহ অনুষ্ঠান। সমাজ সচেতনদের দৃষ্টিতে যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। এই ব্যাধির মরণ ছোবলে প্রতি বছর করুণ পরিণতি নেমে আসছে অনেক নারীর জীবনে। সামাজিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতামাতা ভাইবোনসহ সমাজের সর্বস্তরের জনতা। তাই সমাজ থেকে চিরতরে এই ব্যাধি নির্মুল করতে এ সমিতির প্রতি বছর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য প্রতিটি জাতীয় সম্মেলনে যৌতুক বিহীন সম্মিলিত বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির ও ব্যানার প্রদর্শনীসহ নানা ধরনের কর্মসূচী গ্রহন করে থাকে। অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে বিধবা এবং দরিদ্রের জন্য গৃহনির্মাণ, এতিম প্রতিপালন ও তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ, দরিদ্র ও মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, মসজিদ, মক্তব, পাঠশালা, অযুখানা ও ক্লিনিক নির্মাণ, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও আকস্মিক দুর্ঘটনায় ত্রাণ বিতরণ, রমজান মাসে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠান, ইফতার সামগ্রী ও ফিতরা বিতরণ অনুষ্ঠান, শীতার্ত মানুষের জন্যে শীতবস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিবছর জুলাই মাসে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করে থাকে। বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী ৮,১১,৫৫০টি ফলজ, বনজ ও ঔষধী বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীতে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি শীর্ষ স্থানে আবস্থান করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এই সমিতিকে পুরস্কারে ভূষিত করেন, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।[৩০৭] বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা পিডিয়ায় যৌতুক সম্পর্কে বলা হয়েছে। বিবাহের চুক্তি অনুসারে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে যে সম্পত্তি বা অর্থ দেয় তাকে যৌতুক বা পণ বলে। পরে বলা হয়েছে মুসলমানদের

---

৩০৫. *প্রাগুক্ত*
৩০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১, ২২
৩০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি আইন ও শরীয়ত আইন অনুসারে বিবাহের কাবিন নামায় লিখিত বা অলিখিত চুক্তির অধীনে স্বামী-স্ত্রীকে বাধ্যাতামূলকভাবে যে দেনমোহর বা মোহরনা দেয় তাকে যৌতুক বলা যায় না।"[৩০৮]

যৌতুকের ইংরেজী Dowry এনকাটা এনসাইক্লোপিডিয়ায়- Dowry সম্পর্কে বলা হয়েছে–Property that a wife or wife's family gives to the husband upon morage. In certain societies the dowry formed a part of an exchange of wealth between intermarrying families, it was after accompanied by some payment made by the groom to the bird's family, Called the bride – price[৩০৯]

যৌতুক বর্তমানে বিভিন্ন নামে তার বিষাক্ত থাবা বিস্তার করে চলছে। কখনো ঘর সাজানোর উপকরণের নামে কখনো স্বনামে ছোবল হানে মানুষের জীবনে। উচ্চবিত্ত কুলীন মুসলিম সমাজে পূর্ব থেকে বিয়েতে যৌতুকের প্রচলন থাকলেও বর্তমানে বাঙালি মুসলিম সমাজে-এর সর্বব্যাপী বিস্তার, বেকারত্ব ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজের মরণব্যাধি যৌতুকের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি ও বিত্তবানদের মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দরিদ্র পিতার কন্যাদের বিবাহে সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যৌতুকবিহীন সম্মিলিত বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। চাষী কল্যাণ সমিতির সমন্বিত এ কার্যক্রম সমাজ থেকে নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান কারণ যৌতুক সমূলে উচ্ছেদ করার এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হবে।[৩১০]

৬. বিবিধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি গাইড, বাংলাদেশ এনজিও ও ঔপনিবেশিকদের দুর্ভেদ্যজালে, সার ব্যবহার, চাষের কথা, চাষীর কথা, স্মারক ২০০০, সচিত্র প্রতিবেদনে, গঠণতন্ত্র, নীতিমালা, নানা ধরনের পরিচিতিমূলক বই, রমজানের সেহেরী-ইফতারের সময়সূচী, নতুন বছরের বিভিন্ন ধরনের ডায়েরী ক্যালেন্ডার ইত্যাদি প্রকাশ করে।[৩১১]

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশ দরিদ্র, অসহায়, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অনগ্রসর, শোষিত চাষী সমাজের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি যে কার্যক্রম দেশব্যাপী অব্যাহত রেখেছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দেশের উন্নয়নের ধারাকে অনেকাংশে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এভাবে বাংলাদেশে কর্মরত দেশী ও বিদেশী ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে এদেশের অসহায় মানুষের সেবা করে চলেছে। এদেশে অসংখ্য সেবা সংস্থা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে কিন্তু ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের পরিচয় ও কার্যক্রমের মধ্যে একটা স্বতন্ত্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যা উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

---

৩০৮. *বাৎসরিক প্রতিবেদন-২০০৩*, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, পৃ. ৬

৩০৯. *প্রাগুক্ত*

৩১০. *প্রাগুক্ত*

৩১১. *বাৎসরিক প্রতিবেদন, ২০০০-২০০২*, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

দুঃস্থ মানবকল্যাণে বাংলাদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

দুঃস্থ মানবকল্যাণে বাংলাদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেবা সংস্থা গড়ে উঠে। তাদের পাশাপাশি সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী মূল্যবোধ ও চিন্তা চেতনা নিয়ে যাত্রা শুরু করে ইসলামী সেবা সংস্থা। আস্তে আস্তে সাধারণ সংস্থাসমূহের মত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহও বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদনের মাধ্যমে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এদেশে দেশী ও বিদেশী অনেক ইসলামী সেবা সংস্থা রয়েছে যারা অসহায়, অভাবী, দরিদ্র মানুষকে বিভিন্নভাবে সেবাদান করে থাকে। আমাদের দেশে রাবেতা আলম আল ইসলামী, আল নাহিয়ান ট্রাস্ট, মুসলিম এইড ইউকে, ওআইসি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ইসলামী সেবা সংস্থা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের দেশ ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আবার বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই এলাকাভিত্তিক গড়ে উঠেছে অনেক ইসলামী সেবা সংস্থা, তবে এ সকল সেবা সংস্থার তহবিল অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মুসলিম এইড, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ইত্যাদি ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো উল্লেখ করার মত। তাছাড়া আমাদের গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নের লক্ষ্যে গড়ে উঠেছে অনেক ছোট ছোট ইসলামী সেবা সংস্থা যার প্রভাবে এলাকাভিত্তিক মানুষের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রেই-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

এদেশে কর্মরত দেশী ও বিদেশী ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ থেকে আমরা যে আশা করি ও সেই অনুযায়ী আমরা যা পাচ্ছি সে সম্পর্কে আমাদের নজর দেয়া দরকার। অন্যান্য সাধারণ সেবা সংস্থার মতোই এসকল ইসলামী সেবা সংস্থা কাজ করে তবে এদের মূল লক্ষ্য ইসলামী ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা তথা ধর্মীয় ভাবধারা জাগ্রত করে অবহেলিত মানুষের সেবাদান। আমাদের আর্ত-মানবতার সেবাদান ও দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ যে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করছে আলোচ্য অধ্যায়ে তা আলোচনা করা হল।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

আল্লাহ্ তায়ালা যখন মুহাম্মদ (সঃ)-কে নবুয়্যতের দায়িত্ব প্রদান করেন তখন প্রথম কথাই ছিল "পড় তোমার প্রভুর নামে[১]" আলোচ্য কথার অর্থ কিন্তু শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। বলা হয় Education is the backbone of a nation. আমাদের শিক্ষা আশানুরূপ অগ্রসর না হওয়ায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সেবা সংস্থাসমূহও কাজ করে যাচ্ছে যার মধ্যে ইসলামী সেবা সংস্থা অন্তর্ভূক্ত। এসকল সেবা সংস্থা অসংখ্য স্কুল, মাদ্রাসা পরিচালনা করে যেখানে অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। সবার জন্য শিক্ষা, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, কাজের বিনিময়ে শিক্ষা, সরকারের গৃহীত এ সকল কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ইসলামী সেবা সংস্থা কাজ করে থাকে। এই সেবা সংস্থার শিক্ষা প্রকল্প পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা তিন ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে–

১. প্রাথমিক শিক্ষা;

২. বয়স্ক শিক্ষা;

৩. নারী শিক্ষা।

তাদের এ শিক্ষা প্রকল্পের ফলে গ্রাম পর্যায়ে ছিন্নমূল শিশু, বয়স্ক ও নারীরা শিক্ষা লাভ করতে পারছে। যার ফলে আমাদের সার্বিক স্বাক্ষরতার হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীতে সরকারের

---

১. সূরা আলাক, আয়াত : ১

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ বেসরকারি শিক্ষা কর্মসূচীর প্রসার ঘটাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বেসরকারি সংস্থাসমূহ প্রায় ১ লক্ষ স্কুল পরিচালনা করছে। এই এক লক্ষ স্কুলে কম করে হলেও ৪০ লক্ষ ছেলে-মেয়ে শিক্ষা লাভ করছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মোট ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে সেবা সংস্থাসমূহ শতকরা ৩৫ ভাগ অসহায় ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা দিচ্ছে। তার মধ্যে ইসলামী সেবা সংস্থা প্রায় ১৬ শতাংশ শিক্ষা দিতে পারছে বলে গবেষকগণ ধারণা করে থাকেন। এই প্রকল্পের অধীনে কোন কোন সেবা সংস্থা এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এতিমদের শিক্ষিত করে তুলছে। আবার আহ্ছানিয়া মিশন 'ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছে। 'আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ' প্রতিষ্ঠাসহ নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে আবার 'বাংলাদেশ মসজিদ মিশন' ইমাম প্রশিক্ষণ, কেন্দ্রীয় হজ্জ প্রশিক্ষণ, আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব পরিচালনা, আদর্শ হেফজখানা প্রতিষ্ঠা, দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস নামে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মীয় পথে শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় মানুষের স্বাক্ষরতাদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে যা আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট চাহিদা।

ত্রাণ তৎপরতা

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তাদের রুজি রোজগারেরও ব্যবস্থা করেছেন[২]। তিনি মানুষের প্রতি অত্যন্ত সহনশীল, শত অপরাধের পরও যদি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় তাহলে তিনি মাপ করে দিতে পারেন। এদিক থেকে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ আল্লাহ্র সৃষ্টি সেই মানুষের মধ্যে যারা অভাবী, অসহায় তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করে থাকে। আমাদের দেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ এলাকা, এখানে প্রতি বছর বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ লক্ষ্য করা যায়। যার প্রভাবে মানুষ দুঃস্থ, অসহায় ও অবহেলিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের জন্য প্রয়োজন হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের। এলক্ষ্যে এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো ত্রাণ তৎপরতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানুষকে সেবা দিয়ে থাকে। ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এসকল সেবা সংস্থার একবিশেষ দিক। তাদের এই কর্মসূচীর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতে ত্রাণ পৌঁছে যাচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্নীতি, লুটপাট ইত্যাদি অনিয়মের ফলে ১০% ভাগ ত্রাণ ও গরিবদের হাতে যেত না। কিন্তু সেই অবস্থার এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন দুর্যোগ যেমন ঝড়, বন্যা ও শীতে এসকল সেবা সংস্থা নিজেদের উদ্দ্যোগে উপদ্রুত উপকূলীয় এলাকায় মানুষকে সতর্ক করে থাকে যা বিপুল প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষকে রক্ষা করে থাকে। ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ যে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করে তার মধ্যে রয়েছে :

১. খাবার, গুঁড়োদুধ, ঔষধ বিতরণ;
২. শাড়ি, লুঙ্গি, কম্বল, চট বিতরণ;
৩. চিকিৎসা সেবা প্রদান;
৪. গৃহায়ণে সহায়তা প্রদান;
৫. বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ;
৬. শিশু, বৃদ্ধ ও নারীদের জন্য বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন;
৭. আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
৮. গবাদিপশু রক্ষা।

জরুরী মুহূর্তে ও জরুরী অবস্থায় এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ যে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করে যার আনুমাণিক হার ২৫ শতাংশ বলে মনে করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষ অসহায়, এখানে কারও

২. সূরা হুদ, আয়াত : ৬

Dhaka University Institutional Repository

কোন হাত নেই তবে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থার সুযোগ আছে। উপদ্রুত এলাকায় মানুষ যখন দিশেহারা অসহায় তখন তাদের সাহায্যের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঠিক এমনই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো মানুষের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে যার ফলে তাদের প্রতি মানুষ চির কৃতজ্ঞ।

স্বাস্থ্য রক্ষা

আমাদের দেশ উন্নয়নশীল, ধাপে ধাপে উন্নত হতে যাচ্ছে, আর এদেশে আর্ত-মানবতার সেবায় ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের এক বড় ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিম্নমানের। প্রতি ৩৮০০ লোকের জন্য একজন সরকারি ডাক্তার আছে।[৩] এখানে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল উপকরণসহ ব্যবস্থা দরকার তা অত্যন্ত নগণ্য। নগর বস্তিবাসীদের দুর্ভোগের জীবনে স্বাস্থ্যসেবার সামান্য প্রভাব আছে বলে মনে হয় না অথচ তারাও কিন্তু 'আশরাফুল মাখলুকাত'। আমাদের গ্রামীণ ও নগর বস্তিবাসী অসহায় জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো বিরাট অবদান রাখছে। এসকল সেবা সংস্থা অসহায় মানুষের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্যানিটেশন, গভীর নলকূপ স্থাপন করে গ্রামীণ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষা করে যাচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, আর তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা টিউবওয়েল, এদেশে কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা টিউবওয়েল প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এ সেবা সংস্থার চেষ্টার ফলে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ সকল ধর্মের ও বর্ণের মানুষ আর্সেনিকমুক্ত পানি পান করতে পারছে। আবার বেশ কিছু ইসলামী সেবা সংস্থা কুষ্ঠরোগ নিরাময়, খাবার স্যালাইন বিতরণ, মা ও শিশুর সার্বিক স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন দ্রুত উন্নত হতে চলেছে। এজন্য ইসলামী সেবা সংস্থার স্বাস্থ্য রক্ষা কার্যক্রমকে আল্লাহ্ তায়ালার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। তাহলে পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২০ ভাগ অসহায় মানুষ ইসলামী সেবা সংস্থা থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে।

শিশুশ্রম নিরসন

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার, অথচ আমাদের দেশের শিশুদের এক বিরাট অংশ অভাবের তাড়নায় শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হয়। যে বয়সে বই-খাতা নিয়ে পাঠশালায় যাওয়ার কথা সেখানে তারা ভাগ্যের অন্বেষণে শ্রমিকের কাজ করে। অনেক শিশু বিদেশে পাচার হয়ে উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এক্ষেত্রে অনেক শিশু মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করে থাকে। এদেশের গার্মেন্টসগুলোতে অসংখ্য শিশু কাজ করে পরিবারের জন্য অন্নের যোগান দিয়ে থাকে, আবার দেখা যায় লেদমেশিন, গাড়ির হেলপার, রিক্সার ড্রাইভার ইত্যাদি নানা কাজ করতে। ইসলামে এই শিশুশ্রম একেবারেই নিষেধ। মুহাম্মদ (সঃ), খুলাফা-ই-রাশেদীনসহ অন্যান্য মুসলিম শাসনামলে এই শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে শিশুশ্রমের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে। আমাদের দেশের শিশুদের যখন এই অবস্থা তখন ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে এবং শিশু শ্রম থেকে নিবৃত করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিক, শিশু অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে তাদের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উপযোগী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে থাকে। এদেশের কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা ইসলামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশে অসহায় শিশুশ্রম নিরসনের জন্য তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ তাদের নিরলস প্রচেষ্ঠায় দেশের শিশুশ্রমের হার কমিয়ে এনেছে শতকরা ১৫ ভাগ। এসকল সেবা সংস্থার নিকট আমাদের দাবী, তারা যেন আরও দ্রুত ও কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করে শিশু শ্রমের অবসান ঘটায়।

---

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

পানির অপর নাম জীবন, পানি ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না। পানির জন্যই ইতিহাস বিখ্যাত কারবালার যুদ্ধ হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। আবার সুপেয় পানির অভাবে জটিল রোগ হতে পারে। আমাদের বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে সুপেয় পানির এক মারাত্মক সংকট লক্ষ্য করা যায়, এ দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬১টি জেলার পানিতে দেখা দিয়েছে আর্সেনিক, আবার অতিরিক্ত দূষিত পানির প্রভাবে জন্ডিসে আক্রান্ত হয় অনেকে। ইসলামের সোনালী যুগে আমরা দেখতে পাই সুপেয় পানির জন্য শাসকগণ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন, যার মধ্যে ছিল খাল খনন, টিউবওয়েল স্থাপন ও গভীর নলকূপ স্থাপন। পানির লাইন স্থাপনের মাধ্যমে পানি এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে জনগণের চাহিদা পূরণ করেছেন। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশে পানির প্রাপ্যতা সহজলভ্য হলেও আর্সেনিকের মাত্রা এত বেশি যে, অসহায়, অভাবী মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। আবার আমাদের দেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থা খুবই দুর্বল, ল্যাট্রিনের অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে পারে না, এরূপ পরিস্থিতিতে এ শ্রেণীর মানুষ সাহায্য পেতে চায়। তাই তাদের চাহিদা অনুযায়ী এদেশে কর্মরত কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা গরির মানুষের সেবাদানের কথা চিন্তা করে গ্রামীণ স্যানিটেশন সেন্টার থেকে সহজ ও কম মূল্যে সকল উপকরণ দিয়ে সাহায্য করছে। আবার একাজে মানুষকে উৎসাহ প্রদানও করে থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবহার করার জন্য আমাদের গণমাধ্যমগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, এ মাধ্যমটি ক্ষতি ও উপকারের দিক নিয়ে মানুষকে সচেতন করে যার ফলে নিজেদের অভ্যাস পরিবর্তন ও উপকারের দিক চিন্তা করে তারা সেবা সংস্থার নিকট এসে সেবা গ্রহণ করে।

যত্রতত্র ময়লা আবর্জনার ফলে এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার উন্নয়নকল্পে ইসলামী সেবা সংস্থার বড় অবদান হল পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন প্রকল্প গ্রহণ। আমাদের দেশের দুঃস্থ মানবকল্যাণের জন্য এ সেবা সংস্থার এরকম এক যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার বলে আমি মনে করি। তারা অন্তত উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারছে। এসকল সেবা সংস্থার কার্যকরী এই কর্মসূচীর ফলে গ্রাম বাংলার পরিবেশ আস্তে আস্তে নির্মল হচ্ছে যার ফলে মানুষ উন্নত পরিবেশে বাস করতে পারছে। এজন্য আমি মনে করি দরিদ্র মানুষের পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেবাদান এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের নিকট এক বড় প্রাপ্তি। এক্ষেত্রে মুসলিম এইড (ইউকে) বাংলাদেশ সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আর তা হলো :

১. এলাকা চিহ্নিতকরণ;
২. উপকারভোগী বাছাইকরণ ও দল গঠন;
৩. দল বা গ্রুপ ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং;
৪. পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার বিতরণ;
৫. টিউবওয়েল ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন সামগ্রী সংগ্রহ ও সরবরাহ;
৬. জনসচেতনতা;
৭. নিয়মিত মনিটরিং;
৮. প্রশিক্ষণ;
৯. আর্সেনিক টেস্ট;
১০. বিকল টিউবওয়েল মেরামত।

উল্লেখিত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সরবরাহের মাধ্যমে জন সচেতনতা সৃষ্টি করে যে অবদান রাখছে তার হার ২৩ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ উন্নয়ন ও বনায়ন

বিজ্ঞান স্বীকার করে যে, গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে, মানুষ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে ও অক্সিজেন গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে যদি অধিকহারে বনায়ন করা যায় তাহলে মানুষের জন্য সুবিধা। বর্তমান যুগে পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ এক মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনছে। মানুষ বেড়ে যাওয়ায় গাছ-পালা কমে যাচ্ছে। এজন্য পরিবেশ উন্নয়ন ও বনায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি দেশের ২৫% ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে আছে মাত্র ১৭% ভাগ। এ অবস্থার খুব দ্রুত পরিরর্তন দরকার, বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, এদেশ ভবিষ্যতে সাগরে পরিণত হবে, এজন্য আমরা যাতে বাঙালি জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারি তার জন্য ব্যবস্থা আমাদেরকেই নিতে হবে। আর তা হলো আমরা পরিবেশ বান্ধব বৃক্ষরোপণ করে বর্তমান অবস্থার উন্নতি করতে পারি। বনায়ন শুধু পরিবেশগত কারণেই নং বরং খাদ্য, কাঁচামাল, ভেষজ ঔষধ, কাঠ সরবরাহসহ অন্যান্য প্রয়োজনেও দরকার। মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, "যে কোন মুসলমান একটি বৃক্ষরোপণ করবে বা শস্য বপন করবে আর তা যদি মানুষ, পাখি বা কোন পশু খায় তবে তা তার জন্য সদকায় পরিণত হবে।" [৪]

নবীজির এই হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, পরিবেশ উন্নয়নের জন্য বনায়ন কর্মসূচী অবশ্যই সওয়াবের কাজ, আর বিনা প্রয়োজনে কেটে ফেলা অন্যায়।

আমাদের দেশে ১৯৯১ সাল থেকে সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং একাজে উৎসাহী করার জন্য ১৯৯২ সাল থেকে পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে আয়তনের তুলনায় যে পরিমাণ বৃক্ষ ও বনভূমি থাকার কথা ছিল তা নেই। যা আছে তাও আবার নানাভাবে বিনষ্ট, উচ্ছেদ, নিধন ও ধ্বংস হচ্ছে। জ্বালানী ও ইট ভাটার প্রভাবে বছরে প্রচুর বৃক্ষ ধ্বংস হচ্ছে। ঘর-বাড়ি, দালানকোঠা তৈরীতে প্রয়োজন পড়ে কাঠের। ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৃক্ষ উচ্ছেদ হচ্ছে এবং এর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর। আর এজন্য আমাদের বনভূমি উজাড় হচ্ছে। বৃক্ষ নিধনের ফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তথা সুন্দরবন এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর উত্তরাঞ্চলে শুরু হয়েছে মরুকরণ। সর্বশেষ বৃক্ষ নিধনের ফলে আমাদের জাতীয় উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পেতে বসেছে।

এ অবস্থার উন্নতিকল্পে এবং বাংলাদেশে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপন ও বনায়নের জন্য প্রকল্প চালু করা একান্ত প্রয়োজন। বৃক্ষরোপন ও বনায়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও সচেতন ও উদ্যোগী হতে হবে। ঠিক এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এদেশে কর্মরত মুসলিম এইড ইসলামী সেবা সংস্থা "Tree Plantation" প্রকল্পের মাধ্যমে বনায়নের ক্ষেত্রে অবদান রাখছে[৫]। বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি' নামে ইসলামী সেবা সংস্থাকে ২০০৫ সালে পুরস্কৃত করে। বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে যে সব কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে সেখানে ইসলামী সেবা সংস্থা তাদের ভূমিকা রেখেছে ৪০ শতাংশ। এছাড়াও অন্যান্য ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ এই প্রকল্প গ্রহণ করছে। তাদের কর্মসূচীর মাধ্যমে উৎসাহী হয়ে মানুষ বাড়ীর আশে-পাশে, পতিত জায়গা, রাস্তার দু'ধারে বৃক্ষরোপন করছে। এ অভিযান সফল করার দায়িত্ব কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের মানুষের। ইসলামী সেবা সংস্থার এই প্রকল্প নিশ্চয় যুগোপযোগী বলে আমি মনে করি।

সচেতনকরণ

বিবেক মানুষের ধর্মগুরু, বিবেকবানরাই সমাজের উন্নতি চিন্তা করে। এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা-সংস্থাগুলো তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ভোট, স্বাস্থ্য, যৌতুক, তালাক, অধিকার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করে থাকে যা ব্যক্তি অধিকার আদায় ও গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে সহায়ক বলে মনে হয়। এসকল সেবা সংস্থার সচেতনকরণ কর্মসূচীর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিজেদের অবস্থান

---

৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী* (দেওবন্দ : আল মাকতাবা আর রহীমিয়া ১৩৮৪ হিঃ), ১ম খণ্ড

৫. *Annual Report 2004*, Muslim Aid, P.10.

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তাদের মতে ধনীরাই দারিদ্র্যের মূল কারণ, গরিবদের নিজেদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। নারী-পুরুষ সকলেই নিজেদের অবস্থান থেকে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি, প্রতিনিধির কাজ হল দায়িত্ব পালন, যুগে যুগে নবী রাসূলগণ তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে ও দেশ গঠনে সকলের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতি আনুগত্য ও দেশ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলকে সতর্ক করেছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কার করে এক সুন্দর পরিবেশ তৈরি করেন এবং বিভিন্ন জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তিনি সকল মানুষকে জনসেবামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সচেতন করে তোলেন যার বাস্তবতা ফুটে উঠে খুলাফা-ই-রাশেদীন ও অন্যান্য মুসলিম শাসনামলে। সেই কর্মসূচীর প্রতি উৎসাহী হয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাগুলোও মানুষকে সচেতন করে তুলছে। যার ফলে বর্তমান সমাজের মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে অনেক সচেতন বলে আমার কাছে মনে হয়। এসকল সংস্থা যে বিষয়ে সচেতন করে তার মধ্যে রয়েছে-

১. বৃক্ষরোপণ;

২. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন;

৩. টিউবওয়েল স্থাপন;

৪. যৌতুকবিহীন বিয়ে;

৫. ধূমপানমুক্ত পরিবার গঠন;

৬. আল কুরআন শিক্ষা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোন হাত নেই। ইচ্ছা করলেই প্রতিরোধ করতে পারে না। তবে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে রয়েছে বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। যুগে যুগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে আসছে আবার সময়ের ব্যবধানে তার ক্ষয়ক্ষতিও কাটিয়ে উঠেছে মানুষ। ইসলাম ধর্মে এরূপ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র উপর ধৈর্য্য ধারণ করে সাহায্য লাভের জন্য দু'আ চাইতে বলা হয়েছে। আশারা মোবাশ্‌শারার[৬] ঘটনা আমাদের এই শিক্ষা দেয়।

আমাদের বাংলাদেশ প্রতি বছর ঘুর্ণিঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি নানা দুর্যোগের স্বীকার হয়ে থাকে যা বর্তমানে বাংলাদেশের এক নৈমিত্তিক ঘটনা বলে মনে হয়। এসকল দুর্যোগে আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়। সামুদ্রিক ঘুর্নিঝড়ে ও বন্যার প্রভাবে আক্রান্ত এলাকা লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে, মারা যায় অগণিত মানুষ ও গবাদিপশু। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় উপদ্রুত অঞ্চল, ধ্বংস হয় জমির ফসল, ঘরবাড়ি, যানবাহন ও বৃক্ষ যার মূল্য কোটি কোটি টাকা, বন্যার ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ি, শহর-বন্দর পানিতে তলিয়ে যায়, মানুষ আশ্রয়হীন হয়, অবস্থান নেয় উঁচু রাস্তা, বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র ইত্যাদি স্থানে। এই অসহায় অবস্থায় তাদের জন্য প্রয়োজন তাৎক্ষনিক ও স্থায়ী পুনর্বাসন ব্যবস্থা। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অন্যান্য সংস্থার মত কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থার রয়েছে ব্যাপক কর্মসূচী। বিভিন্ন দুর্যোগের মোকাবেলায় এদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মুসলিম এইড (ইউকে) বাংলাদেশ, আদ্-দ্বীন, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি সেবা সংস্থা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরী পরিস্থিতিতে সমাজের আর্ত-পীড়িত ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্য দিয়ে থাকে, যা আমার মনে হয় অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এসকল সংস্থা জরুরী প্রয়োজনে বিশুদ্ধ পানি, খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে

---

৬. মাওলানা মোহাম্মদ গরীব উল্লাহ ইসলামাবাদী, *আশারা মোবাশ্‌শারা* (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, জুন, ২০০৩),সংস্করণ-৪, পৃ. ৫২, ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিদিন তিনবেলা খাবার প্রদান, শিশুদেরকে দুধের ব্যবস্থা, গর্ভবতী মায়েদের বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা করে। তাছাড়া জরুরী মেডিকেল টিম গঠনের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান পন্থায় চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে। এসময় ডায়রিয়া আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকায় তাদের চিকিৎসাসেবা জরুরী হয়ে পড়ে। আবার কোন কোন এলাকায় শীত বস্ত্রও বিতরণ করে থাকে। এসকল দিক বিবেচনা করলে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো মানবসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত রাখতে পারছে।

স্ব-কর্মসংস্থান

এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো আয়বর্ধক কার্যক্রম পরিচালনা করে যা সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে খ্যাত। এই সংস্থাগুলো তাদের কর্মতৎপরতা এলাকায় শাখা অফিসের মাধ্যমে সুদবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন খাতে ঋণ দিয়ে থাকে। যেমন :

১. কৃষিকাজ;
২. ক্ষুদ্র ব্যবসা, (মুদি দোকান, স্টক ব্যবসা, সবজি দোকান, ঔষধের দোকান, বীজের দোকান, বেডিং হাউস ইত্যাদি);
৩. গরু ও ছাগল পালন;
৪. তাঁত;
৫. ভ্যান ও রিক্সা;
৬. নার্সারী;
৭. সবজি বাগান;
৮. ইঞ্জিন মেকানিক্স;
৯. পোল্ট্রি;
১০. রাজমিস্ত্রি;
১১. মৎস চাষ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানরত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধিকারী প্রকল্প গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী ইত্যাদির মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যাকে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়ানো বলে থাকি। এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একমাত্র সম্পদ হল কায়িক শ্রম, যা আগে বিক্রয়ের কোন নিশ্চয়তা ছিল না, এবং তাদের সামান্য পুঁজিও ছিলনা যা দিয়ে ছোট খাট কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পারে।

এরূপ পরিস্থিতিতে এই সেবা সংস্থা দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় সুদমুক্ত ঋণ ও আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। ফলে অসংখ্য মানুষ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হচ্ছে। আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তি আছে কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই এজন্য অনেকেই ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানারকম অবৈধ পথ অনুসরণ করে মানবেতর জীবন যাপন করে। অথচ প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা পেলে তাদেরকে ভিক্ষার পরিবর্তে কর্মীর হাতে পরিণত করা সম্ভব। এদিক লক্ষ্য করে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো স্ব-কর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত মানুষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহানুভূতি দিয়ে সেবা করা যায়। মানুষজন এ সংস্থার নিকট থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে যা তাদের ভাগ্যোন্নয়নে সহায়ক বলে মনে হয়। উল্লেখিত কর্মসূচীর পর্যালোচনা করে দেখা যায় ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত নানা কর্মসূচীর পাশাপাশি অসহায় মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদের অবদান রেখে চলেছে ১৫ শতাংশ। এজন্য বলা যায় এ সংস্থাগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অন্তত কিছুটা হলেও অবদান রাখতে পারছে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

আমাদের দেশে অসংখ্য শিক্ষিত বেকার রয়েছে কর্মক্ষেত্রের অভাবেই তাদের বেকার জীবন কাটাতে হয়। সরকার প্রতিবছর অনেক লোককে চাকরি প্রদান করে কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় তা নগণ্যই বলা চলে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন কর্মক্ষেত্র আর এলক্ষ্যে ইসলামী সেবা সংস্থা গড়ে ওঠার ফলে অনেকের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। এদিক থেকে গ্রামীণ পর্যায়ে বেকার সমস্যা দূরীকরণে এ সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যতই সেবা সংস্থার সংখ্যা বাড়ছে ততই বেকারদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে এদেশের অবস্থা বিপদজনক ও বেদনাদায়ক। এখানে যে কতজন বেকার তার সঠিক পরিসংখ্যান অজানা। যারা বেকার ও অর্ধবেকার তারা তিরস্কার, বঞ্চনা, গঞ্জনা ও পরান্ন গ্রহীতার গ্লানিকর জীবন ভোগ করে ও ধীরে ধীরে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার কবলে পড়ে। সরকারি কর্মস্থান খুবই সীমিত যার প্রভাব পড়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর। একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে যে যুবক শিক্ষা জীবন শেষ করে বেরিয়ে যায়, স্বভাবতই তার প্রত্যাশা থাকে একটা নিশ্চিত কর্মসংস্থান। এদেশের সেই শিক্ষিত যুবকটির কর্মসংস্থার কোন নিশ্চয়তা নেই। স্বাধীনতার তিন দশক পার হলেও এ অবস্থাকে ধারণ করে আছে যে দেশ তার নাম বাংলাদেশ। এখানে হাজারো সমস্যায় জর্জরিত সবচেয়ে করুণ চিত্রটি হল বেকারত্ব। এ মুহূর্তে এদেশে প্রায় ২ কোটি শিক্ষিত বেকার আছে। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো অনেক লোকের চাকরি দিয়ে বেকারত্ব থেকে পরিত্রান দিচ্ছে। সেবা সংস্থার বহুমূখী কর্মসূচী থাকার ফলে অনেক লোকবলের প্রয়োজন হয় এজন্য তারা লোকবল নিয়োগ করে। এই লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে তাদের চাকরির সুযোগ তৈরী হয়। তাই বলা যায় যে, বেকারত্ব দূরীকরণে ইসলামী সেবা সংস্থার লোকবল নিয়োগ নিশ্চয় এক মহান প্রাপ্তি।

কৃষি উন্নয়ন

প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ণে দক্ষ জনশক্তি পূর্বশর্ত হিসেবে সর্বত্রই বিবেচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। বিশাল জনগোষ্ঠী কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বলে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে জাতীয় উন্নয়নে তারা বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

এদেশ কৃষিভিত্তিক একটি দেশ, এদেশের জনসংখ্যার প্রায় ৮০% কৃষক। জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০% এ খাত থেকে আসে। সরকারের অর্থবিভাগের সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে দেশের কর্মক্ষম জনশক্তির ৬৭% কৃষি পেশার সাথে জড়িত। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল স্বাধীনতার এত বছর পরও চাষী সমাজ শোষণ, বঞ্চনা ও প্রতারণার শিকার। চাষী সমাজের অজ্ঞতা, অশিক্ষা, অদক্ষতা, অনগ্রসরতা, দারিদ্র্য ইত্যাদির দুর্বলতার সুযোগে গ্রাম্য টাউট, অর্থলোভী মহাজনশ্রেণী ও এনজিও নামধারী এক শ্রেণীর প্রতারক চক্র প্রতারণার জাল বিছিয়ে কৃষকদের বন্দি করে ও সুদী মহাজনী ব্যবসার ফাঁদে আটকিয়ে সহজ-সরল চাষীদের হালের বলদ, মাঠের ফসল, ঘরের চাল, ডাল প্রভৃতিসহ লুট করে তাদের পথে বসিয়েছে।

কৃষি ও কৃষকের স্বার্থ রক্ষার শ্লোগান দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনের জন্ম হলেও তাদের কর্মসূচীতে এদেশের কৃষি ও কৃষকের কল্যাণের সঠিক নির্দেশনা না থকায় তারা চাষী সমাজের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন লক্ষ্যে বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্ত কথা হল পরিকল্পনা যতই কল্যাণকর হোক, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে তা বাস্তবে সফল ও টেকসই হয় না। এজন্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যে সরকারও জনগনের মধ্যে একটা ঐক্যের সেতু বন্ধন প্রয়োজন।

জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে জমির মালিক ও ভূমিহীন চাষীদের মৌলিক প্রয়োজন যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারত্ব থেকে মুক্তি, নিরক্ষরতার অবসান ও স্বাস্থ্যপুষ্টির ঘাটতি পূরণ ইত্যাদির জন্য চাষী সমাজকে

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিত করা, তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালানো, নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয়ের মনোভাব ও অভ্যাস গড়ে তোলা, যৌথ ও লাভজনক প্রকল্প গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতাদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এদেশের কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে আবার কেউ কেউ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজে প্রায় ৮৫% ভাগ মানুষের পেশা কৃষি। কৃষির উন্নয়ন অর্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, দেশের উন্নয়ন। কৃষিক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থার সহায়তার ফলে কোন কোন এলাকায় গরিব কৃষকেরা সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেবা সংস্থাগুলো গরিব কৃষক, চাষীদের কৃষি উপকরণ যেমন উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, ইত্যাদি সরবরাহ করার মাধ্যমে চাষীদের সেবা প্রদান করে। কৃষিক্ষেত্রে এসকল সংস্থার অবদান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এক্ষেত্রে তাদের অবদান ২০ শতাংশ যা গবেষকগণের ধারণা। কাজেই আমার মনে হয় গরিব, অসহায় চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থা যে কর্মসূচী পরিচালনা করছে ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

বাণিজ্য বৃদ্ধি

আমাদের দেশে কর্মরত সকল সেবা সংস্থাসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দরিদ্র অসহায় মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচন। এ লক্ষ্যে অন্যান্য সেবা সংস্থার ন্যায় ইসলামী সেবা সংস্থাগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। সেবা সংস্থাগুলো বিভিন্নমূখী ব্যবসার জন্য ঋণ প্রদান করে আর এর ফলে সনাতন কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তে নতুন পেশা ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হচ্ছে। আবার এ ব্যবস্থার ফলে ভূমির উপর অত্যধিক চাপ কমছে। দরিদ্র অসহায় মানুষ সেবা সংস্থার নিকট বিনাসুদে ঋণ নিয়ে উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় করে সাশ্রয়ী হয়। আবার কখনও সেবা সংস্থাগুলো গ্রামীণ মানুষ দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে অন্যত্র বাজারজাত বা রপ্তানি করে। গ্রামের কৃষক ও দিনমজুরের সাথে বাজার ও শহরের যোগাযোগ বাড়ছে যা সামাজিক গতির সৃষ্টি করছে। এদের সহযোগিতায় ব্যবসা করে অনেকেই দ্রুত নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছে। আমাদের দেশের জনগণের জীবন যাত্রার মান অত্যন্ত নিম্নমানের তারমধ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবস্থা আরও করুণ। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য করার মত সামর্থ নেই, এজন্য অনেক এলাকাতে ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে যার ফলে এই সংস্থার সেবা ও গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সঞ্চয় ও আয় বৃদ্ধি

'সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু', সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি আনে, তাই আমাদের দরিদ্র সমাজ যাতে তাদের দুর্দিন মোকাবেলায় ও সমৃদ্ধির জন্য পরমুখাপেক্ষী হতে না হয় সেজন্য মুসলিম এইড, ইসলামিক এইড বাংলদেশ, বাংলদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আদ্-দ্বীন, মসজিদ কাউন্সিলসহ ছোট বড় সকল ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ সঞ্চয় ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল সদস্যের মাঝে সাপ্তাহিক, মাসিক বা এককালীন সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলে, ফলে সদস্যগণ স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হয়।

এদেশে কর্মরত দেশী ও বিদেশী ইসলামী সেবা সংস্থার কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধি করা, ও সেই সাথে সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন। এসকল সেবা সংস্থাগুলোকে সঞ্চয় ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য যে কৌশল গ্রহণ করতে লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে আছে :

১. সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে তৃণমূল মানুষের ব্যক্তিগত তহবিল গঠন;

২. ঋণ তহবিল থেকে বিনাসুদে ঋণ দান;

৩. মানবিক দক্ষতা ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা;

Dhaka University Institutional Repository

৪. কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

৫. প্রয়োজনে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

ইসলামী সেবা সংস্থার এই কর্মসূচী গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন আমাদের জন্য অবশ্যই বিরাট প্রাপ্তি। এর ফলে বর্তমান চ্যালেঞ্জের যুগে মানুষ নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে পারছে।

ঋণ কর্মসূচী

আমাদের দেশের জনগণ দরিদ্র বিধায় বিভিন্ন সংস্থার নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারও ঋণ দিয়ে থাকে, কিন্ত সরকারি ঋণ সুদ ভিত্তিক ও তার প্রাপ্যতা কঠিন আবার সাধারণ এনজিওগুলো যে ঋণ দিয়ে থাকে তার সাথে চক্রাকারে সুদ জড়িয়ে আছে যার প্রভাবে অসহায় মানুষকে আরও সমস্যায় পড়তে হয়। আল্লাহ্পাক সুদকে হারাম করেছেন আর ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন, এলক্ষ্যে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ অসহায় মানুষের সেবাদানের জন্য সুদমুক্ত ঋণ দিয়ে থাকে। দরিদ্র, অসহায় মানুষ এসকল সেবা সংস্থার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে কৃষিকাজের উন্নতি ঘটায় অনেকে আবার ক্ষুদ্র ব্যবসার কাজে ব্যবহার করে যার মধ্যে রয়েছে মুদি দোকান, স্টক ব্যবসা, সবজি দোকান, ঔষধের দোকান, বীজের দোকান, বেডিং হাউস ইত্যাদি। কেউ এ সংস্থার নিকট থেকে ঋণ নিয়ে গরু ছাগল ক্রয় করে তা পালন করে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করে, অনেকে তাঁত, ভ্যান ও রিক্সা, ইঞ্জিন মেকানিক্স, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস চাষ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সক্ষম হচ্ছে এবং তাদের দেখে অন্যরাও উৎসাহী হয়ে এই সংস্থার কাছে ছুটে আসছে। এসকল সেবা সংস্থার ঋণ কর্মসূচী পর্যালোচনা করলে মনে হয় তারা নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করে-

১. আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা;

২. স্থানীয় সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার করা;

৩. সঠিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্প্রসারণ করা;

৪. গৃহায়ণ ও স্বাস্থ্য-সেবা বৃদ্ধি করা;

৫. দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন;

৬. নারীর ক্ষমতায়ন এবং

৭. দারিদ্র্য বিমোচন।

এসকল সংস্থা প্রতিবছর হাজার হাজার টাকা এ কর্মসূচীর আওতায় বিনিয়োগ করে জনগণের সেবা দিচ্ছে। তাদের এ ঋণ কার্যক্রম মোটামুটি দুটি ভাগে পরিচালিত হয়-

১. ব্যক্তিক: এখানে ঋণের পরিমাণ কম;

২. গ্রুপ ভিত্তিক: এখানে ঋণের পরিমাণ বেশী।

আমাদের দেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থার এ কর্মসূচীর ফলে অনেক লোক উপকৃত হচ্ছে। ইসলামী সেবা সংস্থা বিনা সুদে ঋণ দিয়ে থাকে এবং তা সহজলভ্য। এজন্য এদের সেবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দরিদ্র ও অসহায়দের মাঝে এদের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী সেবা সংস্থার নিকট থেকে এরূপ পাওনা নিশ্চয় আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য মঙ্গলজনক।

দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ আয়তনের তুলনায় অত্যন্ত জনবহুল দেশ। এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশত সত্তর বর্গ কিলোমিটার আয়তনের একটি দেশে লোক বাস করে চৌদ্দকোটি। পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের এই বাংলাদেশে। এখানে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭,[৭] মানুষের গড় আয়ু ৬১ বছর, মাথাপিছু আয় ৪৪৪ মার্কিন ডলার।[৮] দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে অর্ধেক মানুষ। কাজেই দারিদ্র্য সমস্যা বর্তমানে আমাদের বিরাট সমস্যা। আমাদের জনশক্তি আছে কিন্তু তাকে সম্পদে পরিণত করা যাচ্ছে না, সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এজন্য ঘোষণা করছে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র। কিন্তু এ বিপুল জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবেলা সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় এজন্য অন্যান্য সেবা সংস্থার ন্যায় ইসলামী সেবা সংস্থাও দারিদ্র্য দূরীকরণে কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে অবদান রাখছে।

আমাদের দেশে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ গ্রামীণ পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের পাশাপাশি এসকল সেবা সংস্থার উদ্যোগের ফলে বিগত বছরগুলোতে দারিদ্র্যের হার কমেছে। এই পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু না হলেও এক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থার একটা ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

জাতিসংঘসহ উন্নত বিশ্বের দেশসমূহ বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন রকম সাহায্য-সহানুভূতি দিয়ে থাকে তার আওতায় এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ যে সাহায্য-সহানুভূতি পায় তা দিয়ে আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দরিদ্রতা নিরসনের জন্য কাজ করে। দেশের অন্যান্য সেবা সংস্থাগুলোও বিদেশী ফাণ্ড পেয়ে থাকে কিন্তু সেখানে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় দেখা যায় তাদের সেবা নিতে গিয়ে অভাবী মানুষ আরও অভাবী হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থার ধারণা একদম পরিষ্কার। ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করে। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন "তোমাদের সম্পদে অসহায় ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"[৯] কাজেই ইসলামী আদর্শের ভাবধারার অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড নিশ্চয় দূষণীয়। আর এদিক লক্ষ্য রেখেই এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে যার মধ্যে রয়েছে-

১. দরিদ্রদের টার্গেট গ্রুপে অন্তর্ভূক্ত করা;

২. গ্রুপ গঠন, ঋণ দান, সচেতনকরণ, সহায়তা দান;

৩. ট্রেনিং, কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন;

৪. আয়, সঞ্চয় ও ঋণ দান;

৫. মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করা;

৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা;

৭. বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

এসকল কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আমাদের বাংলাদেশের সকল ধর্মের-বর্ণের মানুষ প্রকৃত সেবা লাভ করতে পারছে। এজন্য আমার মনে হয় ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের আদর্শ অনুযায়ী তারা অসহায় মানুষের সেবা দিতে পারছে যা আমাদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। সংস্থাসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী পরিচালনা করে এদেশের দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদের অবদান রেখে চলেছে ১৩ শতাংশ। কারণ সাধারণ সেবা সংস্থাসমূহের অনেকেই দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গরিব মানুষের সর্বস্ব লুট করে নেয় আবার সরকারি কর্মকাণ্ডে অনেকে উপেক্ষিত হয়। সেদিক থেকে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ তাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে। যা তাদের ভবিষ্যত কর্মসূচীর পথ আরও ব্যাপক করে তুলছে।

---

৭. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫*, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন (ঢাকা : ১৯৯৯), পৃ. ৯

৮. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৫, ঢাকা

৯. সূরা জারিয়াহ, আয়াত : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

অবকাঠামো নির্মাণ

আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য খাল-বিল, নদী-নালা জালের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদেশ গ্রাম প্রধান দেশ, শতকরা ৭৬.৬১% ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। আবার গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট কাঁচা ও আধাপাকা। গ্রামীণ সমাজে রাস্তাঘাট, কলকারখানা নির্মাণে সেবা সংস্থাসমূহের যথেষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা হাসপাতাল, স্কুল, আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বাধীনতার পর থেকেই এনজিওগুলো যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামীণ সমাজে অনেক কাঁচা পাকা রাস্তা ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি সেবা সংস্থাগুলোও নির্মাণ করছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে আবার উচ্চ শিক্ষার জন্য আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। তাছাড়া দুরারোগ্য ব্যধি ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য রাজধানীর উত্তরাতে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণ শুরু করেছে। ক্যান্সার বর্তমান বিশ্বের এক প্রাণঘাতি রোগ। আমাদের দেশের বিত্তশালীগণ উন্নত চিকিৎসার জন্য চলে যান বিদেশে, কিন্তু গরিব লোকদের ধুকে ধুকে মরতে হয়। একথা মাথায় রেখে মিশন ক্যান্সার হাসপাতল নির্মান কাজ আরম্ভ করেছে। এখান থেকে এদেশের মানুষ চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবে। এটা আমাদের জন্য এক বড় পাওয়া বলে আমার কাছে মনে হয়।

আবার অনেক সংস্থা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় স্থায়ী আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে যেখানে জরুরী মুহূর্তে অসহায় মানুষ আশ্রয় নিতে পারে। এক্ষেত্রে আদ্-দ্বীন সেবা সংস্থার অবদান বিশেষভাবে উল্লেযোগ্য। এসংস্থাটি যশোরে একটি এতিম খানা প্রতিষ্ঠা করেছে। অনেক এতিম এখানে থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করছে। এলাকায় বর্তমানে এই এতিমখানাটি বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। দিন দিন তার গ্রহণযোগ্যতা মানুষের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আদ্-দ্বীনের এ কর্মসূচী কিছুটা হলেও কিছু এলাকায় ভূমিকা রাখতে পারছে। এভাবে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো যে অবদান রাখতে পারছে তা প্রশংসার দাবি রাখে।

এলমে দ্বীন শিক্ষা

আখেরাতে মুক্তি, পার্থিব জগতে কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারকে কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। ইসলামের সুমহান আদর্শকে অত্যন্ত সহজ সরল ও সাবলীলভাবে আমাদের সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এ সেবা সংস্থাগুলো কাজ করে। এজন্য দাওয়াতী সভা, কুরআন, হাদীস অধ্যয়ন ও দর্শন, ওয়াজ মাহফিল, ইফতার মাহফিলের আয়োজনসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণাধর্মী ইসলামী সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা বিতরণ করে থাকে। জাতি পুনর্গঠন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থায় অনুদান প্রদান, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পাঠাগারে ইসলামী সাহিত্য প্রদান, অত্যাধুনিক অডিও-ভিজুয়্যাল পদ্ধতিতে দাওয়াহ কর্মসূচী পালন করে থাকে। এ সকল কাজে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, মসজিদ কাউন্সিল, ইসলামিক এইড ইত্যাদি ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলাম খুব গরিব অবস্থায় শুরু হয়েছে, অর্থাৎ নবুয়্যত প্রাপ্তির সময় সমসাময়িক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। নবীজি দাওয়াতের মাধ্যমে মানুষকে বুঝিয়ে ইসলামের পথে এনেছেন। কাজেই ইসলামী দাওয়াত ও এলমে দ্বীন শিক্ষা কার্যক্রম অবশ্যই সময়োপযোগী। সাধারণ সেবা সংস্থা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে কিন্তু অনেকে সুকৌশলে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে ও ইসলাম সম্পর্কে আপত্তিকর মনোভাব গড়ে তোলে, এজন্য ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো মনে করে দাওয়াতী কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে হবে যার ফলে অবহেলিত মানুষকে চরিত্রবানসহ আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়াতী কার্যক্রমের ফলেই ইসলাম আমাদের বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই দাওয়াতী কাজ না থাকলে কিন্তু ইসলামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেত সেদিক থেকে আমার মনে হয় ইসলামী সেবা সংস্থার এই কার্যক্রম ও বাস্তবায়নের সুফল নিশ্চয় আমাদের জন্য কল্যাণকর।

খাতনা ক্যাম্প

মুসলমান জাতির পিতা হযরত ইব্রাহিম (আঃ), যাকে আল্লাহ্‌র বন্ধু বলা হয়। আমরা সেই ইব্রাহিম (আঃ)-এর অনুসারী। আমরা তাঁর অনেক আদর্শ অনুসরণ করি। মুসলমানদের যে খাতনা দিতে হয় তা হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর আদর্শ। এ সুন্নাত তাঁর থেকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি উম্মতে মোহাম্মদীর উপরও অপরিহার্য সুন্নাত হিসেবে বহাল রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর উন্নত যুগেও এ সুন্নাত স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও যে প্রয়োজন তা প্রমাণিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। এ দেশের প্রেক্ষাপটে এ ধরণের একটি অতীব প্রয়োজনীয় সুন্নাত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে একটি বিরাট জনগোষ্ঠী মূলতঃ দারিদ্র্যের কারণেই এ সুন্নাতটি পালন করতে পারেনা। অনেকে আবার এ বিষয়ে এখনো পুরোপুরি সতর্ক নয়। এজন্য যে সকল ইসলামী সেবা সংস্থা খাতনা ক্যাম্প প্রকল্প গ্রহণ করে মানুষের সেবা করছে ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন ও আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম তার মধ্যে অন্যতম।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এদেশের দুঃস্থ মানুষের কল্যাণে সর্বদা নিবেদিত। সংস্থাটির সকল জেলায় সেবা কেন্দ্র আছে। তার মধ্যে আবার ময়মনসিংহ সেবা কেন্দ্র দরিদ্র বালকদের সুন্নাতে খাতনা কার্যক্রম পরিচালনা করে। আবার ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন এদেশের আর্ত-মানবতার সেবায় ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সংস্থাটি নিজেস্ব অর্থ তহবিল থেকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ও ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতালসমূহের সহায়তায় দেশের গরিব, অসচ্ছল, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত জনগণের বালক সন্তানদের খাতনা করানোর এক মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০০৪ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করার ফলে ইতোমধ্যে সারাদেশে ২৯টি খাতনা ক্যাম্প পরিচালিত হয়েছে। যার ফলে এ সংস্থার কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র পরিবারের ২১৭৫ জন বালকের খাতনা করানো হয়েছে।[১০] শুধু খাতনা করেই দায়িত্ব শেষ করে না বরং গরিব এসকল বালকদের ফ্রি-খাতনা করানোর পাশাপাশি শুভেচ্ছা উপহার হিসেবে লুঙ্গি, গেঞ্জি, গামছা ও তোয়ালে প্রদান করে থাকে।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম ও ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত খাতনা ক্যাম্প থেকে মানুষ সেবা গ্রহণ করছে যা সমাজে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। ভবিষ্যতে সকলের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে পরিচালনার পরিকল্পনা আছে বলে কর্মকর্তাগণ মনে করেন। ইসলামী সেবা সংস্থার এ প্রশংসনীয় উদ্যোগের সাথে একমত হয়ে বলা যায় যে, খাতনা প্রকল্প গ্রহণ ও তার সেবাদান আমাদের জন্য এক বিরাট পাওয়া।

ইমাম প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ মুসলিম দেশ, অসংখ্য মসজিদ এদেশের গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আবার আমাদের রাজধানী ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের নগরী। এক পরিসখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষাধিক মসজিদ রয়েছে।[১১] আবার এসকল মসজিদে কমপক্ষে ছয়লক্ষ ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম রয়েছেন।[১২] ইসলামী সেবা সংস্থা মনে করে নিঃসন্দেহে এটা এক বিরাট জনশক্তি। এ জনশক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদ পরিণত করা সম্ভব। এলক্ষ্যে অন্যান্য ইসলামী সেবা সংস্থা থেকে এক অন্যরকম কর্মসূচী 'মসজিদ কাউন্সিল' গ্রহণ করেছে, যাকে তাদের ভাষায় বলা হয় ইমাম প্রশিক্ষণ।

---

১০. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, পৃ. ১৭

১১. *মসজিদ কাউন্সিল পরিচিতি ২০০৫*, মসজিদ কাউন্সিল ফর কমিউনিটি এ্যাডভান্সমেন্ট (মক্কা), পৃ. ৩

১২. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ মোট ইমামদের শতকরা ৯০ শতাংশ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ইমাম গড়ে তুলে উন্নত জীবন যাপনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ তাদের অবদান রেখে চলেছে ১০ শতাংশ। আবার ইমাম সাহেবগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা উল্লেখসহ দক্ষতার সাথে জুমুয়ার নামাজে খুতবা প্রদান করে মানুষকে সচেতন করে তোলেন। যা বর্তমান সময়ের জন্য এক বিরাট অর্জন।

আবার মসজিদ ভিত্তিক মক্তব পরিচালনা করে থাকেন, যেখানে দুঃস্থ অসহায়, অভাবী, গরিব ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ধর্ম শিক্ষা দেয়া হয়। যা আমাদের জন্য এক বিরাট সাফল্য। তাছাড়া ইমামগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবহার, আর্সেনিকের ভয়াবহতা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার ও এইড্স থেকে বাঁচার উপায় ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রশিক্ষিত ইমামদের এই সচেতনমূলক বক্তব্য অত্যন্ত জরুরী বিধায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনা সৃষ্টি করছে। অন্যান্য সাধারণ সেবা সংস্থাগুলোও এসকল ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করে কিন্তু ইসলামী সেবা সংস্থা এসকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ধর্মীয় অনুভূতির সাথে দিয়ে থাকেন। আবার বাংলাদেশের মানুষ অত্যধিক ধর্মপরায়ণ, এজন্য ইসলামী সেবা সংস্থার এ উদ্যোগ বেশি কার্যকরী। কাজেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে আর্ত-মানবতাকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইসলামী সেবা সংস্থার ইমাম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও সেই অনুযায়ী মানুষকে সচেতন করা এবং সমাজে তার সঠিক বাস্তবায়নের সুফল লাভ আমাদের জন্য নিশ্চয় মঙ্গলজনক বলে আমার ধারণা। এজন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইমাম প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্যই ইসলামী সেবা সংস্থার নিকট এক বড় প্রাপ্তি যার সুফল আমরা ভোগ করছি।

মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। তিনি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে অনেক জিনিসের নাম শিখিয়ে তাকে ফেরেশতাদের সামনে হাজির করেন। আবার পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার সময় প্রথম কথা ছিল 'পড়'[১৩], মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন- "বিদ্যা অর্জন প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য"।[১৪] এসকল উক্তিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে যে জিনিসটি ফুটে ওঠে তা হলো শিক্ষা। পৃথিবীর যে জাতি যত শিক্ষিত তারা তত উন্নত। কিন্তু এই শিক্ষা আমাদের দেশের জন্য এক মহাসমস্যা। এখানে লোক সংখ্যা এতবেশি যে, অধিবাসীদের উন্নয়ন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অনেক আগেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া জনগণকে একাজে উৎসাহী করার লক্ষ্যে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা, মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যার প্রভাব সমাজে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এত সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরও মনে হয় মানুষ অসচেতন, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, তারা মনে করে লেখা পড়া শিখে কি লাভ? এখানে চাকরি নেই, কর্মক্ষেত্র নেই, কাজেই সংসারের উন্নতির লক্ষ্যে স্কুলে না যেয়ে মাঠে গেলেই ভাল। আর এজন্য দেখা যায় আমাদের দেশে অসংখ্য শিশু শ্রমিক, যারা বিভিন্ন পেশায় কাজ করছে।

ইসলামী সেবা সংস্থা মানবসেবায় নিয়োজিত। আদ্-দ্বীন, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, মসজিদ কাউন্সিল, মুসলিম এইড, ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন ইত্যাদি ইসলামী সেবা সংস্থা অসহায় ও সুযোগ বঞ্চিত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। এসব মক্তবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে সঠিক কুরআন পাঠসহ বাংলা, ইংরেজি, অংক, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞানসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দিয়ে সুবিধা বঞ্চিতদের শিক্ষার পথ সুগম করছে। কম বেশি শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত মক্তবে আড়াই থেকে তিনঘন্টা সময় পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। মক্তবের কোর্স শেষ করে শিক্ষার্থীরা

---

১৩. সূরা আলাক, আয়াত : ১

১৪. আবু অবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাযাহ আল-কাযভীনী, *সুনানু ইবনে মাজাহ* (দিল্লী : আল মাকতাবা রশীদিয়া, ১৩৭৬ হিঃ), ১ম খণ্ড

Dhaka University Institutional Repository

আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভর্তি হয়ে থাকে। এদের শিক্ষা উপকরণ সংস্থাসমূহ বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও বয়স্কদের জন্য কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র ও চালু করেছে। যেখান থেকে অশিক্ষিত লোকেরা কুরআন শিখতে পারে। উল্লেখিত কর্মসূচী পর্যালোচনা করে গবেষকগণ মনে করেন, এদেশে পরিচালিত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ অবদান রাখছে।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু আমাদের দেশে দুঃখজনকভাবে শিক্ষার হার খুব নিম্ন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব, উপায় উপকরণ স্বল্পতা, প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার জন্য দেশের মোট ছেলে-মেয়ের এক বিরাট অংশ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। অশিক্ষার এ অভিশাপ থেকে আমাদের এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার জন্য এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো বদ্ধপরিকর। এসকল সেবা সংস্থাসমূহ মসজিদ ও মক্তবভিত্তিক শিক্ষা দেয়। কখনও দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা দান, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদেরকে এককালীন সহায়তা দান করে থাকে। মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা দেয়ার ফলে অনেকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছে। এক সময় মনে করা হত মেয়েরা ঘরে বসে শুধু সংসার দেখাশুনা করবে কিন্তু বর্তমান সেই দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে। মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়ে সবাই পড়া-লেখা শিখছে, যা আমাদের সুশিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিশেষ উদাহরণ। সুতরাং ইসলামী সেবা সংস্থার মসজিদ ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা চালু করে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে যে অবদানটুকু রাখছে তা আমাদের কাছে অনেক কিছু বলে মনে হয়। আমরা আশা করি তারা তাদের এ প্রকল্পের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও বড় অবদান রাখতে পারবে।

চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার

আমাদের দেশ পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ, আর এর প্রধান কারণ হল আয়তনের তুলনায় অত্যধিক লোকসংখ্যা। বিজ্ঞানীদের মতে এদেশের আবহাওয়া মানুষের অনুকূল, আবার অশিক্ষিত ও মুর্খতার জন্য অধিক জনসংখ্যার কারণ। অধিক জনসংখ্যার চাপ প্রধানত খাদ্যের উপর প্রভাব ফেলে। আর এর ফলে দেখা যায় এদেশের অনেক স্নেহময়ী জননীরা দু'মঠো খাবার বা সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রিও করে দিচ্ছে তার কলিজার টুকরা সন্তানকে। অনেক মা আবার হাসপাতালে, রেলস্টেশনে, ফুটপাতে বা ডাস্টবিনে ফেলে চলে যাচ্ছে তার গর্ভজাত সন্তানকে। নিজের চোখ পর্যন্ত বিক্রি করে সন্তানের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করতে চায়। এ অবস্থা দেখলে যে কোন মানুষের মনে সহানুভূতি জাগার কথা। মনে হয় এ অবস্থায় আল্লাহ্ ছাড়া তাদের দেখার কেউ নেই। কিন্তু এরাও তো মানুষ ও আল্লাহ্র সৃষ্টি। হৃদয়বান মানুষের উচিত এদের পাশে দাঁড়ানো। এলক্ষ্যে এসকল এতিম, প্রতিবন্ধী ও পরিত্যক্ত শিশুদের প্রতিপালন ও পূনর্বাসনের জন্য অন্যান্য সেবা সংস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মসজিদ কাউন্সিল চালু করেছে 'চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রাম। এখানে অনেক ছেলে মেয়ে প্রতিপালিত হচ্ছে। এদের বাসস্থান, উন্নত খাবার, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সেবা প্রদান করাসহ এদের পিছনে অনেক টাকা ব্যয় হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, অভিভাবকহীন সন্তান কখনও মানুষ হয় না। অথচ এই ইসলামী সংস্থাটি পিতা-মাতা পরিচয়হীন শিশুদের এনে তাদের মৌলিক অধিকার পূরণসহ পুনর্বাসনের দায়িত্ব পর্যন্ত নিয়েছে। কাজেই আমার মনে হয়েছে সংস্থাটি আমাদের অনেক কিছু দিতে পারছে।

কম খরচে চক্ষু চিকিৎসা

এদেশের প্রতি ৩৮০০ জন মানুষের জন্য একজন ডাক্তার আছে।[১৫] চিকিৎসার সুযোগ সুবিধাটুকু আবার শহরের মানুষই বেশি ভোগ করে ফলে উপেক্ষিত থেকে যায় গ্রামীণ অসহায় মানুষ।[১৬] এদেশের শতকরা ৭৬.৬১% লোক গ্রামে বাস করে। এদের অনেক সময় বিভিন্ন রোগ-শোকে কষ্ট পেতে দেখা যায়, তার

---

১৫. *মানব সম্পদ উন্নয়ন রিপোর্ট ২০০৫*, ঢাকা

১৬. *চতুর্থ আদম শুমারী প্রাথমিক রিপোর্ট*, ২৩-২৭ আগষ্ট, ২০০১, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে চোখের রোগ বর্তমানে ব্যাপকহারে ছড়াচ্ছে। চিকিৎসার অভাবে অকালেই হারাতে হয় অতীব প্রয়োজনীয় এই অঙ্গটি। কথায় বলে–'চোখ বুজিলে দুনিয়া আঁধার' আসলেই কথার বাস্তবতা আছে। যারা চোখে দেখে না তারা এত সুন্দর পৃথিবীর কোন কিছুই উপভোগ করতে পারে না। তখন তাদের মনে হয় বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, বর্তমানে আমাদের দেশে রোগাক্রান্ত জনসমষ্টির প্রায় ১০% ভাগ লোক চোখের বিভিন্ন প্রকার রোগে ভোগে। চোখ মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ। অথচ চিকিৎসা সহজলভ্য না হওয়ায় প্রতিবছর অন্ধত্ব ও নানাবিধ চোখের সমস্যায় বিপুল জনগোষ্ঠীকে সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে এসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক সংখ্যক আছে যাদের উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব। সামগ্রিকভাবে এদেশের প্রতিবছর প্রায় ২কোটি লোকের চোখের অপারেশন প্রয়োজন হয়।

এসকল দরিদ্র জনগণের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে তাদের সুস্থ করে তুলে স্বাভাবিক জীবন তথা কর্মক্ষম করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনার পাশাপাশি সমাজের বিরাট বোঝাকে সম্পদে পরিণত করার মহান লক্ষ্যে আর্ত-মানবতার সেবা ও সমাজ উন্নয়নে নিবেদিত ইসলামী সেবা সংস্থা 'ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন' যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার নাম "কম খরচে চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প।" এই প্রকল্পের অধীনে ইসলামী সেবা সংস্থা ১০ শতাংশ চক্ষুরোগীর মধ্যে ৪ ভাগের উন্নত চিকিৎসা প্রদান করে থাকে।

অন্যান্য ইসলামী সেবা সংস্থারও চিকিৎসা প্রকল্প আছে কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন অতি সহজলভ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে জনগণের বাহবা কুড়িয়েছে। ইতোমধ্যে তাদের এই প্রকল্প দেশের অনেক স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। মাত্র ২০ টাকা এন্ট্রি ফি ও ১৫০০/- টাকায় লেন্স এর সাহায্যে চোখের ছানি অপারেশন করার ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্যাপকহারে উপকৃত হতে পারছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশনের প্রকল্প থেকে এদেশের মানুষ যে সেবা গ্রহণ করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। আমরাও তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি।

মসজিদ ও অযুখানা নির্মাণ

ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো ইসলামী ভাবধারা বজায় রেখে জনসেবা করে। আমাদের দেশে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে অধিক সংখ্যক গরিব মানুষ বাস করে। আল্লাহ্‌র এবাদত করার জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধার মসজিদ নির্মাণ তাদের পক্ষে সম্ভব নয় আবার এমন অনেক মসজিদ আছে যা অনেক আগে নির্মাণ হয়েছে সেটাকে আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। এরকম স্থান ও পরিস্থিতিতে এদেশের কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা বিদেশী সাহায্য বা স্ব-অর্থায়নে মসজিদ নির্মাণ করছে। আবার অনেকক্ষেত্রে অযুখানাও নির্মাণ করছে। এক্ষেত্রে পানির ট্যাংক ও পানির পাম্প সম্বলিত অনেক সীটের অযুখানা নির্মাণ করছে। এ কর্মকাণ্ডে 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ' ও রিভাইভাল অব 'ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত' এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার অধীনে অনেক মসজিদ ও অযুখানা নির্মাণ সম্ভব হয়েছে এবং লোকজন উন্নত পরিবেশে মহান আল্লাহ্‌র এবাদত করতে পারছে। বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "অযুখানা নির্মাণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প সংখ্যা মোট ৫০টি।"[১৭] আবার রিভাইভাল অব 'ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি কুয়েত' এই সংস্থার এক প্রতিবেদনে বলা হয় "সংস্থাটি গত ৯ বছরে বাংলাদেশের ৪৫টি জেলায় এ পর্যন্ত ৭ শতাধিক ছোট বড় পাকা বিল্ডিং এর মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন করেছে[১৮]।" এছাড়া সংস্থাটি অন্য এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করে–"এ পর্যন্ত মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় পানির ট্যাংক ও পাম্প সম্বলিত ৮, ১০, ১২ সীটের ১১শ অযুখানা নির্মাণ করেছে ও বর্তমানে ১০০ অযুখানা নির্মাণাধীন আছে।"[১৯]

---

১৭. *ত্রিবার্ষিক রিপোর্ট ২০০০-২০০২*, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, পৃ. ১৩

১৮. *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৫*, রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি-কুয়েত, বাংলাদেশ অফিস

১৯. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী সেবা সংস্থার এসকল পরিসংখ্যান থেকে একথা বুঝা যায় যে, সাধারণ সেবা সংস্থা যখন দরিদ্র মানুষকে আরও দরিদ্রতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন ইসলামী সেবা সংস্থা মানুষকে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করে তুলছে। যার বাস্তবতা আমরা মসজিদ ও অযুখানা নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে পাচ্ছি। খুলাফা-ই-রাশেদার কোন কোন খলীফা মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির কথা চিন্তা করে ও অত্যাবশ্যক মনে করে রাজ্যের অনেক স্থানে মসজিদ ও অযুখানা নির্মাণের মাধ্যমে এবাদতের পথ সুগম করেন, ঠিক একই ভাবধারায় আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে ইসলামী সেবা সংস্থা যে প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষকে ধর্মীয় সেবা দিচ্ছে তার প্রাপ্তিস্বীকার প্রয়োজন বলে মনে হয়।

যৌতুকবিহীন বিবাহ

যৌতুক শব্দটি বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন সুন্দর একটি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়া। আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সুন্দর প্রক্রিয়াটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন যৌতুকের ছোবলে পড়ে। যৌতুক আজ একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আর এজন্য সর্বমহলে ইহা পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমান সময়ে যৌতুক প্রথা যুলুম ও নারী নির্যাতনের সমর্থক। বিবাহের সময় কন্যা পক্ষ বর পক্ষকে বা স্ত্রীকে প্রদত্ত উপঢৌকনই মূলত যৌতুক। অর্থাৎ মুসলমানদের ব্যক্তি আইন বা শরীয়ত আইন অনুসারে বিবাহের কাবিননামায় লিখিত বা অলিখিত চুক্তির অধীনে স্বামী স্ত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে যে মোহর বা দেনমোহর বা মোহরানা দেয় তাকে যৌতুক বলা হয়না। অন্যদিকে যৌতুকের সম্পর্কে বলা হয়েছে- "Property that a wife or wife's family gives to the husband upon marriage. In certain societies the dowry formed a part of an exchange of wealth between intermarrying families; it was after accompanied by some payment made by the groom to the brides family, called the bride price."[২০]

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে যৌতুক বিভিন্ন নামে বিস্তার করছে। কখনো ঘর সাজানোর নামে কনের বাড়ি থেকে উপহার নামে কখনো স্বনামে ছোবল মারে। নিম্নবিত্ত অশিক্ষিত সমাজে নগদ টাকার মূল্যে যৌতুক নেয়া হয়। আবার মধ্য বিত্ত ও উচ্চ বিত্ত সমাজে গহনা, অলংকার, চাকরি ইত্যাদি কন্ডিশন উল্লেখ করা হয়। এখানে কন্যার পিতা বা অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা না করে দাবী দাওয়ার এক ফর্দ চাপিয়ে দেয়া হয়। এদিকে কন্যার পিতা মেয়ের বিবাহ দেয়ার জন্য জমি সম্পদ বিক্রয় করে বর পক্ষের দাবী মেটাতে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। এরপরও স্বামী পক্ষের দাবী শেষ হয় না, তাদের অব্যাহত দাবী পূরণ করতে না পারলে মেয়ের উপর নেমে আসে নির্যাতন, যুলুম ও নিষ্পেষণ। এ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে কখনো মেয়ে ফিরে আসে বাপের বাড়ি, কখনোবা বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ, কেউ ধুকতে থাকে নিষ্ঠুর সংসারে।

যৌতুক বর্তমান সময়ে এক মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। নারী নির্যাতনের দিক থেকে বাংলাদেশ শীর্ষ পর্যায়ে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও ইউএনডিপি'র এক গবেষণায় দেখা গেছে যৌতুকের কারনে বিবাহিত নারীদের শতকরা ৫০জন মহিলা শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়। আমাদের বর্তমান মানসিকতায় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ, অন্যায় চাপ প্রয়োগ করে কনের পিতার নিকট থেকে অর্থসম্পদ গ্রহণকে অনৈতিক মনে করা হয় না। অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার সাহায্যার্থে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থার মধ্যে কোন কোন সংস্থা যৌতুক বিরোধী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে অসহায় ও গরিব মানুষের উপকার সাধন করছে। এক্ষেত্রে 'আদ্-দ্বীন, আল-আমান ও বাংলাদেশ চাষীকল্যাণ সমিতি'-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি' সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষের জন্য যৌতুকবিহীন বিবাহ কর্মসূচী পরিচালনা করে। সমাজ থেকে যৌতুক নির্মূল করতে সমিতির সেবাদান কর্মসূচীর আওতায় যৌতুক বিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও

---

২০. *জাগরণী*, '৭ম জাতীয় সম্মেলন ২০০৩ ও যৌতুকবিহীন অনুষ্ঠান স্মারক', বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যাদের বিবাহে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে জাতীয় ও আঞ্চলিক সম্মেলনে যৌতুক বিহীন বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে সমিতির ৭ম জাতীয় সম্মেলনে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে ২০০ বর কনের যৌতুক বিহীন এক বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিবাহের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পোশাক সামগ্রী, গহনা, আপ্যায়ন ও আনুসঙ্গিক সামান্য ব্যয় হয়।[২১] এ সংস্থাটি অসহায় দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কন্যাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে। চাষী কল্যাণ সমিতির এ উদ্যোগের ফলে অনেক লোক কন্যাদায়গ্রস্ত থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এজন্য সংস্থাটি সকল মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। যৌতুকবিহীন বিবাহ-অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সংস্থাটি নারী নির্যাতনের হার কমিয়েছে ৫ ভাগ।

বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি ও অন্যান্য ইসলামী সেবা সংস্থা যারা যৌতুকবিহীন বিবাহ দিয়ে মানুষের সেবা দিচ্ছে তাদের কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানিয়ে বলতে চাই, এ মহতি উদ্যোগ অব্যাহত রেখে আরো এগিয়ে যেতে পারলে যৌতুক বিহীন বিবাহ সমাজে ব্যাপক প্রসার লাভ করবে। এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য সেবা সংস্থাসমূহের অনুসরণ করা উচিৎ। যারা সমাজে অর্থবান তারা বেকার তরুণ-তরুণীদের প্রতিষ্ঠিত করে এ ধরণের দৃষ্টান্ত স্থাপনে এগিয়ে আসবে আমরা এ আহবান জানাই। সমাজে যারা না চাইতেই যৌতুকের ডালা সাজিয়ে পাত্রপক্ষকে দেন তাদের এ কর্মসূচী থেকে শিক্ষা নেয়া উচিৎ। তাহলে যৌতুকের লোভ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে পড়বেনা। আর যারা যৌতুক চায় তাদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। এতে যৌতুক উচ্ছেদ সহজ হবে। কাজেই এ রকম এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করে যে সকল ইসলামী সেবা সংস্থা সমাজ থেকে যৌতুক উচ্ছেদের চেষ্টা চালাচ্ছে তাদের নিকট আমাদের আরও আশা রইল তারা যেন তাদের এ মহতি উদ্যোগ আরও সম্প্রসারণ করে অসহায় মানুষের সেবাদান করে।

ফ্রি এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম এদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ইসলামী সেবা সংস্থা। এই সংস্থার অনেক এ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। এসকল এ্যাম্বুলেন্সগুলো রোগী আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। যেকোন সময় যে কোন অবস্থায় এ এ্যাম্বুলেন্সগুলো রোগীর কাছে পৌঁছে যায় এবং তার ইচ্ছামত স্থানে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।

আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম বিশ্বাস করে যে, সকল মানুষের আর্থিক অবস্থা এক রকম নয়। যাদের অর্থ আছে তারা বিদেশে যায় বা জরুরী মুহূর্তে অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছামত চিকিৎসা সেবা নিতে পারে কিন্তু যাদের অর্থ নেই তারা কি বিনা চিকিৎসায় নিজের ঘরে থেকেই মরে যাবে? না তা হতে পারে না, বেঁচে থাকার অধিকার সকল মানুষের আছে। এলক্ষ্যে সংস্থাটি সকল মানুষের জন্যই এই সার্ভিস চালু করেছে। গরিব, অসহায়, দুঃস্থ রোগী বহনের জন্য সর্বদা তৎপর রয়েছে তাদের এ্যাম্বুলেন্সগুলো।

আমাদের দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে সকল এ্যাম্বুলেন্স আছে তার সংখ্যা কম ও দুর্লভ টাকা থাকা সত্ত্বেও তা পাওয়া কষ্টকর। অথচ আঞ্জুমানের এ্যাম্বুলেন্স শুধু সংবাদ দিলেই পৌঁছে যায় দোরগোড়ায়। আঞ্জুমানের এই সার্ভিস ও মানবসেবা নিশ্চয় এদেশের গরিব, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি। আমরা আশা করি আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম যেন এই সার্ভিসকে আরও সহজলভ্য করে তোলে।

ধূমপান, মাদকতা ও এইড্‌স বিরোধী সচেতনতা

বর্তমান সময়ে ধুমপান ও মাদকদ্রব্যের প্রভাব সমাজে ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে দুটিই অবৈধ। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সঃ) তাঁর হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইহা অবৈধ এবং ক্ষতিকারক। এর প্রভাবে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটায়।

---

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

আবার ধুমপানে রয়েছে নিকোটিনের মত বিষাক্ত বস্তু যা আবাল, বৃদ্ধ বণিতা সকলের জন্য ক্ষতিকর। শুধু তাই নয় এর প্রভাবে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

অন্যদিকে মাদক দ্রব্যের প্রভাব মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এ উভয় জিনিসের প্রভাবে মানবদেহে গ্যাস্টিক, আলসার, ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি কঠিন রোগ হতে পারে। আবার এতে আর্থিক, ধর্মীয়, সমাজিক, পারিপার্শ্বিক নানাবিধ ক্ষতি হয়ে থাকে। সমাজে এর নানারকম প্রভাব পড়ে থাকে, মাদকের প্রভাবে মানুষ নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে নেশার আওতায় যেসকল দ্রব্য অন্তর্ভূক্ত তা হলো-

ক. সিগারেট;

খ. চুরুট;

গ. বিড়ি;

ঘ. হুক্কা;

ঙ. মদ;

চ. গাজা;

ছ. হিরোইন;

জ. কেনসিভিল এবং

ঞ. তাড়ি।

এসকল দ্রব্য আমাদের সামজে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল দ্রব্য গ্রহণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। অনেক সময় ধুমপান ও মাদকাসক্তির কারণে ঝগড়া-বিবাদ ও পারিবারিক বিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি মাদকাসক্ত হলে তার দ্বারা দেশের প্রতিরক্ষা ও কৌশল গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। এর প্রভাবে ব্যাভিচার ও নরহত্যার মত অপরাধ ঘটে থাকে। যানবাহন দুর্ঘটনা বেশির ভাগ হয় মাদকাসক্তির প্রভাবে। মাদকের পিছনে প্রতিদিন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অপব্যয় পরিবার ও সমাজের জন্য অপরিসীম দুর্ভোগ নিয়ে আসে। অনেক সময় ছিনতাই লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধ ঘটে থাকে।

ধুমপান ও মাদকের প্রভাবে দেশে অপরাধ বেশি হওয়ার ফলে সরকার বিভিন্নরকম সচেতনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ-এর বিরুদ্ধে অনেক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে 'মসজিদ কাউন্সিল' মাদকাসক্তি ও ধুমপানের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষ কর্মসূচী পরিচালনা করে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মাদকাসক্তি ও ধুমপান, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে সে বিষয়ে প্রচার ও প্রসারে এ সংস্থাটি সব সময় নিয়োজিত। তাদের এই কর্মসূচীর ফলে যদি সামান্য একটুও উপকার হয় তবে তা সংস্থার জন্য একটি বড় পাওনা।

এইড্স বর্তমান বিশ্বের একটি আলোচিত ব্যধির নাম। এই রোগের ঔষধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই কারও এ রোগ হলে তার মৃত্যু নিশ্চিত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি। আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে আমাদের দেশে সেই অবস্থা নেই কিন্তু তারপরও কিছু মানুবের দেহে এরোগের ভাইরাস পাওয়া গেছে। এ রোগের কারণ হিসেবে বলা হয় অবৈধ যৌন মিলন, আবার এর প্রধান ঔষধ হলো ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। এ রোগ যদি কারও দেহে প্রবেশ করে তার মৃত্যু নিশ্চিত। সামাজিকভাবেও এ রোগটিকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় এবং এ ধরণের রোগীকে সামাজিকভাবে বয়কটও করা হয়। এ অবস্থার যাতে সৃষ্টি না হতে পারে ও মানুষ যেন এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্বন্ধে জানতে পারে এলক্ষ্যে মসজিদ কাউন্সিল যে কর্মসূচী পরিচালনা করে মানুষের উপকার করছে তাকে

Dhaka University Institutional Repository

আমরা সাধুবাদ জানাই। সংস্থাটি মনে করে এইড্‌স একটি মারাত্মক ব্যধি, এর পরিণতি কি, এই রোগ কেন হয়, কিভাবে এই রোগ ছড়ায় এবং কিভাবে এর ছোবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায় সে সম্পর্কে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করতে হবে। ইমাম সাহেবদের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে এই রোগের ভয়াবহতা ও এর প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।

বিশেষ কার্যক্রম

এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ আলোচিত খাতসমূহ ছাড়াও বিশেষ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে যা থেকে মানুষ উপকার লাভ করে। এসকল বিশেষ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে রমজান মাসে ইফতার ব্যবস্থা, আকিকার ব্যবস্থা, বিধবা, এতিম, প্রতিবন্ধী, স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, অসহায় শিশু, পুরুষ, বয়স্ক পুরুষ ও নারী, দরিদ্র পরিবার, পথ শিশু বাছাই করে তাদের সাহায্য করা। এক্ষেত্রে মুসলিম এইড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থেকে যে সাহায্য সহানুভূতি পায় তা গরিব, অসহায়দের উৎসবের জন্য ব্যয় করে। আবার ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন তার বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় যাকাত ফাণ্ড চালু করেছে। এর আওতায় যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে দুঃস্থ মানবকল্যাণে যে ভূমিকা রাখছে তা অনেক প্রশংসার দাবিদার। এ সংস্থার যাকাত ফাণ্ড থেকে যে সকল খাতে ব্যয় করা হয় তা হলো-

১. গরিব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে আর্থিক সহায়তা প্রদান;
২. গরিব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান এবং গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী পালনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান;
৩. গরিব লোকদের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নগদ অর্থ দান;
৪. গৃহহীনদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য নগদ অর্থ দান;
৫. পরিবারের সদস্যদের ভরণ পোষণের জন্য মানবিক প্রয়োজন পূরনে আর্থিক সহায়তা দান;
৬. এতিমখানা ও লিল্লাহ্ বোডিং এর ছাত্র-ছাত্রীদের ভরণ পোষণের জন্য আর্থিক সহায়তা দান;
৭. ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা;
৮. গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পড়ার ব্যয়ভার নির্বাহে আর্থিক সহায়তা দান;
৯. গরিব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা বাবদ আর্থিক সহায়তা দান;
১০. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গরিব লোকদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা;
১১. দুঃস্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান।

ইসলামে যাকাতের আর্থিক গুরুত্ব অত্যধিক। যাকাতের সাথে অর্থের সম্পর্ক আছে আর তা কেবল গরিব ও অসহায়দের জন্য ব্যয় করার জন্য বলা হয়েছে। যাকাতের অর্থ ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্‌পাক আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেই খাতের দিকে রক্ষ্য রেখে ও সেই আলোকে বর্তমান যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য এমন শ্রেণীর মানুষ চিহ্নিত করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্থ সহায়তা করে যা মানুষকে স্বাবলম্বী হতে প্রেরণা যুগাচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় এলোমেলো ও বিচ্ছিন্নভাবে যাকাতের অর্থ ব্যয় না করে পরিকল্পনা মাফিক খরচ করা উচিত যাতে সমাজের অসহায় মানুষগুলো সেই অর্থ দিয়ে নিজের ভাগ্য গড়ে নিতে পারে। আর এলক্ষ্যে এ সেবা সংস্থা মানুষকে স্বাবলম্বী করার জন্য যেভাবে যাকাতের ফান্ড গঠন করে অর্থ ব্যয় করে তা অবশ্যই মঙ্গলজনক।

বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ক্ষুদ্র দেশটির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বাস করে ৯৩৮ জন।[২২] এছাড়া বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি

২২. অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃতিক দুর্যোগতো আমাদের নিত্যসঙ্গী। আয়তনের তুলনায় অত্যধিক জনসংখ্যা ও নিত্যসঙ্গী নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বিশাল এই জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য অংশই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এ অবস্থার উন্নয়নে সরকার চেষ্টা করছে, কিন্তু সরকারের একার পক্ষে গরিব, দুঃস্থ জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হয়না। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, সেবাধর্মী ও জনকল্যাণমূলক সংস্থা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এলক্ষ্যে এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ দেশের অভাবী জনগণের অতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে মানুষের মন জয় করতে পারছে।

এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে অসহায় মানুষকে সেবা দিচ্ছে এমনকি তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিচ্ছে। সংস্থাগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করে জাতিকে শিক্ষিত করে তুলছে। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, এতিম ও দরিদ্রদের জন্য কারিগরী প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে। অনাথ, দুঃস্থ জনগণের মাঝে সাহায্য প্রদান, উৎসব-পার্বণে দুঃস্থদের মাঝে কাপড় বিতরণ, ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় জনগণের মাঝে ত্রাণ বিতরণসহ বিভিন্ন সাহায্য দিয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে সেবা সংস্থার সবচেয়ে আলোচিত কর্মকাণ্ড হল ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প। আর এক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ বিনা সুদে গরিবদের মাঝে এই ঋণ প্রদান করে যার ফলে গরিব মানুষ এই সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করে স্বাবলম্বী হতে পারছে। অনেক সংস্থা আবার দাওয়াতী কাজ করে যা থেকে মানুষ ধর্মের প্রাথমিক বিষয়সমূহ জানতে পারে। এছাড়া যৌতুক বিরোধী আন্দোলন, ধূমপান, মাদক, এইড্‌স সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে তুলছে। এদেশের গরিব কৃষকের পক্ষেও কাজ করছে কোন কোন ইসলামী সেবা সংস্থা।

সাধারণ সেবা সংস্থার নির্যাতনে যখন মানুষ অসহায় তখনই ইসলামী সেবা সংস্থার হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত আবির্ভাব। এ সংস্থা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অসহায় মানুষের যে সেবা দিচ্ছে তার জন্য তাদের সাধুবাদ জানাই। আরও আশা করি যেন ভবিষ্যতে তাদের কর্মসূচী আরো ব্যাপক ও বেগবান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামী সেবা সংস্থা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে মানবসেবায় নিয়োজিত। ইসলাম সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা, আর নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর মাধ্যমে আমরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়েছি। মুহাম্মদ (সঃ)-এর কর্মময় জীবন আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।[২৩] তার আগমন বার্তা বিশ্ববাসীর জন্য আশীর্বাদ। তিনি তার কর্মের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হন। এতিম, গরিব, মিসকীন, অসহায়দের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করে সাম্য ও সম্প্রীতির যে নজীর স্থাপন করেছেন তা যুগে যুগে মানুষ অনুসরণ করে চলেছে। আর্ত-মানবতার পাশে দাঁড়ানোর জন্য তিনি নির্বিশেষে সকল মানুষকে উৎসাহিত কে ছেন।

বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সামষ্টিক প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছে একথা ঠিক, কিন্তু আর্ত-মানবতার সেবার মাধ্যমে মুসলমান যে আসনে অধিষ্ঠিত তার ধারে কাছেও তারা নেই। পাশ্চাত্য জাতীর মানবকল্যাণ কর্মকাণ্ডের পিছনে লোভ, খ্যাতির মোহ, প্রচারণা ও সুনাম অর্জনের ইচ্ছা সক্রিয় থাকে, সেক্ষেত্রে ইসলামী সেবা সংস্থার কর্মকাণ্ডের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন।

ইসলাম এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম যা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন।[২৪] সেই ধর্মের মূল শিক্ষা হলো মানবকল্যাণের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জন। মানবতার সেবার প্রতি কুরআন ও হাদীসে অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্তমানে সাধারণ মানুষের মনে এ ধারণা জন্ম দিয়েছে যে, বেহেস্তে যাওয়ার জন্য কালিমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জই যথেষ্ট। কিন্তু মানবকল্যাণ যে মুক্তির অন্যতম উপায় একথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবেনা। ঈমান আনা ও মু'মিন হওয়া এক কাজ, কিন্তু ভালো কাজ ব্যতীত জান্নাত লাভের কোন সুযোগ নেই একথা সকলেরই জানা দরকার। সৃষ্টি জগতের প্রতি যে কোন সহায়ক কাজ করতে পারলেই আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। এজন্য ভালো কাজের প্রতি সকলের উৎসাহী হওয়া দরকার।

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এখানে মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে হলে অর্থের প্রয়োজন একথা সত্য। আজও আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে। এসব লোকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে অর্থের প্রয়োজন, তবে সেবা ও অর্থকে এক করে ফেলা যায় না কারণ অর্থের মাধ্যমে যেমন অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব তেমনি শুধু শ্রম দিয়েও অনেক ভালো কাজ করা যায়। আবার অনেক ভাল কাজ শুধু জ্ঞানের মাধ্যমে করা সম্ভব। বর্তমান সময়ে বিনিয়োগের মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবা দেয়া হয় তাও ভালো কাজ বলে মনে হয়। যার এগুলোর কিছুই নেই অর্থাৎ অর্থ নেই, শ্রম দেয়ার ক্ষমতা নেই, সময় ও বিনিয়োগের সুযোগ নেই সেও ভালো কাজ করতে পারে। একজন নিশেহারা ও পথহারা মানব সন্তানের পিঠে যদি শুধু স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় ও সান্ত্বনা দেয়, তাও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে। এজন্য মনে হয় সৃষ্টির সেরা জীব আল্লাহ্র খলীফা হিসেবে মানুষ পৃথিবীতে কোন না কোনভাবে মানুষের সেবা করতে পারে।

এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং দারিদ্র্যবিমোচনের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তুলছে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে মানবসেবার গুরুত্ব অত্যধিক বলে মনে হয়। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের এই উপমহাদেশে যে বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী তারা কিন্তু সেবামূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত

---

২৩. সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭
২৪ সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অলি, আউলিয়া, গাউছ, কুতুবের আগমনে তাদের সেবা ও সংস্পর্শে এসে আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে যে সেবা দান করে, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। ক্ষুধার্ত মানুষের সামনে খাদ্য তুলে দিচ্ছে, পরনের কাপড়ের ব্যবস্থা করছে, ধূমপান ও মাদকবিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করতে হবে, এখানে কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাজ করা চলবে না। আবার কল্যাণের যে কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য করা হয় তা দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় লাভের আশা করা ঠিক নয়।

ইসলামী সেবা সংস্থাগুলো তাদের যাত্রা থেকেই মানবকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশব্যাপী এ সকল সংস্থার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এতিম ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া, চিকিৎসা ও আবাসন-সুবিধা দান, স্কুল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারিগরি ইনস্টিটিউট, অসহায়দের কাপড়-চোপড় বিতরণ, অসহায় মুসলমান ছেলেদের বিনা খরচে সুন্নাতে খাতনার ব্যবস্থা, হত-দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্যসেবা দান, দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় দুর্গতদের আর্থিক সহায়তা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দান, কর্মক্ষম ও বিধবাদের আর্থিক সাহায্য, দুঃস্থ পরিত্যক্ত বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক অনুদান প্রদান করে যাচ্ছে।

এসকল সেবা সংস্থাসমূহ হত দরিদ্রদের মান উন্নয়নের জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে অনুদান প্রদান করে, যে অনুদানের মাধ্যমে তারা ভ্যান, রিক্সা, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন করতে পারে এবং দোকান করে স্বাবলম্বী হয়। এ সকল সংস্থা অসহায় মানুষের পুনর্বাসনকল্পে সহায়তা দিয়ে থাকে। তাদের বাস্তুভিটায় শাক-সবজি চাষ, মাছের চাষ, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো, শস্য বহুমুখীকরণ, বীজ সংরক্ষণ, জৈব কীটনাশক, গভীর নলকূপ স্থাপনসহ গ্রামভিত্তিক নেতৃত্বের মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরীর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল সেবা সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প সময়োপযোগী ও মানসম্মত বলে সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে সহাযোগিতা পাচ্ছে।

জাতীয় পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এক মারাত্মক সমস্যা। এই সমস্যা সৃষ্টির পিছনে মানবীয় কর্মকাণ্ড প্রধানত দায়ী। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা পরস্পর নির্ভরশীল, প্রতিক্রিয়াশীল ও বহুমাত্রিক। বিপুল জনগোষ্ঠীর নানা সমস্যার মধ্যেও মৌলিক কিছু সমস্যা আছে যেমন দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, সুদ-ঘুষ, শ্রমসমস্যা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, অপরাধ ও দুর্নীতি, মাদকাসক্তি, ভিক্ষুক-ভবঘুরে, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন ইত্যাদি। এসকল কিছুর প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করতে না পারলে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

উক্ত আলোচনা থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, সাধারণ সেবা সংস্থার সাথে চ্যালেঞ্জ করে ইসলামী সেবা সংস্থা গড়ে উঠেছে। সাধারণ সেবা সংস্থাগুলো এদেশের গরিব, অসহায় মানুষের জন্য যে সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করছে ইসলামী সেবা সংস্থাগুলোও সেসকল ক্ষেত্রে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এদেশের সাধারণ সেবা সংস্থা জনগণের সাহায্য করার নামে যে অর্থ বরাদ্দ করে তা মূলত সুদভিত্তিক, যেখানে সাধারণ মানুষ উপকারের চেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন বেশী, কারণ এ সকল সংস্থা নিজেদের লাভ তথা অর্থের দিক খুব ভালভাবে দেখে। পক্ষান্তরে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী বলে জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সমাজের অসহায়, গরিব, দুঃস্থদের জন্য নানামুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এ সকল সংস্থা তাদের সামর্থ অনুযায়ী গরিব মানুষের উপকারের জন্য সর্বদা তৎপর। তারা সেচযন্ত্র, পাওয়ার টিলার, হালের বলদ, গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণসহ গরিব কৃষকদের যেমন উপকার করছে, তেমনি আত্মকর্মসংস্থানের জন্য মাছচাষ, মুরগী পালন, রিক্সা ও ভ্যান, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কিনে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য মসজিদ নির্মাণ, ক্লিনিক নির্মাণ, অষুধানা নির্মাণ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গভীর-অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে সেবাদান করছে। পাঠশালা ও মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসহায়দের ধর্মীয় জ্ঞানদান করছে। অবহেলিত, পরিত্যক্ত, বিধবা দরিদ্রের জন্য বাসগৃহ

Dhaka University Institutional Repository

নির্মাণ করে মানবসেবার অনন্য নজীর স্থাপন করছে। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা ও এতিম প্রতিপালন ইত্যাদি নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ মানুষের মন জয় করতে পারছে বলে আমাদের মনে হয়। এদেশে ইসলামী সেবা সংস্থার কর্মতৎপরতার ফলে আনুমানিক ৫% অসহায় ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করছে।

এদেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ আমাদের অসহায় মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ মৌলিক চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করে তার জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ দিয়েছেন, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় কেউ হয়েছে ধনী আবার কেউ হয়েছে গরিব। অথচ বাঁচার অধিকার সকলের রয়েছে। আমাদের দেশের ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ মানুষের সেই অতিপ্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। আর সেবা দ্বারা যদি অসহায় ও অবহেলিত মানুষ উপকৃত হয় তাহলে এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে হয়। এদেশে কর্মরত ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের প্রত্যক্ষ কর্মতৎপরতার ফলে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষ উপকারভোগ করছে। এজন্য এসকল সেবা সংস্থার কর্মতৎপরতা ও সংখ্যা আরও বৃদ্ধিতে উর্ধ্বতন মহলের সুদৃষ্টি একান্ত কাম্য।

মুসলমান অধ্যুষিত এ দেশের মানুষের নিম্ন জীবনযাত্রার জন্য আমরাই দায়ী। এটা আমাদের নিজেদের সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন। অসহায় মানুষকে সেবাদানের জন্য কুরআন হাদীসের সুষ্ঠু সুন্দর, সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা ও দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলামী নীতিমালার আলোকে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামী সেবা সংস্থাসমূহ অবিরাম কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

আরবী

১. *আল কুরআনুল কারীম*।

২. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী : *সহীহুল বুখারী*, দিল্লী কুতুবখানা, রশীদিয়্যাহ, ১৪০৯ হিজরী।

৩. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী : *সহীহ লি মুসলিম*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৪০৮ হিজরী।

৪. আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শু'আইব আননাসাঈ : *সুনানুন নাসাঈ*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, ১৪১০ হিজরী।

৫. আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযি : *সুনানুত তিরমিযি*, দিল্লী, কুতুবখানা, রশীদিয়্যাহ, ১৪০৯ হিজরী।

৬. আবু দাউদ সুলাইমান ইবনু আশ'আছ আস-সিজিস্তানী :*সুনানু আবী দাউদ*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি।

৭. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ আল-কাযভীনী : *সুনানু ইবনে মাজাহ*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি।

৮. আল্লামা আহমদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জারির বালাযুরী, *ফুতূহুল বুলদান*, কায়রো, মাত্বা'আতুশ শারকিল ইসলামিয়া, ১৯৭৭ ইং।

৯. আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক*, মিশর, দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭ ইং।

১০. আহমদ ইব্ন আলী হাজার আল-'আসকালানী, *ফত্হুল বারী*, রওযা, আল্-মাতবা'আতুস সালাফিয়া ওয়া মাকতাবাতুহা, ১৯৫৯ইং।

১১. ইব্ন কাসীর, *আস্সীরাতুন নববিয়্যাহ*, কায়রো, ঈসাল বাবিল হলবী, ১৯৬৪ ইং।

১২. ইব্ন কাসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, বৈরুত, মুয়াস্সাসা জাওয়াদ, ১৯৭৭ ইং।

১৩. ইবনে হিশাম, *আস্সীরাতুন নববিয়্যাহ*, মিশর, মাতবা'আ মুস্তফা আল্-বা'বিল হলবী, ১৯৫৫ইং।

১৪. কাজী মুহাম্মদ সুলায়মান সালমান মনসূরপূরী, *রাহ্মাতুল্লিল 'আলামিন*, দিল্লী, হানীফ বুক ডিপো, ১৯৫৩ ইং।

১৫. মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী, *আসাহহুস সিয়ার*, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৯৬৮ ইং।

১৬. মুল্লা মজ্দুদ্দিন, *সিরাতে মস্তফা*, দিল্লী, মাকতাবা 'উসমানিয়া, ১৯৫৭ ইং।

বাংলা

১৭. অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, আলী পাবলিকেশন্স ১৯৮৫ ইং।

১৮. অধ্যাপক গোলাম আযম, *যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২ ইং।

১৯. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল খালেক, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ ইং।

২০. আতিকুর রহমান, *স্নাতক সমাজকল্যাণ*, ঢাকা, কুরআন মহল, ১৯৯৩ ইং।

২১. আবু তালেব, *হেরোইন : আর এক মারণাস্ত্র*, খুলনা, অমাবর্তী প্রকাশনী, ১৯৯৮ ইং।

২২. আব্দুল খালেক, *জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮১ ইং।

২৩. আব্দুল মতিন, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন*, ঢাকা, মাদল প্রকাশনী, ১৯৯০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুস, *সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, ঢাকা, মুক্তমন প্রকাশনী ১৯৯৮ ইং।

২৫. আল্লামা শিবলী নোমানী, *আল ফারুক*, মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫ ইং।

২৬. আল্লামা শিবলী নোমানী ও সৈয়দ সুলায়মান নদভী, *সীরাতুন নবী*, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত, ঢাকা, প্যারাডাইজ লাইব্রেরী, ১৯৭৫ ইং।

২৭. ইবনে ইসহাক, *সীরাতে রসূলুল্লাহ (স.)*, শহীদ আখন্দ অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং।

২৮. ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নবী*, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং।

২৯. ইবনে হিশাম, *সীরাতুন নবী*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনূদিত, ১৯৯৪ ইং।

৩০. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং।

৩১. এ কে এম নাজির আহমদ, *ইসলামের সোনালী যুগ*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ১৯৯৫ ইং।

৩২. এ. এফ. এম. এনামুল হক, *হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র)-এর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা, জয় পাবলিশার্স ১৯৯৮ ইং।

৩৩. কে. এম মনিরুজ্জামান, *মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন*, ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল ১৯৯৯ ইং।

৩৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবনধারা*, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ঢাকা, জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৭ ইং।

৩৫. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ঢাকা. জয় প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং।

৩৬. গোলাম মোস্তফা কিরণ, *আজকের বিশ্ব*, ঢাকা, প্রিমিয়ার পাবলিকেশন্স, ২০০১ ইং।

৩৭. ড. আবদুল করিম জায়দান, *ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা*, মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ২০০২ ইং।

৩৮. ড. কামাল সিদ্দিকী, *বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্য : স্বরূপ ও সমাধান*, ঢাকা, ডানা প্রকাশনী, তা.বি।

৩৯. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসুল (সঃ)-এর সরকার কাঠামো*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪ ইং।

৪০. ড. মুহাম্মদ হোছাইন হায়কল, মহা নবীর জীবন চরিত, মাওলানা আবদুল আওয়াল অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ ইং।

৪১. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, *ইসলামে মালিকানার রূপরেখা*, মাওলানা সেকেন্দার মমতাজী অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ ইং।

৪২. ড. তোফাজ্জল হোসেন, *জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও আগামী পৃথিবী*, ঢাকা বই মঞ্চ, ১৩৯৫ বাংলা।

৪৩. ড. মায়েজুর রহমান, *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং।

৪৪. ড. মাহমুদ আহমদ, *অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, ঢাকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, তা. বি.।

৪৫. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪ ইং।

৪৬. ড. মোস্তফা আস-সিফায়ী, *মানবতার কল্যাণে ইসলামী সভ্যতার অবিস্মরণীয় অবদান*, হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা, হাসনা প্রকাশনী, ২০০০ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. নঈম সিদ্দিকী, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)*, আকরাম ফারুক অনূদিত, ঢাকা, শতাব্দী প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং।

৪৮. নাদরাতুন নাঈম, *মহানবী (সা)-এর জীবনী বিশ্বকোষ*, মাওলানা আবদুল আওয়াল অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০ ইং।

৪৯. মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, মাওলানা মুহাম্মদ হাসান রহমতী অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ ইং।

৫০. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআন রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং।

৫১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অর্থনৈতিক সুবিচার ও মুহাম্মদ (সঃ)*, দিনাজপুর, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ইং।

৫২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯১ ইং।

৫৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী ১৯৯৮ ইং।

৫৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল্লাহ্‌র হক বান্দার হক*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৮ ইং।

৫৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *খিলাফতে রাশেদা*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭৫ ইং।

৫৬. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং।

৫৭. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলাম ও মানবাধিকার*, ঢাকা, খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৮৯ ইং।

৫৮. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ ইং।

৫৯. মাওলানা মোহাম্মদ গরীবুল্লাহ ইসলামাবাদী, *আশারা মোবাশ্‌শারা*, ঢাকা, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২০০৩ ইং।

৬০. মাওলানা নূরুর রহমান, *হযরত আলী (রাঃ)*, ঢাকা, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০৪ ইং।

৬১. মাওলানা খলিলুর রহমান, *দারুসে হাদীস*, ঢাকা, প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪ ইং।

৬২. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী, *হযরত আবু বকর (রাঃ)*, এ.কে.এম মুহিউদ্দীন অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১ ইং।

৬৩. মুহাম্মদ আবুতালিব, *সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা।* (প্রবন্ধ) খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা : স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা, গোলাম মঈনউদ্দিন, ঢাকা, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, ১৯৭৮।

৬৪. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশ বিষয়াবলী*, ঢাকা, ডলফিন বুক হাউজ, ২০০৩ ইং।

৬৫. মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান আল-মারুফ, *ইসলামী সাধারণ জ্ঞান*, ঢাকা, প্রমিনেন্ট পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯ ইং।

৬৬. মুহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন খান, *যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও দেশের সমস্যা*, ঢাকা, প্রীতি প্রকাশন, ২০০৩ ইং।

৬৭. মুহাম্মদ নুরুযযামান, *বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালে*, ঢাকা, দি সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯৭ ইং।

৬৮. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৭৬ ইং।

৬৯. মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, *দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সেবায় বিশ্বনবীর আদর্শ*, ঢাকা, স্টাডি পাবলিকেশন্স, ২০০২ ইং।

Dhaka University Institutional Repository

৭০. শাহ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শিক্ষা*, ঢাকা, সোনালী সোপান, ১৯৯৫ ইং।

৭১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি কি ও কেন*, ঢাকা, ইসলামিক বুক বাইয়ার্স লিঃ ১৯৮৪ ইং।

৭২. শ্রী অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালী চরিতাবিধান*, ১৯৭৬ ইং।

৭৩. সাইয়েদ মুহাম্মদ আলী, *উশর*, ঢাকা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯২ ইং।

৭৪. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, *পুঁজিবাদ ও ইসলাম*, মাওলানা কারামত আলী অনূদিত, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ ইং।

৭৫. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী, *ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম নিয়ন্ত্রণ*, আব্দুল খালেক অনূদিত, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২ ইং।

৭৬. সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *শহীদে মেহবার হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)*, হাফেয মুনির উদ্দিন আহ্মদ অনুদিত, ঢাকা, আল-কোরআন একাডেমী, বাংলাদেশ সেন্টার, ২০০২ ইং।

৭৭. সাঈদ আহ্মদ আকবরাবাদী, *হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)*, মোহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ইং।

৭৮. শায়খুল হাদীস মাওলা মুহাম্মদ তোফাজ্জল হোছাইন, *হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, ঢাকা, ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ ইং।

৭৯. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ* ঢাকা, রোহেল পাবলিকেশন্স, ২০০৪ ইং।

ইংরেজী

1. A Board of Editors, *Thought on Economics*, Dhaka, Islamic Economics Research Bureau, 1994
2. Abdus Samad, *Bangladesh facing the future Dhaka*, Bangladesh Book international, 1983.
3. A Faruk, *The Vagrant of Dhaka City : A Socio-Economic Survey*, Dhaka, Bureau of Economics Research, 1978.
4. Afzalur Rahman, *Muhammad (SM)*, London, Muslim Schools Trust, 1979
5. Dr. Zaki Ali, *Islam in the World*, Lahore, 1947,
6. Hamiduddin Khan, *History of Muslim Education*, Bairut, 1954
7. Muhammad Husan Haykal, *The Life of Muhammad (SM)*, Aligarh, Cresecent Publishing, 1976
8. P. K. Hitti, *History of the Arabs*, London, 1970
9. Philip K. Hitti, *History of Syria*, London, 1951
10. Salem Azzam, *Islam and Contemporary Society*, London, Islamic Council of Europe, 1982
11. Sir William Muir, *Life of Mahomet*, London, 1956
12. Syed Ahmed Khan Bahadur, *Essays on the Life of Muhammed*, Delli, Idarah Adabiyat, 1870
13. Walker, *History of the Law of Nations*, Cambridge, 1958

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেদন

১. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ঢাকা।

২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৩-২০০৪*, আদ্-দ্বীন, যশোর।

৩. *ত্রি-বার্ষিক রিপোর্ট ২০০২-২০০৫*, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, ঢাকা।

৪. *Administrative Organization & Financial Report 2004-2005,* Anjuman Mufidul Islam, Dhaka.

৫. *Annual Report 2003-2004,* Dhaka Ahsania Mission, Dhaka.

৬. *Annual Report-2004,* Muslim Aid, Bangladesh Country Office, Dhaka.

৭. *Annual Report 2005,* Bangladesh Musjid Mission Dhaka.

পত্র-পত্রিকা

১. *আঞ্জুমান বার্তা*, এপ্রিল ২০০৪, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ঢাকা।

২. *Anjuman News,* July 2005 Anjuman Mufidul Islam, Dhaka.

৩. *জাগরণী*, ৭ম জাতীয় সম্মেলন ২০০৩ ও যৌতুকবিহীন বিবাহ অনুষ্ঠান স্মারক, ঢাকা, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি।

৪. *পরিচিতি*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ঢাকা।

৫. *পরিচিতি*, মসজিদ কাউন্সিল, ঢাকা।

৬. *Brochure,* Muslim Aid Bangladesh, Dhaka.

৭. *মিশন বার্তা ২০০৫*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ।

৮. *মাসিক আলাপ*, নভেম্বর ২০০৫, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা ।

৯. *যাকাত ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন পরিচিতি*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ।

১০. *শতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মরণিকা ২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ঢাকা।

১১. *স্মারকগ্রন্থ ২০০৫*, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম, ঢাকা।

১২. *সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, ঢাকা।

১৩. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ৪৫বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫, ঢাকা।

১৪. *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, এপ্রিল-জুন ২০০৫, ঢাকা।

১৫. *মাসিক আল-ফুরক্বান*, জুলাই ২০০৩, ঢাকা।

১৬. *মাসিক মদীনা*, মে ২০০৩, ঢাকা।

১৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*।

১৮. *দৈনিক ইনকিলাব*।

১৯. *দৈনিক প্রথম আলো*।

২০. *দৈনিক যুগান্তর*।

২১. *দৈনিক সংগ্রাম*।

২২. *দৈনিক আমার দেশ*।